শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ রহস্যামৃত

শংকর

নবজাতক প্রকাশন

এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২

প্রথম প্রকাশ
১৭ই মে, ১৯৬৪

প্রকাশক
মজহারুল ইসলাম
নবজাতক প্রকাশন
এ-৭৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

মুদ্রক
সুধীর পাল
সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১৪/১এ, রাজা রামমোহন সরণি
কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

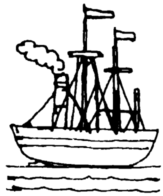
রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের তরুণ সন্ন্যাসী
স্বামী সমর্পণানন্দ
রামকৃষ্ণ মহারাজকে
যাঁর সমালোচনায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে
এই লেখার পরিকল্পনা।

শংকর

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ।।''

শ্রীমদ্ভাগবত, গোপীগীতা

''বিভিন্ন নদীর উৎস বিভিন্ন স্থানে, কিন্তু তারা সকলেই যেমন এক সাগরেই তাদের জলরাশি ঢেলে মিলিয়ে দেয়, তেমনি হে ভগবান, নিজ নিজ রুচির বৈচিত্র্যবশতঃ সোজা ও বাঁকা নানা পথে যারা চলছে, তুমিই তাদের সকলের একমাত্র লক্ষ্য।''



"তব রহস্যামৃতং তপ্তজীবনম্ .....শ্রবণমঙ্গলং"

ঘটনার রকমসকম যা দেখা যাচ্ছে তাতে হরিময় চৌধুরী ছাড়া আর কাউকে দিয়ে এই অমৃতকথা শুরু করা যুক্তিযুক্ত হবে না।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে এই হরিময় চৌধুরী লোকটি কে? ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের রহস্যামৃতে তাঁর এমন কি ভুমিকা থাকতে পারে যে হরিময় চৌধুরীর নামই এখানে প্রথমে উল্লেখ করতে হবে?

সন্দিহান হবার বা অধৈর্য হবার কোনো কারণ নেই। আসুন, হরিময়বাবুর সঙ্গে এই সুযোগে একটু পরিচিত হওয়া যাক। তা হলেই বুঝতে পারা যাবে নিজের অজান্তেই এই মানুষটি কেন এবং কীভাবে এই শতকের এক অত্যাশ্চর্য রহস্যভেদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন।

ফিকে গেরুয়া রঙের খাদি পাঞ্জাবি এবং চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের সরকারী খাদি গ্রামোদ্যোগের বড় দোকান থেকে কেনা মিডিয়াম মোটা ধুতি পরে হরিময়বাবু এই মুহূর্তে তিন ফুট বাই দু ফুট একটা পালিশহীন বিবর্ণ টেবিলের সামনে বসে মাথা নিচু করে গভীর মনোযোগ সহকারে কীসব পড়ছেন।

হরিময়বাবুর ডান হাতে রয়েছে একটা পাতলা চন্দনকাঠের ছুরি। এই

ছুরি হরিময় চৌধুরী উপহার পেয়েছেন তাঁর প্রিয় লেখক কথাসাহিত্যিক ভবনাথ সেন মহাশয়ের কাছ থেকে। সেবার মাইশোর ভ্রমণ থেকে ফিরে ভবনাথবাবু তাঁকে বলেছিলেন , ''হরিময়, কত লোক তোমাকে কত চিঠি লেখে — এইসব পত্রাবলী ঝটপট খোলা অনেক সহজ হবে এই পেপার নাইফ দিয়ে।''

ভবনাথবাবু শুনেছেন, প্রবাসী পত্রিকার একদা বিখ্যাত সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এরকম একটি চন্দনকাঠের ছুরি দিয়ে সম্পাদকীয় দপ্তরের চিঠিপত্র নিজের হাতে খুলতেন। ছুরির উপহারদাতা স্বয়ং বিশ্বকবি এবং প্রবাসী পত্রিকার নিয়মিত লেখক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। হরিময়বাবু বলেছেন, ''প্রবাসী পত্রিকায় কবিগুরু কত লেখা ছাপিয়েছেন, তার পরিবর্তে সম্পাদককে একখানা ছুরি উপহার দেওয়া খুবই স্বাভাবিক।''

লেখক ভবনাথ সেনের এই প্রীতি-উপহার পাওয়ার পর থেকে সম্পাদক হরিময়বাবুরও নেশা ধরে গিয়েছে। নিজের টেবিলে জমে ওঠা ডাকে আসা সমস্ত চিঠি তিনি সংগ্রহ করেন। তারপর একে একে পাঠকদের পাঠানো খাম এবং অন্তর্দেশীয় পত্রগুলি ছুরি দিয়ে কাটতে শুরু করেন। মাঝে-মাঝে হাতচালানো বন্ধ রেখে ছুরির সরু দিকটা নাসারন্ধ্রে আলতো করে ঢুকিয়ে দিয়ে স্নিগ্ধ চন্দনের গন্ধসুখও উপভোগ করেন হরিময়। আর বলেন, ওয়ার্লডের বেস্ট চন্দন মাইশোরেই পাওয়া যায়।

চন্দনগন্ধময় এই ছুরি থেকে হরিময়বাবু একবার সম্পাদকীয় লেখার আইডিয়া পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন চমচম শহিদ স্মরণসংখ্যায়: ''আমাদের মৃত্যুঞ্জয়ী স্বাধীনতাসংগ্রামী শহিদদের সঙ্গে একমাত্র তুলনা চলে পবিত্র চন্দনবৃক্ষের — ভূপাতিত হইবার পরেও বহু যুগ ধরে নীরবে গন্ধসুধা বিতরণ করা সম্ভব একমাত্র চন্দন বক্ষের পক্ষেই।''

এই লেখার তারিফ করেছিলেন স্বয়ং ভবনাথ সেন। আনন্দে ডগমগ হয়ে ডান চোখটিকে মুহূর্তের জন্য অর্ধেক আকারে নিষ্পেষিত করে হরিময় চৌধুরী বলেছিলেন, ''এই সাধুবাদ তো আপনারই প্রাপ্য। আপনার দেওয়া চন্দনের ছুরিটাই তো আমাকে লিখতে ইনসপিরেশন অর্থাৎ অনুপ্রেরণা

জোগালো।''

ছুরি দিয়ে চিঠি খুলতে-খুলতে হরিময়বাবুর দরজার বেল হঠাৎ সশব্দে বেজে উঠলো। চমচম অফিসের দরজা এখনও বন্ধ আছে দেখে হরিময়বাবু একটু বিরক্ত হয়ে কাজের লোক গুণধরকে ডাকলেন।

''কতবার বলেছি বাবা। দরজাটা সকাল সাড়ে আটটা বাজলেই হাট করে খুলে দিবি। চমচমের ওপেন ডোর পলিসি, দরজা সর্বদা খোলা না রাখলে লোকে বলবে কী?''

বকুনি হজম করে গুণধর ছুটে এসে দরজা খুলে দিতেই চৌকাঠের ওপারে স্বয়ং শ্রীমান পিকলুকে দেখে বেজায় খুশি হয়ে উঠলেন হরিময়বাবু। বললেন, ''আসুন আসুন পিকলুবাবু!''

পরম সমাদরে ভবনাথ সেনের আদরের নাতিকে ভিতরে ঢুকিয়ে আনলেন হরিময়বাবু। তারপর বললেন, ''এই দেখো না গুণধরের কাণ্ড, চমচম সম্পাদককে গুণধর কিছুতেই 'খোলা দরজা' নীতি অনুসরণ করতে দেবে না। গুণধর বোঝে না, এই নীতির প্রথম কথাই হলো সম্পাদকের সিটি অফিসের দরজা সারাক্ষণ হাট করে খুলে রাখতে হবে।''

''মিস্টার পিকলু, এবার আপনি বসুন,'' সরলভাবে সাদর আহ্বান জানিয়ে হরিময়বাবু প্রথমেই তাঁর টেবিলের ডান দিকে ড্রয়ার খুলে ফেললেন এবং সেখান থেকে একটা আখরোট কাঠের বাক্স সযত্নে বার করলেন।

হরিময়বাবু বললেন, ''এই বাক্সটাও তোমার দাদু ভবনাথ সেন আমাকে প্রেজেন্ট করেছিলেন সেবার কাশ্মীর ভ্রমণে গিয়ে। আমাকে দিলেন গোল বাক্স, অথচ দুর্দান্ত উপন্যাস লিখলেন 'বাঁকা তলোয়ার' ঝিলম নদীকে নিয়ে। লেখাটা আমাকে দিলেন না চমচম-এ প্রকাশ করতে। বললেন, ওটা চমচম পাঠকদের উপযুক্ত নয়। উপন্যাসটা বেরলো শেষ পর্যন্ত সাগরময় ঘোষের দেশ পত্রিকায়। ভালই হয়েছিল, উপন্যাসে এতই নারীচরিত্র ঢুকে পড়েছিল যে, আমাদের পক্ষে 'ছাবা' সম্ভব হত না।''

কথাটা যে 'ছাপা', ছাবা নয় তা মনে করিয়ে দিয়ে হরিময়বাবুকে লাভ

নেই। উনি প্রায়ই বলে থাকেন, 'ছাবাও যা ছাপাও তা!' যেমন সিলেটের এক সম্পাদক সারাক্ষণ ব্যাঙ-কে 'বেঙ' বলতেন, ভুল ধরিয়ে দিলে বিরক্ত হয়ে বলে উঠতেন, 'বেঙও যা বেঙও তা! আসলে ব্যাঙ কথাটা সিলেট সম্পাদকের কানেই ঢুকতো না।

আখরোটের সুদৃশ্য বক্সটা খুলে হরিময়বাবু পিকলুকে সারপ্রাইজ দিলেন। অয়েল পেপারে মোড়া একটা স্পেশাল সাইজের সাদা রঙের মিঠাই উপহার দিলেন শ্রীমান পিকলু সেনকে। অনুরোধ করলেন, "সোজা মুখে চালান করে দাও ফার্স্ট। তোমার দাদু জানেন, একসময় এখানে এলে অতিথিকে আমি প্রথমেই একটা মর্টনের টফি উপহার দিতাম। তারপর ভাবলাম, স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর এসে গেলো। কাজেকর্মে ভাবনাচিন্তায় এবার একটু স্বদেশী ভাব আনা দরকার। আজ তোমার ওপরেই প্রথম এক্সপেরিমেন্ট করলাম — নো মোর ইংলিশ লজেন্স — এখন থেকে স্বদেশী...।"

অয়েল পেপারে মোড়া জিনিসটা কী তা এখনও বুঝতে পারছে না পিকলু। ফলে খুব মজা পেয়ে গেলেন হরিময়বাবু।

এবার তিনি বললেন, "তুমি তো বম্বেতে মানুষ হয়েছো, পিকলু, ওখানে গ্র্যাজুয়েশন করে সবেমাত্র কলকাতার জোকা ক্যামপাসে পড়তে এসেছো, তোমার পক্ষে এই ধাঁধা বোঝা বেশ কঠিন ব্যাপার!"

হরিময়বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করছে পিকলু। চমচম সম্পাদক এবার কালবিলম্ব না করে একটি আর একটি অয়েলপেপার খুলে ফেলে ভিতরের জিনিসটি ঝটিতি নিজের মুখে পুরে দিলেন। পিকলুকেও রিকোয়েস্ট করলেন, "সময় নষ্ট না করে, মোড়ক খুলে এইভাবে চুষে যাও, জাস্ট লাইক লজেন্স! এর নাম গুজিয়াপুরিয়া। বহু রিসার্চ করে, বহু খোঁজখবর নিয়ে বড়বাজারে মহাত্মা গান্ধী রোডে মিষ্টির আড়ৎ থেকে এই একস্ট্রা-স্পেশাল গুজিয়া সংগ্রহ করেছি! তবে সেলোফোন প্যাকেজিংটা আমাদের নিজস্ব, ধৈর্য ধরে গুণধরকে দিয়ে মোড়ক করিয়েছি।"

না-চিবিয়ে লজেন্সের মত কড়াপাক গুজিয়া চুষতে কিন্তু বেশ ভাল লাগছে পিকলুর। হরিময়বাবু সগর্বে ব্যাখ্যা করলেন, "ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশনকে মাদার ইন্ডিয়া এই গুজিয়া উপহার দিতে পারেন। ক্যাডবেরি বা কোকাকোলা কোম্পানির হাতে পড়লে এই গুজিয়া বিদেশের বাজারে ডেলি এক বিলিয়ন বক্স বিক্রি হতে পারে।"

"কেমন লাগছে?" জানতে চাইছেন হরিময়বাবু। পুরিয়ায় একটু মিষ্টি বেশি আছে শুনে তিনি একটু দমে গেলেন। নিজের মনেই গভীর দুঃখের সঙ্গে বললেন, "জেনারেশন গ্যাপ! এদেশের এক প্রজন্ম মিষ্টি খেতে চাইলো, কিন্তু পয়সার অভাবে মিষ্টি চাখবার চান্সই পেলো না — আর এক প্রজন্মের সামনে খাবার সুযোগ রয়েছে, সামর্থ্য রয়েছে, কিন্তু মিষ্টিতে তাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই!"

"মিষ্টিতে দাঁত নষ্ট হয়ে যায়," সবিনয়ে হরিময়বাবুকে মনে করিয়ে দিল পিকলু সেন।

"পিকলু! ওটা একেবারে বাজে কথা! তা হলে ঠাকুর রামকৃষ্ণের দাঁত বলে কিছু থাকতো না। সেই ছোটবেলা থেকে মাখন-মিছরি পেলে আর কিছুই তো তাঁর পছন্দ হতো না! হোয়াট অ্যাবাউট সোয়ামী ভিভেকানন্দ? রসগোল্লা খেতে পাবেন এই প্রত্যাশায় প্রথম ঠাকুরকে দেখতে তিনি উৎসাহ প্রকাশ করলেন। লাস্ট ফিফটিন থাউজেন্ড ইয়ারস্ ধরে ইন্ডিয়ানরা এতো মিষ্টি খেয়েছে যে এতোদিনে সমস্ত জাতটাই ফোগ্‌লা হয়ে যেতো।"

পিকলু হাসছে। "এ-বিষয়ে আপনি সম্পাদকীয় লিখবেন নাকি?" সে জিজ্ঞেস করলো।

"প্রয়োজনে লিখতে হবে। কিন্তু এদেশের ইয়ংদের মনে কথাগুলো আদৌ ঢুকবে কি না সন্দেহ। আমি ইতিমধ্যে নিজে বড়বাজার গুজিয়া সেন্টার-এ দু'দিন ঘুরে এসেছি — বলেছি, পারলে গুজিয়ায় একটু সুগার কমাও। তা ওরা শুনবে না, দুশো বছর আগে বেনারস থেকে গুজিয়ার যে ফর্মুলা সঙ্গে নিয়ে বড় বাজারে এসেছিল তার একচুল রদবদল করতে রাজি নয় বর্তমান পাঁড়েজি।"

পিকলু জানে, হরিময় দাদুর মাথায় প্রায়ই নানা রকম নতুন চিন্তা খেলে যায়। হরিময়বাবু অবশ্য বলেন, "এসব ঘটে যখন ভবনাথবাবুর সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হয়। দেশলাই বাক্সর সঙ্গে কাঠির ঘষাঘষি হলেই আগুন জ্বলে ওঠে!"

হরিময়বাবু আর একটা গুজিয়ার পুরিয়া পিকলুর দিকে সস্নেহে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এই পুরিয়াটা এখনও গোপন গবেষণার স্টেজে আছে। গুজিয়ার সঙ্গে একডোজ পিপারমেন্ট এবং চিউয়িংগাম অতি সাবধানে মিশিয়ে নতুন একটা স্বদেশী মিষ্টান্ন ডেভেলপ করা যায় কি না তা দেখছি। বহু কষ্টে বড়বাজারের পাঁড়েজির স্পেশাল সাহায্য পাচ্ছি — ওঁরা বোঝেন না, ব্যাপারটা সাকসেসফুল হলে কী কাণ্ড ঘটে যাবে! ইন্ডিয়াতে অন্তত তিরিশ কোটি স্কুলে-যাওয়া ছেলেমেয়ে রয়েছে, সংখ্যায় নেক্সট্ ওনলি টু চায়না। একবার জিনিসটা ছেলেমেয়েদের মুখে লেগে গেলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে বুঝতে পারছো?"

এই নতুন মিষ্টির নামও আগাম ঠিক করে ফেলেছেন হরিময়বাবু — 'গুইংগাম'।

পিকলুর মুখের দিকে তাকিয়ে হরিময়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাপারটা বুঝলে তো? সত্যজিৎ রায় বেঁচে থাকলে নামটা ভীষণ অ্যাপ্রিশিয়েট করতেন। আরও তারিফ করতে পারতেন ওঁর বাবা সুকুমার রায়। পরলোক থেকে প্ল্যানচেটে তিনি ইতিমধ্যেই ভী-ষ-ণ আনন্দ প্রকাশ করেছেন। গুজিয়ার গু, চিউইং-ইং এবং গাম ইজিকলটু গুইংগাম। একবার যদি আন্তর্জাতিক বাজারে গুইংগাম আইডিয়াটা ধরে নেয় তা হলে ফাটাফাটি ব্যাপার হবে! তার আগে পরিকল্পনাটা চুপি চুপি পেটেন্ট করে নিতে হবে, মগজ সম্পত্তি বলে কথা। ইংরিজি নামটাও মিষ্টি — ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি।"

পিকলু বললো, "চিউইংগামের দিন ঘনিয়ে আসছে, হরিময়দাদু!"

এই দাদু শব্দটায় আজকাল হরিময়বাবু আপত্তি তুলছেন। "মাই ডিয়ার মিস্টার পিকলু, তুমি বম্বের সিটিজান, সব বিষয়ে তুমি মডার্ন, সব বিষয়ে

তোমরা কলকাতা থেকে এক মাইল এগিয়ে আছো। প্লিজ, ওই দাদু কথাটা অমন নিষ্ঠুর ভাবে 'স্প্রে' কোরো না। সারা শরীর জ্বালা করতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায়, বুড়ো হয়ে গিয়েছি, কেওড়াতলা বার্নিংঘাট আর বেশি দূর নয়। তুমি প্লিজ আমাকে দাদা বলে ডাকবে। দাদু অ্যান্ড দাদা আর সেম থিং।"

পিকলু নিজের ঠাকুমার কাছে বহুবার শুনেছে, জেনেশুনে লোকের মনে আঘাত দিতে নেই। যিনি যা চান সম্ভব হলে তাঁকে তা দিতে হয়। অতএব হরিময়দাদু এখন থেকে পিকলুর হরিময়দাদা।

খুব খুশি হয়ে করমর্দনের জন্য ডান হাতটা এগিয়ে দিলেন হরিময়বাবু। বললেন, "শর্টে সারবার ইচ্ছে হলে, হরিদাও বলতে পারো! তোমার দাদু ভবনাথ সেন একটা শব্দ বানিয়েছিলেন, লাস্ট গল্পে — শর্টে শার্টং!"

"কথাটা তো শঠে শাঠ্যং — ত্যাঁদড় লোকের সঙ্গে ত্যাঁদড়ামো করতে হবে!"

চোখ বুজে হরিময়বাবু বললেন, "চিন্তার জগতে ভবনাথ সেন অ-নে-ক এগিয়ে গিয়েছেন — নব নব সৃষ্টির সমুদ্রকিনারে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন ইদানীং। লেখনী দিয়ে কখনও আগুন বেরোচ্ছে, কখনও রক্ত, কখনও স্রেফ রসগোল্লার রস। ওঁর মতন লোকই সৃষ্টিসুখের উল্লাসে মত্ত হয়ে সৃষ্টি করতে পারেন — শর্টে শার্টং। এর অর্থ হলো, ছোট ব্যাপারে ছোট উত্তর।"

পিকলু গুইংগামের রস উপভোগ করতে-করতে বললো, "বড় হোটেলে, রাজভবনে, রাষ্ট্রপতি ভবনে আপনার এই আবিষ্কার সামলাতে খুব অসুবিধে হবে হরিময়দাদা!"

"কেন?" হুঙ্কার ছাড়লেন চমচম সম্পাদক হরিময় চৌধুরী। "ভোঁস ভোঁস করে সিগ্রেট খেয়ে লোকে চিমনির মতন সারাক্ষণ ধোঁয়া ছাড়ছে তাতে রাজ্যপালের এবং রাষ্ট্রপতির অসুবিধে হচ্ছে না, যত রাগ এই মেড-ইন-ক্যালকাটা গুইংগামের ওপর?"

পিকলু বোঝাতে চেষ্টা করলো, "রাগটা মোটেই ক্যালকাটার ওপর নয়, হরিময়দাদা।"

"রাখো রাখো। ক্যালকাটার বিরুদ্ধে সারাক্ষণ সারাদুনিয়ার কনস্‌পিরেসি — অষ্টপ্রহর ষড়যন্ত্র!" ফুঁসছেন হরিময়বাবু।

"প্রয়োজন হলে, আমি গুইংগাম চুষতে চুষতে তাজবেঙ্গল হোটেলে ঢুকবো, তাতে যদি আবার আমাকে জেলে যেতে হয় এই বয়সে তা যাবো। ওখানে অসুবিধে হবে একটু। শুনেছি এখনও আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে সন্ধেবেলায় ইষবগুলের ভুসি সাপ্লাই করে না, ফলে যাদের কিনা ইয়েতে একটু কাঠিন্য ... তাদের খুব মুশকিল।"

"আপনার হৃদয়ে কাঠিন্য? অতি বড় শত্রুও এ কথা বলতে পারবে না!" পিকলু সোজাসুজি মন্তব্য করলো।

হরিময়বাবু ডান কানে ডান হাতের দ্বিতীয় আঙুলটা অনেকখানি ঢুকিয়ে একটু ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, "আগে যখন স্বদেশী করে জেলে গিয়েছি তখন বয়সটা কম ছিল। 'কনসটিটিউশন'টা ছিল ভেরি ভেরি স্ট্রং, তাই কনসটিপেশনকে ডোন্টকেয়ার করতে পারতাম, এখন পারি না।"

হরিময়বাবু বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। তাঁকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে পিকলু বললো, "শুধু শুধু আপনি আবার জেলে যাবেন কেন? আপনাকে এক সপ্তাহ না দেখলে আমার দাদু তো চোখে অন্ধকার দেখবেন। দাদু বলেন হরিময়ের সঙ্গে সানডে-মর্নিং আড্ডাটা আমার মানসিক ব্যাটারিকে চার্জ করে।"

"শোনো পিকলু, তোমার দাদুও জেলে যাবার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধীর আমলে এমার্জেন্সির সময়। তখন বাধ্য হয়ে আমিও কাপড়চোপড়, দাঁত মাজবার বুরুশ, দাড়ি কামাবার শেভিং সেট এবং সানলাইট সোপের কেক নিয়ে রেডি হয়েছিলাম, যাতে পৃথক ফলেও এক যাত্রা হয়। তা মুখ্যমন্ত্রী মানু রায় শেষ পর্যন্ত আমাদের অ্যারেস্ট অর্ডারে সই করলো না, কারণ ওঁর ওয়াইফ মায়া রায় তখন চমচম-এ তোমার দাদু ভবনাথ সেনের ধারাবাহিক উপন্যাসের শেষ পর্ব পড়ছেন। মানু রায় বুঝলেন, এখন অ্যারেস্ট করা মানে, চমচমে ধারাবাহিক বন্ধ হয়ে যাওয়া। ওয়াইফ্ এতে কিছুতেই সন্তুষ্ট হবেন না। তার থেকে বরং আর

দুটো সংখ্যা ওয়েট করা যাক। ইন দ্য মিনটাইম, এমার্জেন্সি উবে গেলো এবং এরপরে ইন্দিরা গান্ধীরও কী হল তা তো তুমি জানো! তখনই তোমার দাদু সেই স্মরণীয় লাইনটা লিখেছিলেন, সময়ই একমাত্র শিক্ষক যিনি প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়ার পরেই নিজের ছাত্রছাত্রীদের গিলে ফেলেন।”

পিকলু এসব খবর ইদানীং কলকাতায় এসে শুনতে আরম্ভ করেছে। বম্বেতে এসব উত্তাপ কখনও তেমন পৌঁছয়নি।

হরিময়দাদুকে আরও উত্তেজিত না করে সে এবার বললো, “বড় বড় হোটেলের ওপর অযথা রেগে যাবেন না হরিময়দাদা। ওদের দামী ওয়াল-টু-ওয়াল কার্পেটে চিউইংগাম পড়ে যে কী ভীষণ অসুবিধা ঘটায় তা যদি শুনতেন। বড় বড় ইলেকট্রিক ভ্যাকুয়াম ক্লিনারগুলোর বারোটা বেজে যায় যখন অসাবধানী লোক মুখের চিউইংগামটা গাল থেকে বার করে কার্পেটে ছুড়ে ফেলে দেয়।”

হরিময়বাবু তাড়াতাড়ি নোটবুকটা খুঁজতে লাগলেন। বললেন, “বুঝেছি। ইম্পর্টান্ট পয়েন্ট — আমাদের গুইংগামকে যে করেই হোক ডিসপোজেব্‌ল করতে হবে, যাতে স্বদেশে বিদেশে কারও কার্পেটের কোনো ক্ষতি না হয়।”

এবার হরিময়বাবু টাকে হাত বুলোতে লাগলেন। “কী একটা চমৎকার ইংরিজ টার্ম আছে, তোমার দাদু ভবনাথ সেন তাঁর লাস্ট উপন্যাসে লাগিয়েছেন — প্রত্যেক পদার্থ, এমন কী প্লাস্টিকের জিনিসপত্রকে ‘বাইবেল’ না কী হতে হবে।”

একটু দ্বিধা করে পিকলু এবার মনে করিয়ে দিল, “বাইবেল নয় হরিময়দাদা। বায়োডিগ্রেডেব্‌ল হতে হবে — অর্থাৎ নিজের স্বভাবেই আস্তে আস্তে পচে গিয়ে পঞ্চভূতে বিলীন হতে হবে, অক্ষয়-অমর হয়ে দুনিয়াতে টিকে গিয়ে গেরস্তকে কষ্ট দেবে না, এই প্লাস্টিক ব্যাগের মতন।”

খুব খুশি হলেন হরিময়বাবু। বললেন, “তোমাকে আর একটা গুইংগাম দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু স্টক ফিনিশ। সহসম্পাদক গুণধরকে আবার

আজ হ্যারিসন রোডে পাঠাতে হবে। ওখানে যা ট্রাফিক জ্যাম হয়, স্বেচ্ছায় কেউ যেতে চায় না!"

সহ-সম্পাদক! গুণধর তো এখানকার কাজের লোক, প্রতিদিন হরিময়বাবুর রান্নাও করে।

প্রশ্নটা আন্দাজ করে হরিময়বাবু উত্তর দিলেন, "ইয়েস, গুণধর আমার ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক, অর্থাৎ আমার ইকমিক কুকার। ইন্দুমাধব মল্লিক ইকমিক কুকার আবিষ্কার করেছিলেন বলেই সে যুগে অনেক দুঃসাহসী যুবক আমার মতন সংসারী না হয়েও সংসারে থেকে যাবার দুঃসাহস দেখাতে পেরেছিল। এখনও হাওড়ায় আমার ইকমিক কুকার রয়েছে, কিন্তু তা অপারেট করেন এই শ্রীমান গুণধর। কিন্তু লোকে বড্ড ভুল বোঝে। তাই চমচম পত্রিকার প্রথম পাতায় প্রতি সংখ্যায় ওর নাম ছেপে দিচ্ছি — কার্যনির্বাহী সহ-সম্পাদক গুণধর সামন্ত। ব্যাপারটায় একফোঁটা মিথ্যাচার নেই। হুকুম তামিল করার সংস্কৃত হলো কার্যনির্বাহী।"

চমচম পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যাটা হরিময়বাবুর টেবিলে পড়ে রয়েছে। ওটা এখনও সরকারি ভাবে প্রকাশিত হয়নি। তবু হরিময়বাবু তাজা কাগজটা পিকলুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "দেখতে পারো, পড়তে পারো, কিন্তু বাইরে নেওয়া যাবে না। এখনও ভোগ দেওয়া হয়নি! প্রতিটি সংখ্যার ফার্স্ট কপি বেলুড় রামকৃষ্ণমঠে যাবে, তারপর ডাকে দেওয়া, স্টলে পাঠানো এবং লেখকদের সৌজন্যসংখ্যা।"

এরকম নিয়ম কেন? পিকলু একটু কৌতূহলী হয়ে উঠলো। হরিময় বাবুর নাকি এ ব্যাপারে কোনো হাত নেই। সেই প্রথম সংখ্যা থেকে প্রতিষ্ঠাতা এই নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন। হরিময়বাবু মেনে চলেছেন।

"প্রতিষ্ঠাতা বংশগোপালবাবু ছিলেন পাগল মানুষ। তাঁর কথা তোমাকে একদিন বলবো। কী করে এই চমচম হলো।"

পিকলু দেখলো, হরিময়বাবুর চমচম পত্রিকার প্রথম পাতায় এই নজর আলি লেনের ১৪ নম্বর বাড়িটাকে নগর কার্যালয় বলে দেখানো আছে। হেড অফিস ও সদর কার্যালয় এখনও ৪২/৩ হিদারাম হালদার লেন,

মন্দিরতলা, শিবপুর, হাওড়া।

তারপরও অবাক করে দেবার পালা। লন্ডন, প্যারিস, নিউ ইয়র্ক, শিকাগো, ডালাস, ক্যালিফোর্নিয়া, স্যানযোসে এটসেটরা শহরের নাম ও এক একটা ঠিকানা ছাপানো রয়েছে। স্যানযোসে নামটার সঠিক উচ্চারণ যে স্যানহোসে তা জেনেও হরিময়বাবু আদি বানানটা লেখেন। "ইংজেরা যদি কথায় কথায় এদেশের গ্রামগঞ্জের ভুল নাম রাখতে এবং ভুল কথা লিখতে পারে তা হলে আমরাও বা সেই ফেসিলিটি পাবো না কেন?"

"স্টেটসম্যান, টাইমস অব ইন্ডিয়ারও এত শহরে অপিস নেই, যত আছে আমাদের মাসিক চমচমের।" সাফল্যের হাসি হাসলেন হরিময়বাবু। "এইটাই আমাদের চমচম পত্রিকার বৈশিষ্ট্য বলতে পারো। আসলে যেখানে-যেখানে আমাদের জানাশোনা বন্ধুবান্ধবদের ভাইপো-ভাইঝি অথবা নাতি নাতনীরা বসবাস করছে সেখানে-সেখানে তাদের নাম আমরা চমচমে ব্যবহার করছি — আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে আজকাল আর কাগজ চালানো যাবে না, বুঝলে মিস্টার পিকলু?"

"কিন্তু আপনার তো বাংলা কাগজ!" পিকলু সবিনয়ে মনে করিয়ে দিলো চমচম সম্পাদককে।

হরিময়বাবু এবার মাতৃভাষার গর্বে চোখ বন্ধ করে ফেললেন। "বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার! বুঝলে মিস্টার পিকলু। আমাদের মনে রাখতে হবে বাংলা স্রেফ হাওড়া-আমতা কিংবা শিয়াখালার ভাষা নয়। ওয়ার্লডের টপ পাঁচটা ভাষার একটা এবং অবশ্যই ইন্টারন্যাশনাল ভাষা। দুনিয়ায় এমন জনপদ নেই যেখানে বাংলা 'চলেব্‌ল' নয়। লাস্ট শব্দটা বুঝলে তো? নিউ বেঙ্গলি ফর 'চালু'। যত মাতৃভাষার মধ্যে ফরেন গ্যাস মিশবে, যত ভাষা থেকে বুদবুদ উঠবে, তত বাংলার 'হর্সপাওয়ার বেড়ে যাবে, যাকে তোমার দাদু যাকে বলেন কি না 'ঘোটকশক্তি'। আমি আবার খেয়ালের বশে সম্পাদকীয়তে লিখে বসলাম 'ভোল্টেজ'। তোমাদের দাদু হলেন কি না ভাষার বাল্মীকি। বললেন — বুঝছি তোমার যন্ত্রণা। তুমি বাংলা ভাষার ঝাল এবং তেজ একই সঙ্গে বাড়াতে চাও। ভাল কথা। কিন্তু,

তাই বলে, গরিব সায়েবদের পকেট মেরো না। তোমার দাদু এরপর শব্দটা ঠিক করে দিয়েছিলেন: 'ভোলতেজ'! তাঁর নীতি : অপরের শব্দ যত খুশি নিজের ঝুলিতে নাও, কিন্তু ঝুলিতে পুরবার আগে নিজের ভাষার মাধুরী একটু মাখিয়ে দাও! তাই ভোলের সঙ্গে তেজ!"

পিকলুর মুখের দিকে তাকিয়ে হরিময়বাবু বললেন, "তুমি ভাবছো সাহেবরা লুকিয়ে লুকিয়ে হাসবে? সে গুড়ে বালি। ওরা যে লুকিয়ে লুকিয়ে হাজার হাজার সংস্কৃত শব্দ চুরি করেছে, তার বেলা? এই তো কাল এক সন্ন্যাসী বললেন, জেলি শব্দটা সায়েবরা এখান থেকে তুলেছে। সংস্কৃতে আচারকে বলা হতো 'জালি'। তেঁতুলের নাম ইংরিজিতে কেমন করে ট্যামারিন্ড হলো? জিনিসটা যখন প্রথম পারস্য দেশে গেলো তারা ভাবলো এটাই বোধ হয় ইন্ডিয়ার বিখ্যাত আম, তাই নাম দিল তামর-ই-হিন্দ। যখন এই তেঁতুল ইউরোপে পৌঁছলো তখন নাম হয়ে গেলো ট্যামারিন্ড। শুধু টক নয়, মিষ্টিতেও চুরি। আমাদের চিনি সংস্কৃতে শর্করা, লাতিনে সক্কর এবং ইংরিজিতে সামান্য ভোল পাল্টে সুগার।"

কার্যনির্বাহী সহকারী গুণধর সামন্ত ইতিমধ্যে দুটো জামবাটিতে খাঁটি গণেশমার্কা সরষের তেলে মাখা মুড়িবাদাম এনে হাজির করেছে।

"মেক্সিকো থেকে আসা মশলাটা দিয়েছিস তো?" চিৎকার করে জানতে চাইলেন হরিময়বাবু।

"আমাদের মেক্সিকো প্রতিনিধি সোলেমান আলি কুরিয়ার মাধ্যমে এই মশলাটা পাঠিয়েছে। সোলেমান লাস্ট টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স ধরে নিয়মিত এবং ননস্টপ চমচম পত্রিকা পড়ছে।"

উ-উ-প করে একটা আওয়াজ হলো। ভীষণ ঝাল, ব্রহ্মতালুতে আগুন উঠে আসছে। "মেক্সিকো দেখছি চিটাগঙের বাবা! সুইসাইড করতে হলে এই মশলা এক চামচ মুখে ঢেলে দিলেই যথেষ্ট। সাধে কি আর ইকজফার সেন দাবি করেছেন, ইন্ডিয়ান রান্নায় আদিতে একেবারেই ঝাল ছিল না,

ইন্ডিয়াতে গোল মরিচ থাকলেও লঙ্কা এসেছে বিদেশ থেকে এই সেদিন পর্তুগিজদের খেয়ালে।"

ইকজফার কথাটির অর্থ পিকলুর মাথায় ঢুকছিল না। হরিময়বাবু ব্যাখ্যা করলেন, "তুমি অমর্ত্য সেনের নাম শোনোনি? হতেই পারে না।"

"তিনি তো ইকনমিস্ট!" বললো পিকলু।

একমত হলেন না হরিময়বাবু। "সে তো ওয়ান্স-আপন-এ টাইম, যখন ভদ্রলোক দিল্লিতে পড়াতেন। বিদেশে বসবাস করে করে অর্থনীতিবিদ থেকে ক্রমে ক্রমে হয়ে পড়েছেন দার্শনিক — সুতরাং ইকজফারটাই ওঁর রাইট টাইটেল। উনিই তো বলেছেন, এক একটা সভ্যতা বেমালুম অন্য একটা সভ্যতার জুস টেনে নিয়ে নিজের করে নিচ্ছে — যেমন ইন্ডিয়ান রান্না এখন ঝাল ছাড়া ভাবা যায় না — লঙ্কা খেয়ে হাঁসফাঁস করবার জন্যেই তো সায়েবরা গাঁটের কড়ি খরচ করে বিলেতের ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁয় যায়। অথচ এই ঝাল মোটেই ইন্ডিয়ার নিজস্ব নয়।"

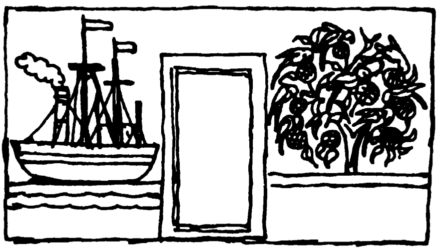
হরিময়বাবু এবার পিকলুকে জিজ্ঞেস করলেন, "গুয়াতেমালা, কিউবা এবং ভিয়েতনামে কোনও বাংলা জানা লোকের ঠিকানা জানো?"

ওইসব দেশের নামগুলো চমচমের প্রথম পাতায় ছাপবার জন্যে সম্পাদক হিসেবে হরিময়বাবুর মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠছে। "তোমার দিদি শতরূপার বিয়েটা মন্টিকার্লোতে হওয়ায় আমি ভবনাথবাবুকে স্পেশালি কংগ্রাচুলেট করেছিলাম — মন্টিকার্লোতে চমচমের একটা শাখা আপিস না থাকলে কাগজের ঠিক ইজ্জত হচ্ছিল না!"

পিকলু অর্থাৎ পুণ্যশ্লোক সেনের বাবা বহুদিন বোম্বাইতে বিখ্যাত বহুজাতিক কোম্পানি হিন্দুস্থান লিভারে কাজ করেন। ব্যাকবে রিক্লেমেশন অঞ্চলে ওঁদের সদর দপ্তরে হরিময়বাবু একবার গিয়েছিলেন। বিজ্ঞাপনের সন্ধানে।

ওইখানেই তিনি খবর পেলেন, প্রাত্যহিক স্নানের অভ্যাসটা এই ইন্ডিয়া থেকেই ইউরোপে গিয়েছিল। প্রচারসচিব ইরফান খান চমচম পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন বলে কৃতজ্ঞ হরিময়বাবু। এখনও সানলাইট ছাড়া

অন্য কোনও সাবান ব্যবহার করেন না। যা চুপি চুপি তিনি ভবনাথ সেনের কাছে স্বীকার করেছেন, জামার জন্যে একরকম সাবান, শরীরের জন্যে আরেক রকম সাবান, অতো সহ্য হয় না বলে জামাকাপড় কাচার আগে নিজের শরীরেও সানলাইট সাবান তিনি বুলিয়ে নেন— তাঁর ঝকঝকে তকতকে চেহারার এইটাই হল গোপন রহস্য।



পিকলু বোম্বাই থেকে অর্থনীতিতে বি-এ অনার্স পাশ করে, জোকার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টে পড়তে আসায় দাদু ভবনাথ সেন ও ঠাকুরমার আনন্দের অবধি নেই।

আই-আই-এম হোস্টেল থেকে পিকলু প্রতি উইকএন্ডে ভবনাথবাবুর সল্ট লেক ভবনে চলে আসে।

বাংলাটার ওপর এখনও তেমন দখল নেই, কিন্তু হরিময়বাবু আশ্বাস দিয়েছেন, "ঘাবড়াও মৎ! ভবনাথ সেনের নাতি মিস্টার পিকলুকে বাংলা শেখানো আর মাছকে সাঁতার শেখানো একই কথা!"

ভবনাথ সেন কিন্তু অতটা ভরসা পাননি। তিনি বলেছেন, "ইচ্ছে হলে পিকলু ইংরিজিতেই লেখা শুরু করো।"

হরিময়বাবু ভুল বুঝে মন্তব্য করেছেন, "তার মানে আপনি চাইছেন বিক্রম শেঠ এবং অরুন্ধতী রায়ের মতন লাখ লাখ টাকা আগাম পেয়ে

আপনার নাতি বড়লোক হোক।"

ভবনাথ প্রতিবাদ করেছেন। "আরে না, হরিময়। প্রথমে ইংরিজিতে লিখে পিকলুর হাতের আড়টা ভাঙুক — তারপর যথাসময়ে নিজেই বাংলায় লেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠবে। রক্তের টান, বংশের দুর্বলতা এসব তো মিথ্যা হতে পারে না।"

হরিময়বাবু সঙ্গে সঙ্গে অ্যাডভান্স বুকিং করেছেন। মিস্টার পিকলুর বাংলা প্রথম লেখাটা যেন চমচমে আসে!"

পিকলু কলকাতায় এসেই কিন্তু দৈনিক ইংরিজি কাগজে কিছু লেখালেখি শুরু করেছে।

আজ পিকলু যে নতুন ভূমিকায় ১৪ নম্বর নজর আলি লেনে উপস্থিত হয়েছে তা শুনে হরিময়বাবু ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়লেন।

"পিকলু, সারা কলকাতায় এতো বিখ্যাত লোক থাকতে আমাকে ইন্টারভিউ!"

হরিময়বাবু স্বীকার করলেন, "বুকের মধ্যে একটা পিকুলিয়র অস্বস্তি হচ্ছে! জজ যদি আসামি হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়ায় তা হলে এমন একটা অবস্থা হয়।"

পিকলু কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। অগত্যা সাক্ষাৎকারে চোখা-চোখা প্রশ্নের মুখোমুখি হবার জন্যে হরিময়বাবু রেডি হলেন। তাঁর সামনে আবার একটা ছোট্ট ব্যাটারি-চালিত টেপরেকর্ডার বসানো হয়েছে। আজকাল ইংরিজি কাগজের রিপোর্টাররা কেউ খাতাকলম খুলে সাক্ষাৎকার নেয় না। হরিময়বাবু নিজেও আর কোনও সাক্ষাৎকার নেন না। সেবার হ্যান্ডসেট কম্পোজিটারের অসাবধানতায় 'প্রশ্নকর্তা'র বদলে 'ক্ষৌরকর্তা' চমচমে ছাপা হয়ে যাওয়ায় তুলকালাম কাণ্ড, সবাই ভাবলো ইচ্ছে করেই এটা করা হয়েছে।

পিকলুর প্রশ্ন : "চমচমের প্রথম পাতায় কোথাও সম্পাদক হরিময় চৌধুরীর নাম খুঁজে পাওয়া যায় না কেন?"

"থেকেও নেই!" মৃদু হেসে ব্যাখ্যা করলেন হরিময়বাবু। "লাস্ট

লাইনটা আট পয়েন্টে ছাপা — কার্যনির্বাহী সম্পাদক ইন্দ্রলুপ্ত চৌধুরী! তোমার দাদু জানেন, চব্বিশ বছর বয়স থেকে আমার মাথায় টাক পড়েছে। ভারতের স্বাধীনতা ও আমার টাক — একই বয়সী, দুটোরই বয়স পাঁচ দশক। অভিধান খুললে যে কেউ দেখতে পারে টাকের ভাল নাম 'ইন্দ্রলুপ্ত' — সুতরাং বুঝতেই পারছো! এই অধমই ওয়ার্লডের ওনলি ছদ্মনামা সম্পাদক।"

"নিজের নাম ছাপাতে আইনগত কোনো বাধা আছে?"

তেমন প্রয়োজন হলে আদালতে এফিডেভিট করে ছদ্মনামটাই নিজের নাম করে নেবো। কই উত্তমকুমারের বেলায়, দিলীপকুমারের বেলায়, নারায়ণ গাঙ্গুলির বেলায়, সমরেশ বোসের বেলায় তো এসব কথা ওঠেনি! এসব তো ওঁদের পিতৃদত্ত নাম নয়।"

"ইন্দ্রলুপ্তবাবু, আপনার কাগজের নামটাও একটু অদ্ভুত — 'চমচম' কেন?"

"জন্ম থেকেই অন্য দশ জনের মতন আমরা মিষ্টান্নপ্রেমিক। শিবপুর বাজারে শ্রীদুর্গা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে বসে এই পত্রিকার প্রথম পরিকল্পনা করা হয়। পঞ্চাশবর্ষ পূর্তি সংখ্যায় সব বিস্তারিতভাবে পাওয়া যাবে। প্রথমে সবাই ভেবেছিল, এ কাগজের একটাই নাম হতে পারে — তা হল 'সন্দেশ', কিন্তু সহজবোধ্য কারণে সত্যজিৎ রায়ের পিতৃপুরুষের কথা ভেবে তা নেওয়া হলো না। তখন ঠিক হলো— লেডিকেনি। কিন্তু ওতে ইংরিজি ভাবটা প্রবল — ভারতের ময়রারা স্বাধীনতা সংগ্রামে তেমন কিছু দেয়নি, বরং লর্ড ক্যানিংয়ের সুন্দরী স্ত্রীর নামে স্পেশাল মিষ্টি উদ্ভাবন করেছে। সময়ের স্রোতে ক্যানিং এবং তাঁর রাজদণ্ড কোথায় ভেসে গেলো, কিন্তু লেডিকেনি এখনও হাজার বছর রাজত্ব করবেন।"

"তারপর?"

হরিময়বাবু জানালেন, "শেষপর্যন্ত সবাই বললো চমচম। একটু চটচটে, কিন্তু সে তো আর পত্রিকার দোষ নয়। আমাদের চমচম পত্রিকা কিন্তু শুরু থেকেই হিট।"

"তখন চমচম পত্রিকার প্রধান কার্যালয় কোথায় ছিল?"

"যেখানে এখনও আছে পঞ্চাশ বছর পরে! হাওড়া শিবপুরে বিখ্যাত জায়গা হিদারাম হালদার লেনে। আমাদের নজর আলি লেনের সিটি অফিস এবং হাওড়া প্রধান কার্যালয়ের নম্বর একই।"

"তা কী করে হয়?" পিকলু বলে উঠলো। "একটা নম্বর ১৪ আর-একটা ৪২/৩!"

"সোজ অঙ্ক মিস্টার পিকলু! বিয়াল্লিশকে তিন দিয়ে ভাগ করলে কত হয়? আমি তো একই নম্বর বলে নজর আলি লেনের বাড়িটা আঁকড়ে বসে আছি, নম্বর মনে রাখার খুব সুবিধে।"

এরপর ইতিহাসটা ক্রমশ প্রকাশিত হলো।

হরিময় চৌধুরী যা-তা লোক নন, ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনে দুর্জয় সাহস নিয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আনন্দবাজারে চাকরির জন্য অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুরেশ মজুমদারের কাছে ঘোরাঘুরি করেছিলেন বর্মণ স্ট্রিটে। যত রাজ্যের স্বদেশী করা লোককে আশ্রয় দিতেন এককালের বিপ্লবী পরাণদা ওরফে সুরেশ মজুমদার। চাকরি খোঁজার সময় হরিময়বাবুর কোথাও থাকবার জায়গা নেই, খাওয়ার জায়গাও নেই। সেই অবস্থায় হাওড়ার স্বাধীনতা সংগ্রামী, নেতাজীর অনুগত বিপ্লবী হরেন ঘোষ ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন থাকা ও একবেলা খাবার ওই ৪২/৩ হিদারাম হালদার লেনের বাড়িতে। কয়েকটি বালককে এর পরিবর্তে প্রাইভেট মাস্টারি করাবার কথা ছিল।

হরিময়বাবু বললেন, "এই প্রাইভেট টিউটরিটা না থাকলে মধ্যবিত্ত বাঙালির যে কী অবস্থা হতো! সকাল সন্ধ্যায় ছেলে পার করেও অনেক অভাবী বাঙালি শেষপর্যন্ত বিখ্যাত হয়েছে। ঈশান ঘোষ থেকে হরেন মুখুজ্যে পর্যন্ত ডজন ডজন নাম পেয়ে যাবেন। ইনক্লুডিং সুনীতি চাটুজ্যে এটসেটরা। তারপর উপন্যাসে দেখুন — সাহেব বিবি গোলামের ব্রজরাখাল চরিত্রটা। বাবুদের ঐতিহাসিক বাড়িটায় ব্রজরাখাল থাকতেন, ছেলেমেয়েদের পড়াতেন, আর ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ভক্তি করতেন, মস্ত

একটা ঐতিহাসিক ফোর্স বলতে পারো!"

খুব আগ্রহের সঙ্গে পিকলু শুনলো। চমচম পত্রিকা ইতিমধ্যেই প্রাইভেট টিউশনের ওপর বিশেষ সংখ্যা বার করেছে।

হরিময়বাবু সগর্বে জানালেন, "একেবারে বাম্পার সেল — হাওড়া এবং শেয়ালদা স্টলে শেষ পর্যন্ত এই সংখ্যা ব্ল্যাক হয়েছে। আড়াই টাকার বই সাড়ে সাত টাকায়।"

হরিময়বাবু আরও জানালেন, "ঐ সংখ্যার দু'খানা নিবন্ধ একেবারে যাকে বলে কিনা সুপার বাম্পার সাকসেস — 'শতপতি শিক্ষক কেমন করে কোটিপতি হতে পারেন' আর 'গ্রহনক্ষত্রের আলোকে প্রাইভেট ট্যুশানি'।" একটা প্রবন্ধের লেখক সদাস্নিগ্ধ সেন আর দ্বিতীয়টার রচয়িতা শ্রীভৃগু।

এঁরা কাঁরা জানতে চাওয়ায়, একটু দ্বিধার পর হাটে হাঁড়ি ভাঙলেন হরিময়বাবু। সলজ্জভাবে হরিময়বাবু জানালেন, "নাম ভিন্ন, কিন্তু মানুষ এক। মিস্টার পিকলু, দু'টিরই লেখক ইওরস্ ফেথফুলি এই অধম!"

হরিময়বাবু আরও জানালেন, "একদা বাংলার লাটসায়েব হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি অধ্যাপনার সময় এক ধনী ব্যবসায়ীর বাড়িতে ছেলে পড়াতেন। তাঁরাই একবার মাস্টারমশায়কে কিছু টাকা বাজারে খেলতে বললেন, শেয়ারবাজারে হরেনবাবুর হাজার টাকাই হয়ে গেলো লাখ লাখ টাকা। কিন্তু জাতমাস্টার হরেন্দ্রবাবুর টাকায় কোনো রুচি ছিল না, যথাসময়ে তিনি সব দান করে নিজের ফ্যামিলিকে ফতুর করে গেলেন। পয়সার অভাবে বিধবা বঙ্গবালাদেবী একসময় খুব কষ্ট পেয়েছিলেন।"

নিজের জীবনের গল্পটা হরিময়বাবু লিখতে লজ্জা পেয়েছেন। "সত্যি কথা বলতে কি মিস্টার পিকলু, নিজের গল্পটা লিখতে গেলে কলম সরতে চায় না, লজ্জা এসে যায়। বিপ্লব অন্দোলনের নেতা হাওড়ার হরেন ঘোষ আমার কাহিল আর্থিক অবস্থা দেখে বললেন, চিন্তা কোরো না। অগতির গতি বংশগোপাল বিশ্বাস এখনও হাওড়ায় রয়েছেন। পিকুলিয়র লোক এই বংশগোপালবাবু। অনেকদিন বোধহয় ক্যালকাটার বাইরে ছিলেন, বোধহয়

ইন্ডিয়ার বাইরেও কোথাও। এখন বয়স অনেক। তবে স্বদেশী করা লোকদের মনে মনে এখনও একটু পছন্দ করেন, যদিও মুখে ওসব কথা একেবারে তোলেন না। ইংরেজের সঙ্গে চটাচটি করতে কে চায় বলো? বংশগোপাল বরং আমাদের সঙ্গে রসিকতা করেন, কুইট ইন্ডিয়া বললেই ইংরেজ ভারত ছেড়ে চলে যাবে, এমন কথা গেঁধোটা ছাড়া আর কেউ ভাবতে পারে না। ভদ্রলোকের মনে মহাত্মাজি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ভক্তি ছিল না। বেশ কয়েক বছর ধরে বংশগোপাল বলে চলেছেন, গান্ধিই ইন্ডিয়াকে বড় একটা বিপদে ফাঁসিয়ে যাবেন।"

হরিময়বাবু বললেন, "আমরা তখন যাঁদের সঙ্গে মিশি তাঁরা সুভাষ বোস এবং জয়প্রকাশ নারায়ণের ভক্ত। বিয়াল্লিশের হিরো। কিন্তু মহাত্মাজি সম্বন্ধে আমাদের দুঃখ থাকলেও কোনও ঘৃণা ছিল না। বড়জোর একটু ভুল বোঝাবুঝি। আর এই বুড়ো বংশগোপাল বিশ্বাস বোধ হয় কট্টর বিপ্লবপন্থী। বোধহয় — ইংরেজকে মেরে তাড়ানো ছাড়া আর কোনও পথ আছে বলে তিনি বিশ্বাসই করতেন না।"

হরিময়বাবুর মনে আছে, হঠাৎ দেখলে বোঝবার উপায় ছিল না, বৃদ্ধ বংশগোপালের মনে কী রয়েছে। দেখা হলে, মোহনবাগান এবং শিশির ভাদুড়ি ছাড়া আর কোনও বিষয়ের উল্লেখ করতেন না।

শেষপর্যন্ত হিদারাম হালদার লেনের এই বংশগোপাল বিশ্বাসের নেকনজরে পড়ে গেলেন হরিময়বাবু।

"কখন যে কী ঘটে যায়," হরিময়বাবু স্বীকার করলেন। "ছেলে পড়ানো শেষ হলে, বংশগোপালবাবু প্রায়ই গল্প করার জন্য আমাকে ডাকতেন।"

স্মৃতিচারণ করে হরিময়বাবু বললেন, "ভদ্রলোক ছিলেন পিক্যুলিয়র প্রকৃতির — রাত সাড়ে বারোটা থেকে ভোর সাড়ে তিনটে পর্যন্ত কিছুতেই ঘুমোতে পারতেন না। রাতে কেবল ফলাহার — এই ফলার শেষ করে ঘড়ি ধরে সাড়ে-আটটায় শুয়ে পড়তেন। উঠে পড়তেন বিদ্ঘুটে সময়ে। তখন আমার খোঁজ করতেন। আমি তখনও রাত জেগে পড়াশোনা করি। উপায় নেই, রাতদুপুরে দু'জনে অনেকক্ষণ ধরে গপ্পো হত। ভেরি ভেরি

ইন্টারেস্টিং ক্যারাকটার মিস্টার পিকলু!"

পিকলু আগ্রহভরে জানতে চাইলো, বংশগোপালকে নিয়ে হরিময়বাবু ইতিমধ্যেই কিছু লিখেছেন কি না।

হরিময়বাবু জাতসম্পাদক। নিজে কিছুতেই গল্প-উপন্যাস লিখবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করেছেন। বললেন, "তোমার দাদুকে ঘটনাগুলো কিছুটা বলেছি। ওঁর হাতে এই বংশগোপাল বিশ্বাসের ক্যারাকটারটা খুব খুলবে।

দাদু শুধু জিজ্ঞেস করেন, ওইরকম বে-আক্কেলে সময়ে বংশগোপালের ঘুম প্রতিরাতে ভেঙে যেতো কেন? আমি দু'-একবার বৃদ্ধ বংশগোপালকে সে কথা যে জিজ্ঞেস করিনি এমন নয়। ভদ্রলোক মূল প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে উত্তর দিতেন, 'ষাট বছর ধরে এই অভ্যাস আমার। এখন আপনি জিজ্ঞেস করছেন, কেন ঘুম আসে না? আরে ইংয়ম্যান, পৃথিবীর সব কেনর কি উত্তর পাওয়া যায়? সবই ঠাকুরের ইচ্ছায়! ঠাকুর কাউকে ঘুম দেন, কারও ঘুম তিনি কেড়ে নেন। তাও তো আমি ফরচুনেট, অন্তত রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোতে পারি, বাড়িতে ডাকাত পড়লেও বোধহয় আমার ঘুম ভাঙবে না'।"

এই 'ঠাকুরের ইচ্ছে' কথাটা আধুনিক মননের পিকলু একেবারে সহ্য করতে পারে না। অলৌকিক কোনও ব্যাপারে সে থাকতে চায় না। ঠাকুর-ফাকুর পিকলু একেবারেই বোঝে না। সত্যজিৎ রায়ের বইতে সে পড়েছে, অনেকে ঠগ মহাপুরুষ সেজে এই সংসারে লোক ঠকায়।

হরিময়বাবু হাসলেন। "ঠাকুরের ইচ্ছে কথাটা কেউ কেউ মুদ্রাদোষে বলে থাকেন। তোমার দাদু অবশ্য রসিকতা করেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তো টাকাকড়ির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখতেন না; তা হলে 'মুদ্রাদোষ' কী করে হবে?"

বংশগোপালের ব্যাপারে ক্রমশ আরও কিছু জানা গেলো। তিনি বলতেন, "ঘুম সম্বন্ধে শত শত বই আমি পড়েছি, হরিময়। চার ঘণ্টার একটা সাইক্‌ল থাকে — তারপরে সহজেই একটা ব্রেক নেওয়া যায়।"

হরিময় তখন জানতে আগ্রহী। তা হলে তো বংশগোপালবাবু রাত

দশটায় ঘুমোতে যেতে পারেন। সে ক্ষেত্রে ভোর দুটোর আগে তাঁর ঘুম ভাঙবে না। সে চেষ্টা বংশগোপাল করেননি এমন নয়, কিন্তু কোনো ফল হয়নি।

বংশগোপাল বিশ্বাস একবার হরিময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছেন, "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ বইটা মন দিয়ে পড়লে দেখতে পাবে, ঠাকুর দেহত্যাগ করলেন কাশীপুরের বাগানবাড়িতে রাত্রি একটার পরে। সাড়ে বারোটা থেকে সেরাত্রে বাগানবাড়ির দোতলায় প্রবল উত্তেজনা — তখন কি কারও চোখে ঘুম আসে? তুমি বলো!"

হরিময়বাবু ঢোঁক গিলে পিকলুকে বললেন, "বড়লোকদের পিক্যুলিয়র সব খেয়াল থাকে। মনুষ্যজন্ম যখন হয়েছে তখন মৃত্যু তো আসবেই। যম তো কারফিউ বা সান্ধ্য আইন মানেন না, রাত দুপুরে তিনি সমন জারি করবেন না এমন কোনও কথা নেই। আর মিস্টার পিকলু, একটা জিনিস এখনও বুঝিনি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ রাতদুপুরে মর্ত্যলীলা সাঙ্গ করলেন বলে। হাওড়ায় হিদারাম হালদার লেনে একজনের মাঝরাতের ঘুম চিরকালের জন্যে নষ্ট হয়ে যাবে কেন?"

পিকলু উত্তর দিল, "দাদু বলেন, বেঙ্গলে নানা রকম পাগল আছেন, এখানে সব কিছুই সম্ভব! মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলের মঙ্গলের জন্যেও এখানে ভক্তরা তিন মাস রাত জেগে না খেয়ে বসে থাকতে পারেন।"

হরিময়বাবু বললেন, "বংশগোপালবাবুর পাল্লায় পড়েই আমার চায়ের নেশা হয়েছিল। মাঝরাতে গল্প করার সময় আমার ঘুম তাড়াবার জন্যে বংশগোপালবাবু অতো রাতেও ফ্লাস্ক থেকে গরম চা ঢেলে আমাকে খাওয়াতেন। এই ফ্লাস্ক তিনি সংগ্রহ করেছিলেন আমেরিকান এক মিলিটারি অফিসারের কাছ থেকে। অনেক খবর রাখতেন বংশগোপালবাবু। একবার বংশগোপাল বলেছিলেন, 'জানো হরিময়, স্বামী বিবেকানন্দর কোনও ফ্লাস্ক ছিল না? অথচ খুব চা খেতে ভালবাসতেন। আর ওঁর মেজভাই মহিমবাবু তো চা খেয়ে খেয়ে একবার সিরিয়াস ক্যাফিন পয়জন অসুখেই পড়ে গিয়েছিলেন'।"

মানুষটা যে কত কি জানতেন, কত সাবজেক্টেই যে বংশগোপালবাবুর গভীর আগ্রহ ছিল ভাবতে অবাক লাগে। মাঝে-মাঝে কিন্তু ভদ্রলোক বেজায় বিমর্ষ হয়ে পড়তেন।

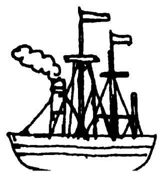
বংশগোপালবাবু তখন বলতেন, "হরিময়, পৃথিবীতে যত শক্ত কাজ আছে তা কম বয়সী ছেলেমেয়েরাই করবে। ওই যে, ঠাকুর বলতেন, ছোটরা হলো খাঁটি দুধ — একটু ফুটিয়ে নিলেই ঈশ্বরের সেবায় লাগবে।"

তারপর বংশগোপাল জিজ্ঞেস করেছিলেন, "এই ফুটিয়ে নেওয়া ব্যাপারটা কী বলো তো?"

হরিময়বাবু মাথা চুলকে উত্তর দিয়েছিলেন, "ওদের একটু তাতিয়ে নেওয়া, বাংলায় যাকে বলে কিনা অনুপ্রাণিত করা।"

বংশগোপাল একদিন বললেন, "শুনলাম, শ্রীদুর্গা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে বসে বসে তুমি একটা পত্রিকা বার করবার পরিকল্পনা করছো? শোনো হরিময়, বুড়োহাবড়াদের জন্যে এদেশে অনেক কাগজপত্তর আছে, ওসব লাইনে বেজায় ভিড়ও বটে। আমিও ছোটদের কথা ভাবছি কিছুদিন ধরে। তাদের জন্যে একটা কাগজ বার করা যাক। যার পরিকল্পনা আমার, দায়িত্ব তোমার।"

"তা জানেন মিস্টার পিকলু, কাগজ বার করা তো আর সোজা কথা নয়। জায়গা লাগে, ছাপাখানা লাগে, কাগজ লাগে, টাকা লাগে, লোকবল লাগে। কিন্তু মিস্টার বংশগোপাল বিশ্বাস আমাদের চমচম পত্রিকার জন্যে সব ব্যবস্থা করে দিলেন। হিদারাম হালদার লেনে বাড়িটার একটা অংশ আনন্দের সঙ্গে ছেড়ে দিলেন চমচমকে। বাড়ির কম্পাউন্ডেই ছাপাখানা বসিয়ে দিলেন। পত্রিকার এক বছরের পুরো খরচ আমার হাতে আগাম দিয়ে দিলেন।"



পিকলু তো অবাক। আশ্চর্য মেজাজের লোক তো এই বংশগোপাল! গাঁটের টাকা ঢাললেন, কিন্তু প্রকাশ্যে অথবা কাগজেকলমে পত্রিকার মালিক হলেন না, সেখানে বসিয়ে দিলেন হরিময়বাবুর নাম।

বংশগোপাল হেসে বলেছিলেন হরিময়বাবুকে, "আমার বয়স হয়েছে। তুমি ইয়ংম্যান। আমার মৃত্যুর পরেও অনেকদিন তোমাকে চমচম বার করতে হবে হরিময়।"

হরিময়বাবু বললেন, "পাগল লোক মশাই! লেখালিখি করতে খুব ভালবাসতেন। পুরনো দিনের অনেক পুরনো কথা জানতেন। কিন্তু দিনের বেলায় একটি কথাও নয়, ওই রাতদুপুরে আমাকে ঘুম থেকে তুলে বাড়ির দোতলায় নিয়ে গিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত বিষয়ে আলোচনা করতেন।"

মাঝে-মাঝে অবশ্য লিখিত নোট পাঠিয়ে দিতেন বংশগোপাল। জিজ্ঞেস করলে বলতেন, "হরিময়, বুড়ো লোকের মুখের কথার কোনও দাম নেই। চোখ বুজলে, কে আর জবানের সম্মান দেবে? বংশধরদের সামলে রাখার সবচেয়ে সহজ উপায় লিখিত নির্দেশ দিয়ে যাওয়া। এই সব সম্পত্তি যতটুকু করেছি, তার কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, যদি না আইনমতো কিছু ব্যবস্থা করে যাই।"

একরাতে বংশগোপাল বিশ্বাস হিদারাম হালদার লেনের বাড়িতে জেগে

বসে আছেন। হরিময়বাবু সেখানে হাজির হয়ে দেখলেন, তিনি দাড়িতে হাত বোলাচ্ছেন।

হরিময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বংশগোপাল বিশ্বাস বললেন, "আমাদের কালে ব্রাহ্মসমাজের মাথারা এই রকম দাড়ি রাখতেন; এখন আর এই দাড়ি ফ্যাশনেব্‌ল নয়। হিন্দুদের মধ্যে মাস্টারমশায় মহেন্দ্রনাথ গুপ্তর এরকম দাড়ি ছিল। আমি মধ্যিখানে অনেকদিন গোঁফ-দাড়ি সব কামিয়ে ফেলেছিলাম। তারপর একদিন কথামৃত পড়তে-পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ মাস্টারমশায়কে সামনে দেখতে পেলাম। ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম, দাড়ি কেন? উনি সুরসিক। উল্টে জিজ্ঞেস করলেন, ঠাকুরের দাড়ি কেন? আমি বললাম, পরমহংসমশায়ের চামড়া ভীষণ নরম ছিল, ক্ষুরের টান সহ্য করতে পারতেন না। দাড়ি রাখা ছাড়া উপায় নেই। মাস্টারমশায় হঠাৎ আমাকে বলে বসলেন, তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার ছিল। আমার কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগলো না।"

বৃদ্ধ বংশগোপাল রাতদুপরে হঠাৎ হরিময়বাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "এটা তো ভাল ব্যাপার নয়! মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত তো দেহরক্ষা করেছেন, নাইনটিন থার্টি টুতে। আর এখন এই নাইনটিন ফরটিসিক্সে আমার সঙ্গে দেখার করার সাধ কেন? বোঝা গেলো, বুড়ো মানুষ ভয় পেয়ে গিয়েছেন।"

হরিময়বাবু ভরসা দিলেন। "শুধু শুধু মৃত্যুর ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছেন আপনি। রাত্তিরবেলায় ওই কথামৃত বইটা অমন মনোযোগ সহকারে আপনি পড়বেন না।"

বৃদ্ধ বংশগোপাল রাতের অন্ধকারে তখনও অসহায় বোধ করছেন। হরিময়ের হাতটা ধরে বললেন, 'ইয়ংম্যান, আমার বয়স বিরাশি। এইট্টি পেরিয়ে মৃত্যুভয় থাকার কোনও মানে হয় না, আমারও নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয়, দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরকে ঠিক বোঝা গেলো না। কে যে কি চাইতেন তাঁর কাছে, আর কাকে যে তিনি কি দিতেন তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। ভাবতে গেলে আমার মাথা একেবারে গোলমাল হয়ে

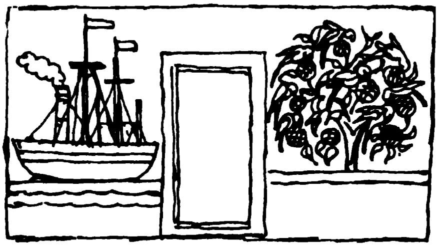
যায় হরিময়।"

হরিময়বাবু পিকলুকে বললেন, "মনে হতো, ব্রাদার, মানুষটা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানেন। কিন্তু সযত্নে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতেন। একদিন মুখ ফসকে বললেন, "মাস্টারমশাই লিখেছেন তাঁর কথা, কিন্তু সে আর কতটা? লিখতে যারা পারতো তারা কিন্তু লেখেনি। শশী, নিরঞ্জন, সারদা, তুলসী, নরেন। এরা তাঁর সম্বন্ধে প্রায় কিছুই লিখলো না। অনেক কিছু গোপন থেকে গেলো।"

হরিময়বাবু বললেন, "ভাই পিকলু, এই কথাগুলো শুনে তো আমি অবাক! রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ লিটারেচর আমিও কিছুটা পড়েছি কটকে বাল্যকাল কাটাবার সময়।"

বংশগোপাল নিজের খেয়ালেই একদিন হরিময়কে বললেন, "দিনলিপি লিখতো যদি শশী মহারাজ — ঠাকুরের নিত্য সেবক। তা হলে কী কাণ্ড যে হয়ে যেতো। কিন্তু তিনি কলম ধরলেন না। কথামৃতের মাস্টারমশাই তো শুধু ছুটির দিনে আসতেন। মাত্র কয়েকঘণ্টা শুনতেন সব কিছু, তারপর বাড়ি ফিরে গিয়ে ডায়েরিতে নোট করতেন। তবে শ্রুতিধর পুরুষ ছিলেন। শশী মহারাজও শ্রুতিধর — কিন্তু কি একটা ভেবে, সব বিবরণ চেপে গেলেন। শুধু ঠাকুরের নামটাই নিজের শরীরে বহন করে হয়ে গেলেন, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ!"

"তারপর?" জিজ্ঞেস করল ইয়ং পিকলু। ব্যাপারটা ক্রমশই বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে, যদিও ঠাকুর রামকৃষ্ণের ব্যাপারটা তাকে তেমন টানে না। গদগদ হয়ে সাধক পুরুষদের ভক্তি করতে গিয়েই তো দেশটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। এদেশে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি নেই, কোথাও একফোঁটা সায়ান্স নেই, সর্বত্র স্রেফ অন্ধ ভক্তি।



হরিময় একসময় হুড়মুড় করে পিকলুকে চমচম পত্রিকার আদিপর্বটা শুনিয়ে দিয়েছিলেন।

এই পর্বে এক এক গভীর রাতে নিশিজাগা বংশগোপাল বিশ্বাস লিখিতভাবে এক একটা বিষয় হরিময়ের কাছে উত্থাপন করতেন। তারপর আলোচনা চলতে-চলতে রাত তিনটে বেজে যেতো। বিপত্নীক বংশগোপালের চোখে তখনও ঘুম আসতো না। তিনি হরিময়বাবুকে বিদায় দিয়ে আলো নিবিয়ে হিদারাম হালদার লেনের দোতলায় পুব-দক্ষিণের ঘরটায় শুয়ে পড়তেন ঘুমের প্রত্যাশায়।

একদিন বংশগোপাল বললেন "আমি টাকা জুগিয়েছি বলে চমচম কাগজটা আমার জমিদারি নয়, হরিময়। কাগজের প্রাণ হলো তুমি, অ্যাজ সম্পাদক। এই আমি লিখিত নির্দেশ দিলাম, আমি মাঝে মাঝে লেখা পাঠালেও, তুমি মোটেই তা ছাপাতে বাধ্য থাকবে না। তুমি যদি আমার বাজে লেখা ছাপো তা হলে তোমার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া যাবে।"

সেই কাগজটা হরিময়বাবু কাচের ফ্রেমে বাঁধিয়ে এখনও হিদারাম হালদার লেনের সম্পাদকীয় দপ্তরে রেখে দিয়েছেন।

আরেক দিন গভীর রাতে বংশগোপাল বিশ্বাস অরেকটা কাগজ হরিময়ের হাতে তুলে দিলেন। চমচম পত্রিকা মাসিক পাঁচসিকে ভাড়ায় এই

হিদারাম হালদার লেনে থাকবে অনির্দিষ্ট কাল ধরে।

অদ্ভুত মেজাজ এই বংশগোপালের — ভাড়ার ব্যাপারে একটা আজব শর্ত আরোপ করেছেন। ভাড়া মাত্র পাঁচশিকে করা হলো এই শর্তে যে হিদারাম হালদার লেনের বাড়ির লাগোয়া যে উঠোন রয়েছে সেখানকার তুলসী মঞ্চে নিত্যপ্রদীপ জ্বালাবার দায়িত্ব থাকবে চমচম সম্পাদকের।

"আপনি এখনও তুলসীতলায় আলো দিচ্ছেন?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে পিকলু। "এতো বড় সম্পত্তির ভাড়া মাত্র পাঁচ সিকে!"

"ফিফটি ইয়ার্স ধরে প্রতি সন্ধ্যায় বংশগোপালের বংশে বাতি দিয়ে চলেছে এই চমচম ম্যানেজমেন্ট', সগর্বে জানালেন হরিময়বাবু। "তবে তো, এই যুগেও পাঁচসিকে ভাড়ায় বিশাল জায়গাটা চমচমের আয়ত্তে রয়েছে। ছাপাখানা, গোডাউন, অফিস ফার্নিচার এটসেটরা সব লিখিতভাবে চমচমকে দিয়ে দিয়েছেন বংশগোপাল। বলেছেন, সরস্বতী প্রেস শুরু করেছিল বিপ্লবীরা তিন হাজার টাকার সেকেন্ড হ্যান্ড মেশিন দিয়ে। তার আগে গৌরাঙ্গ প্রেস শুরু করেছিলেন বিপ্লবী সুরেশ মজুমদার, উইথ হেলফ ফ্রম স্নেহের গণেন।"

"ইনি আবার কে?" হরিময়বাবুর তখন এসব জানা ছিল না।

"গণেন মহারাজের নাম শোনোনি? সে কি? এই তো ক'বছর আগে বহু কষ্ট পেয়ে, অনেক মনোকষ্ট সহ্য করে, কম বয়সে দেহরক্ষা করলেন। ড্রামাটিক জীবন, আমার থেকে বয়স বেশ কম ছিল — ভেরি বোল্ড, ভেরি ব্রাইট। ছাপাখানার ব্যাপারটা খুব ভাল বুঝতো, সিস্টার নিবেদিতার বিশেষ ফেভারিট ছিল। শেষ দিকে গণেন মহারাজের ডায়াবিটিস হয়েছিল। আমাদের এই চমচম প্রেসও একদিন সুবিশাল হয়ে উঠবে — লাভের সব টাকা চমচম পত্রিকাকে আরও ভাল করবার জন্যে খরচ করা হবে।"

হরিময়বাবুর মনে আছে, সেদিন ছিল শনিবার। বংশগোপাল বিশ্বাস রাতদুপুরে খবর করলেন হরিময়বাবুর। দোতলায় আরাম কেদারায় বসে

তিনি বললেন, "লিখিত নির্দেশ রেখে গেলাম, তোমাকে মান্য করতে হবে।"

"আপনার দয়াতে আপনারই আশ্রয়ে রয়েছি, এসব আপনি কি বলছেন?"

পাতলা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বংশগোপাল বললেন, "শ্রীম যেভাবে আমাকে ট্রাবল দিয়ে চলেছেন তাতে ঠিক বুঝতে পারছি না। হয়তো ডেকে নেবেন। কিন্তু শোনো, তোমাকে কথা দিতে হবে, এই ৪২/৩ হিদারাম হালদার লেনের বাড়িটা চমচম কখনও ছাড়বে না, এই আমার অন্তিম ইচ্ছা।"

এই রকম অদ্ভুত রিকোয়েস্ট বাড়িওয়ালার কাছ থেকে কেউ কখনও শোনেনি এই দুনিয়ায়। কী করবেন, রাজি হয়ে গেলেন হরিময়বাবু, অন বিহাফ অফ দ্য চমচম।

এই যে নজর আলি লেনের ছোট্ট দোতলা বাড়ি এক কাঠা জমির ওপর এ তো বংশগোপালবাবুর প্রপার্টি। সেকালে কর্পোরেশনের নিয়মকানুন অতো কড়া ছিল না, তাই বাড়িটা হয়েছিল।

হরিময়বাবু মানুষটি তারপর এই এত বছর ধরে চমচম ছাড়া আর কোনও কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েননি।

অবিবাহিত মানুষ। রসিকতা করে হরিময় বলেন, "স্ত্রী বলো, পুত্র বলো, কন্যা বলো, নাতি বলো, নাতনী বলো সবই এই চমচম। এই কাগজের উত্তরোত্তর উন্নতি করার পুরো দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন বংশগোপাল বিশ্বাস। সেই বোঝা এই বৃদ্ধ বয়সেও বয়ে বেড়াচ্ছি। মাথায় টাক পড়েছে, কিন্তু মনে টাক পড়তে দিইনি। সেভেনটি সিক্স ইয়ার্সেও দাঁত পড়েনি, তবে মাঝে মাঝে আকস্মিক দন্তহর্ষ হয়।"

পিকলু একটু অসুবিধায় পড়ে গেলো, দাঁতের হাসি ব্যাপারটা কী?

হরিময়বাবু মজা পেলেন। "দেঁতো হাসি আর দন্তহর্ষ যে এক নয় তা তোমার দাদু ভবনাথ সেনকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে। উনিই সেবার ব্যাপারটা এক্সপ্লেন করলেন। দেঁতো হাসি মানে মেকি হাসি, হাসতে

হয় তাই হাসা। কিন্তু দন্তহর্ষ অতি সিরিয়াস ব্যাপার। দাঁত যখন সিরসির করে তখন লাইফে কোনও আনন্দ অবশিষ্ট থাকে না। এ-বিষয়ে বাংলায় সুযোগ্য আর্টিকেল লিখতে পারতেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ডেনটিস্ট ডাক্তার আর আমেদ। তিনি যখন নেই তখন রিকোয়েস্ট করবো ওয়াটার্লু স্ট্রিটের ডাঃ বারীন রায়কে, তবে এখন নয়। যখন চমচমের স্পেশাল সংখ্যা বেরুবে। বিষয় অনুযায়ী নামও ঠিক হয়ে রয়েছে, 'দন্তকৌমুদী' সংখ্যা।''

পিকলু নিজেও দাঁতের গোলমালে একটু-আধটু কষ্ট পায় — দাঁতে পোকা, দাঁতে গর্ত এবং আক্কেল দাঁত। সে এই সব বিষয়ে আগ্রহী। পিকলু বললো, ''আপনার এই দান্তে সংখ্যাটা খুব ভাল বিক্রি হবে হরিময়দাদা।''

হরিময়বাবু খুশি হলেন। টেকো মাথা দেখিয়ে বললেন, ''ওপরে ঘাস নেই, কিন্তু তা বলে ভেবো না জমি অনুর্বর — যা কিছু আইডিয়া গজায় সব ভিতরের দিকে। অন্তত দেড়শটা স্পেশাল সংখ্যার বিষয় ভিতরে স্টোর করা রয়েছে। ঠাকুরের ইচ্ছায়, কোনও দিন এই চমচম পত্রিকার স্পেশাল ইস্যুর বিষয়ের অভাব হবে না, শুধু বিষয়গুলোকে খেলিয়ে ভালভাবে লেখার লোক কমে যাচ্ছে। ভবনাথ সেনের মতন লেখক তো আর বঙ্গজননী এখন ডজন ডজন সৃষ্টি করছেন না, বুঝেছো মিস্টার পিকলু! আগে কিন্তু এমন খরা ছিল না, সম্পাদক চাইলেই সুযোগ্য লেখক পেয়ে যেতেন।''

পিকলু ততক্ষণে ঘড়ি দেখছে, হরিময়দাদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে ছুটবে সল্টলেকে। দাদুর টেবিলে বসেই ইংরিজি প্রবন্ধটা সোজাসুজি টাইপ করে ফেলবে। আজই খবরের কাগজে লেখা জমা দেবার ডেড লাইন।

ওইটুকু ছেলে পিকলু যে সাংবাদিক হিসেবে এমন কাণ্ড করে বসবে তা চমচম-সম্পাদক স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি!

আজ সকাল সাতটা থেকে নজর আলী লেনে হরিময়বাবুর সিটি অফিসে ঘন ঘন ফোন আসছে। খুব স্টাইলে হরিময়বাবু ফোন তুলে অ্যানাউন্স করছেন — ''দ্য চমচম!''

ভবনাথ সেনই তাঁকে শিখিয়ে দিয়েছেন, বাংলায় যা চমচম, ইংরিজিতে তা হয়ে যায় দ্য চমচম।

"দ্য স্টেটসম্যানে আপনার সম্বন্ধে দুর্দান্ত লেখা পড়লাম, শিশুবিভাগে।"

"তাই তো স্বাভাবিক, বুড়ো বিভাগে হরিময় চৌধুরীর তো এখনও অধঃপতন হয়নি।

গুণধরকে নিউজস্ট্যান্ডে পাঠিয়ে দু'খানা দ্য স্টেটসম্যান কিনিয়ে আনলেন হরিময়বাবু। আজ যা অবস্থা, শেষ পর্যন্ত চমচমের শেষ সংখ্যার মতন দ্য স্টেটসম্যান না ব্ল্যাকে চলে যায়। কাগজবিক্রেতারা বেজায় বুদ্ধিমান, কোনও বিশেষ গন্ধ পেলেই স্টকের সব কাগজ চেপে দেয়, তারপর প্রত্যেক কপি নগদ পাঁচ টাকায় বিক্রি করবে।

হরিময়বাবু ইংরিজি কাগজটা সবে খুঁটিয়ে দেখছেন। তাঁর চোখজোড়া বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। আড়াই কলম জুড়ে বিরাট ছবি তাঁর। "নিজের ছবি কখনও কাগজে দেখিনি ভাই, ফিফটি ইয়ার্স ধরে শুধু পরের ছবি চমচমে ছেপেছি।"

এক ভক্ত টেলিফোনে বললো, "হরিময়কাকু, আপনি তো সেবার সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন, আয়না অন্যকে প্রতিফলিত করে, কিন্তু নিজে কখনও প্রতিবিম্বিত হয় না।"

সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, ছবিটা কোথা থেকে পেলো তা এখনও বুঝতে পারছেন না হরিময়বাবু। সেদিন তো মিস্টার পিকলুর সঙ্গে কোনও ফটোগ্রাফার ছিল না। জানলে, কাপড়ের খুঁট দিয়ে টাকের চকচকে ভাবটা একটু মুছে নিতেন।

ভীষণ চিন্তিত হয়ে উঠেছেন হরিময়বাবু। কোথা থেকে কে কবে এই ছবি সংগ্রহ করলো? প্রাইভেসি বলে আর কিছু থাকলো না। সিরিয়াস সাবজেক্ট — গাঙ্গুরামের একটা বড় বাক্স থেকে সাজানো মিষ্টি চমচম দেখা যাচ্ছে, আর সেই বাক্স গদগদভাবে ধরে রয়েছেন সম্পাদক হরিময় চৌধুরী।

ব্যাপারটা যখন আরও রহস্যময় হয়ে উঠছে তখন স্বয়ং ভবনাথ সেন টেলিফোন করলেন। "হরিময়, আজ চমচমের গর্বের দিন। সমস্ত ইন্ডিয়ায়

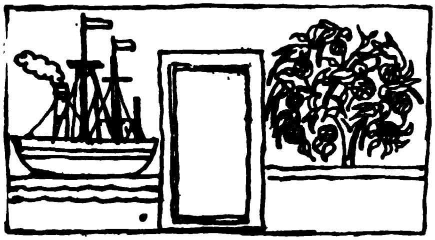
তোমার এবং তোমার কাগজের নামটা ছড়িয়ে পড়বে।''

''কিন্তু ছবির ব্যাপারটা আমাকে ভীষণ নার্ভাস করে তুলেছে স্যার। আমার অজ্ঞাতে আমার এমন ছবি কবে এবং কখন তোলা হলো? এ এক বিপুল রহস্য!''

খুব হাসলেন প্রবীণ সাহিত্যিক ভবনাথ সেন। ''তুমি সত্যিই হাসালে হরিময়। অপকর্মটি করেছেন চিত্রসাংবাদিক মনা চৌধুরী। বাংলার সমস্ত লেখকের ছবির যিনি চলমান ট্রেজারার! তোমার মনে নেই? সেবার আমার জন্মদিনে তুমি এক বাক্স মানিকতলা গাঙ্গুরামের টাটকা চমচম আনলে। তখন মনা চৌধুরী আমার বাড়িতে বসেছিলেন। তোমাকে হাসতে দেখেই ফ্ল্যাশ মারলেন। এবারে পিকলু ওঁর সঙ্গে চুপিচুপি যোগাযোগ করে ফ্রেম থেকে আমাকে বাদ দিয়ে তোমার ছবিটা বড় করে নিয়েছে।''

''পিকলু! পিকলু!'' এবার আনন্দে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন হরিময়বাবু। ''দাদুর খ্যাতি মনে হচ্ছে নাতি একদিন ম্লান করে দেবে। নাতির কলমের জোর ভীষণ, ভবনাথবাবু।''

''কচি কলম তো, ধার একটু বেশি থাকবেই,'' সস্নেহে বললেন লেখক ভবনাথ সেন।



বৃহস্পতিবার। একটু পরেই আবার ১৪ নম্বর নজর আলি লেনের বাড়ির কলিংবেল বেজে উঠলো।

দুজন অচেনা লোক (একজন দাড়িওয়ালা) আচমকা চমচম সিটি অফিসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা ঘরে ঢুকেই হরিময়বাবুর পালিশ-চটা তিন ফুট-বাই-দু'ফুট টেবিলখানা টোকা মেরে দেখতে আরম্ভ করেছে।

মাথায় হাত দিয়ে বসলেন হরিময়বাবু। এঁরা 'পুরাতনী' বলে এক অ্যান্টিক এজেন্সি খুলেছেন। এর পিছনে কৃপালনী বলে হংকংনিবাসী এক কোটিপতি সিন্ধি অনাবাসী ভারতীয় আছেন। লাখ লাখ টাকা ঢেলে পুরনো সব স্মৃতিবিজড়িত জিনিসপত্তর বিভিন্ন পরিবার থেকে ক্রমশ কিনে নিচ্ছেন এঁরা। কিছু দিন পরে এইসব দুষ্প্রাপ্য জিনিস থেকে কোটি কোটি টাকার মুনাফা উঠবে।

হরিময়বাবু দুই অজানা অতিথির হাতেও বড়বাজারের গুপ্তা ব্রাদার্স থেকে আনা গুজিয়ার পুরিয়া তুলে দিলেন। তারপর চা অফার করলেন। কৃপালনীর ম্যানেজার মিস্টার সামতানি বললেন, নেপোলিয়নের টয়লেটে যে কমোড ছিল তার এখন কত বিলিয়ন ডলার দাম উঠেছে জানেন? খোদ অস্ট্রিয়ার এম্পারার নিজে ওটা প্রেজেন্ট করেছিলেন নেপোলিয়ানকে কোনও একটা বড় যুদ্ধের পরে।"

মিলিয়ন এবং বিলিয়নে ভীষণ গোলমাল হয়ে যায় হরিময়বাবুর। "কোনটা যেন বড়?" তিনি জানতে চাইছেন, ব্যাপারটা মনে থাকে না।

"আরে মশাই, 'পুরাতনী'র বাজারে, মিলিয়ন কোনও ব্যাপারই নয় — নিতান্তই ছেলেমানুষ। জেনে রাখুন, হাজার মিলিয়নে এক বিলিয়ন হয়। অর্থাৎ একশ কোটি!"।

ঘেমে উঠেছেন হরিময়বাবু। অ্যান্টিক এজেন্সির পক্ষ থেকে মিস্টার সামতানি তাঁকে এই ভাঙা সম্পাদকীয় টেবিলখানার জন্যে নগদে তিরিশ হাজার টাকা অফার করছেন। এখনই কাঁচা টাকা গুঁজে দিয়ে এটা কিনে নিয়ে যেতে তৈরি তিনি এবং তাঁর সহকারী।

"চেপে রাখবেন না স্যার, আজই দ্য স্টেটসম্যান কাগজে মিস্টার পুণ্যশ্লোক সেনের প্রবন্ধে পড়েছি, আদি যুগের বিপ্লবীরা আপনার এই টেবিলে বসে কাজ করতেন। বিখ্যাত হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার উৎপত্তি হয়েছিল এই টেবিলে।"

চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠছে হরিময়বাবুর। ওঁদের দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে হরিময় ভিতরের খবর জানতে চাইলেন। সামতানি খাস বাংলা বলেন, নিউ মার্কেটের পিছনে চৌরঙ্গী লেনে সামতানির জন্ম।

সামতানি বললেন, "আজ সকালে কাগজে দেখলাম, যে-টেবিলে আপনি কাজ করেন সেটি বংশগোপাল বিশ্বাস আপনাকে দিয়েছিলেন, এই শর্তে যে এই টেবিলে সম্পাদকীয় কাজ হবে। এবং এটি এক সময় ব্যবহার করতেন অগ্নিযুগের বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত।"

তড়িৎ গতিতে কাজ করতে হয় প্রত্যেক অ্যান্টিক এজেন্সিকে। কাগজ পড়েই পুরাতনীর প্রতিনিধি সঙ্গে সঙ্গে হাজির হয়েছেন, ওঁদের মাইনে করা ঐতিহাসিক সখারাম সেনের কাছে। তিনি কোন এক ডি.আই.জি. সামন্তর লেটেস্ট বই খুলে বললেন, টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির গোড়ায় কুখ্যাত পুলিশ শামসুদ্দিন আলমকে কলকাতা হাইকোর্টের সামনে গুলি করে মেরে স্থানীয় দারোয়ানদের হাতে ধরা পড়েছিলেন বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ। তখন সব হইহই করা সিস্টেম — গুলি করে বীরেন্দ্রনাথ ধরা পড়লেন ২৪ জানুয়ারি, আর

বিচার শেষ করে বীরেনের ফাঁসি হয়ে গেলো ২১ শে ফেব্রুয়ারি।"

এই বীরেন দত্তগুপ্ত হাওড়ায় থাকতেন এবং এই টেবিল ব্যবহার করতেন। সামতানি বললেন, "এখন শহিদদের অ্যান্টিক বাজার একটু মন্দা। সূর্য সেনের একটা চিঠি দু'হাজার টাকাতেও কেনবার খদ্দের নেই। লোকে এখনও তেমন উৎসাহী হচ্ছে না, কিন্তু সামনে খুবই ভাল সময় আসছে। তখন এইসব জিনিসের দাম হু-হু করে বেড়ে যাবে, কিন্তু তখন হয়তো মালের সরবরাহ থাকবে না।"

হরিময়বাবু অবশেষে হাতজোড় করে বললেন, এসব কিছুই বেচবার ইচ্ছে তাঁর নেই। বরং যদি কখনও বাঘাযতীন মিউজিয়ম হয় সেখানে টেবিলটা দিয়ে দেবেন, কারণ দত্তগুপ্তর ফাঁসির আগে পুলিশ বুঝতে পেরেছিল এসবের পিছনে রয়েছে খোদ বাঘাযতীন। তখন মশাই সরষের মধ্যেই ভূত — যতীন মুখুজ্যে ছিলেন কলকাতার রাইটার্স বিলডিংসে খোদ হোম ডিপার্টমেন্টে স্টেনোগ্রাফার! ভাল কাজের জন্যে টপাটপ প্রমোশন পাচ্ছিলেন। দুঃসাহসটা এবং বুকের কলজেখানা বুঝুন।

এই সময় নজর আলি লেনে পিকলুর পুনরাবির্ভাব। আই-আই-এম জোকা ক্যামপাস থেকে সোজা সে চলে এসেছে হরিময়বাবুর সন্ধানে।

সাদর আহ্বান জানালেন হরিময়বাবু। "এসো, এসো মিস্টার পিকলু। পুরাতনীর মিস্টার সামতানি এবং কোম্পানির বিশ্বস্ত কর্মী মিস্টার স্যান্যালের সঙ্গে একটু আলাপ করো। এঁরা বলছেন, জিনিস যত পুরনো হয় তত তার দাম বাড়ে। অলরেডি, রবিঠাকুরের এক পেয়ার চটির দাম আঠাশ হাজারে উঠে গিয়েছে। কেনবার পার্টি রয়েছে বাংলাদেশে — চেক দিয়ে চটি নিয়ে চলে যাবে।"

পিকলুর কৌতূহলের শেষ নেই। সে জানতে চাইলো, "কার পুরনো চটির দাম এখন সবচেয়ে বেশি?"

সামতানি একটু ভেবে বললেন "দাম হলেই তো হলো না, মাল সাপ্লাই তো চাই। দিন না এক পেয়ার ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের চটি — আড়াই লাখ

টাকা ইজিলি পেয়ে যাবেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জিনিসের আগে তেমন বাজার ছিল না, এখন হচ্ছে। ভক্তেরা যক্ষের মতন স্মৃতিগুলো আগলে রেখেছেন। বিক্রির কথাই ওঠে না। প্রাইস হুহু করে বেড়ে যাচ্ছে, অথচ বাজারে কোনও সাপ্লাই আসছে না।"

পিকলু জিজ্ঞেস করলো, "কেন? সময় চলে যাচ্ছে বলে?"

সামতানি বললেন, "আমরা স্যর অ্যান্টিক ডিলার, অতশত বুঝি না। লোকে দাম দিতে চাইলে আমরা জিনিস খুঁজে দিই। ইদানীং ফরেন থেকে অনেক এনকোয়ারি আসছে — রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে, সারদা দেবী সম্বন্ধে, বিবেকানন্দ সম্বন্ধে। এমনকি রাজামহারাজ সম্পর্কে। তাই দামও চড়চড় করে বাড়ছে। শ্রীশ্রী মা সারদা দেবীর একটা পিতলের ঘটি আমরা লন্ডনে গোপনে সাপ্লাই করেছি — এক লাখ আশি হাজারে। অথচ বিদ্যাসাগরের ব্যবহৃত গাড়ুর কোনও দাম পাচ্ছি না — অথচ কার্মাটার থেকে ওটা স্পেশালি সংগ্রহ করতে আমাদের সতেরশ টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে।"

সামতানি ও তাঁর সাকরেদ বেশ ভাব জমিয়ে নিয়েছেন হরিময়বাবুর সঙ্গে। তিনি বোধ হয় ইতিমধ্যেই পুরাসংগ্রহ সম্পর্কে চমচমের বিশেষ সংখ্যার কথা ভাবছেন।

সামতানিও বেশ খুশি, হরিময়বাবুর সঙ্গে কথা হয়ে গেলো, হিদারাম হালদার লেনে তাঁরা যাচ্ছেন শীঘ্রই। আজই ওঁদের যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তা সম্ভব নয়। কারণ একটা সায়েববাড়ির টেন্ডার দেবার জন্যে এখান থেকে মেরিলিন পার্কে ছুটতে হবে।

সামতানি বললেন, "পয়সা তো এখন সায়েববাড়ি ভেঙেই! পুরনো সব বাড়িতে বার্মা টিক, ইটালিয়ান মার্বেল, ভেনিশিয়ান কমোড রয়েছে। লোকে এসব কেনবার জন্যে উঁচিয়ে আছে! কলকাতা সায়েববাড়ির মড়ক লেগে গিয়েছে স্যার, সব পুরনো বাড়ি ডেভেলপারদের রাক্ষুসে নজরে পড়ে গিয়েছে। সায়েববাড়ি ভেঙে ফেলে দেশলাইয়ের বাক্সর মতন ফ্ল্যাট না-তোলা পর্যন্ত কলকাতার কারও চোখে ঘুম নেই। আমরাও টুপাইস করছি সায়েববাড়ির সর্বনাশের দৌলতে।"

পিকলু এতক্ষণ সামতানির সহকারিকে মন দিয়ে দেখেছে। দাদু ভবনাথ সেনের একটা গল্প গত রাত্রে সে পড়েছে প্রত্যেক মানুষের মুখেই একটা বিশিষ্টতার ছাপ থাকে, সেটা স্মরণে রাখলে চিনতে কখনও ভুল হয় না। হরিময়বাবুর ডান চোখটা মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যায় এবং কয়েক মুহূর্তের জন্যে তাঁর চোখের পাতা পিটপিট করে।

সান্যালের বিশেষত্বটাও একটু ভাবতেই নজরে পড়ে গেলো। ভদ্রলোকের উপরের ঠোঁটে সূক্ষ্ম একটা লম্বা কাটা দাগ রয়েছে — বোধ হয় ঠোঁটকাটা অবস্থায় জন্ম। তারপর প্লাস্টিকসার্জেন চমৎকার মেরামতি করে দিয়েছেন। এবড়ো-খেবড়ো দাঁত, কাটা ঠোঁট, ট্যারা চাহনি এসবের যন্ত্রণা আজকাল টাকা থাকলে মানুষকে আর সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হয় না। জয় হোক বিজ্ঞানের।

তোতলা এবং মূকবধিরদের এই রকম একটা ডাক্তারি গতি হলে বেশ হতো। হরিময়বাবুক বলে লাভ নেই। এখনই চমচমের একটা বিশেষ সংখ্যার পরিকল্পনা পাকা করে ফেলবেন। এমনিতেই তো দন্তশূল সংখ্যার জন্যে তিনি প্রচণ্ড উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। পিকলুকে রিকোয়েস্ট করেছেন, একটা স্পেশাল প্রবন্ধ খাড়া করবার জন্যে ইংরিজিতে। তারপর হরিময়বাবু নিজেই সেটা ঝরঝরে বাংলায় অনুবাদ করে নেবেন।

সান্যাল ও সামতানির লোকটি ওঠবার কোনো আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। হরিময়বাবু হাতজোড় করে বললেন, "শহিদ বীরেন দত্তগুপ্তর টেবিল তিনি ব্যবহার করছেন বটে, কিন্তু বিক্রি করবার মালিক নন। বংশগোপাল বিশ্বাস মশায় এইসব জিনিস বিক্রি করা সম্পর্কে কোনো নির্দেশ রেখে যাননি।"

অতি সরল মানুষ এই হরিময়বাবু। তিনি সরল মনে চমচমের আদিপর্বে বংশগোপালবাবুর বদান্যতার সব কাহিনী পুরাতনীর দুই প্রতিনিধির কাছে নিবেদন করলেন।

এঁরা মন দিয়ে সব শুনলেন। তারপর বিস্ময় প্রকাশ করলেন। এরকম অদ্ভুত বাড়িওয়ালার কথা তো ইতিহাসে শোনা যায়নি। ভাড়াটেকে লিখিত নির্দেশ দিচ্ছেন, কিছুতেই হিদারাম হালদার লেন ছেড়ে যাওয়া চলবে না।

হরিময়বাবু উৎসাহের সঙ্গে ব্যাখ্যা করলেন, "মনে রাখতে হবে, এখানে সব কিছু স্পেশাল। যেমন স্পেশাল চমচম পত্রিকা, তেমন স্পেশাল তার প্রতিষ্ঠাতা এবং শুভানুধ্যায়ী বংশগোপাল বিশ্বাস।

সামতানির আগ্রহ যেন বাড়ছে। "উনি কি কোনো শোক বা মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন, সেই সময়?"

হরিময়বাবু বিরক্ত হলেন। "বিষয়ী লোক আমরা। নজরটা একটু নিচু। তাই ভাবছি, বংশগোপাল বিশ্বাস স্বেচ্ছায় কোনো মহান কাজ করে যেতে পারেন না। আরে মশাই, লোকটার আলমারিতে ঠাসা ঠাসা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বই ছিল। যাঁরা এই সব নিয়ে চর্চা করেন তাঁরা অবশ্যই একটু অন্যরকম হতে পারেন।"

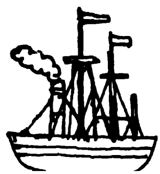
কেন জানি না, এই দুটি লোককে পিকলুর ভাল লাগছে না। হরিময়বাবু বোধ হয় বুঝছেন ব্যাপারটা। তিনি হাতজোড় করে সামতানি ও সহকারীকে বললেন, "আপনারা তো ভালই বাংলা বলেন। লিখুন না এই সব পুরনো জিনিসের কথা আমাদের চমচমে। শ্রীশ্রীমায়ের ব্যবহৃত ঘটির বিবরণটা পাঠকরা নেবে।"

প্রায় জোর করেই এবার দু'জনকে বিদায় দিলেন হরিময়বাবু। এই ভদ্রলোক দু'জন নাছোড়বান্দা। জানিয়ে গেলেন, তাঁরা আবার যোগাযোগ করবেন নজর আলী লেনে।

"এখানে নয়, বরং আপনারা খবর করবেন আমাদের প্রধান কার্যালয় হিদারাম হালদার লেনে," অনুরোধ করলেন হরিময়বাবু। ওঁরা বিদায় নিতে হরিময়বাবু বললেন, "আমার বুদ্ধিটা দেখলে! ইচ্ছে করেই হাওড়ার ঠিকানাটা দিয়ে দিলাম। ওখানে যা ট্রাফিক জ্যাম হচ্ছে, খুব টান না পড়লে কেউ ওদিকে যাবে না সমস্ত দিনটা নষ্ট করতে।"

হরিময়বাবু এবার শ্রীমান পিকলুকে অভিনন্দন জানালেন। চমচম সম্পর্কে যেসব চাঞ্চল্যকর সংবাদ সে ইংরিজিতে লিখেছে তা যে ভবনাথ সেনের বিশেষ সাহায্য ছাড়া সম্ভব হতো না তা তিনি আন্দাজ করেছেন।

হরিময়বাবু বললেন, "পিকলু তুমি আই-আই-এম জোকার ম্যানেজমেন্ট পাঠক্রম ঝপ করে সেরে ফেলো। তারপর দুর্গানাম করে নেমে পড়ো দাদুর এই লেখার লাইনে। ইংরিজি এবং বাংলার একই সঙ্গে লেখনি চালনা করলে সারা দুনিয়ায় হই-চই পড়ে যাবে।"



পিকলুর মখে এই মুহূর্তে তেমন হাসি ফুটছে না।

সে বললো, "ঠোঁটে কাটা দাগ লোকটাকে মোটেই ভাল লাগলো না, দাদু।" পিকলু বোধ হয় অজানা কোনো আশঙ্কার আগাম গন্ধ পাচ্ছে।

হরিময়বাবু অবশ্য ব্যবপারটা হাল্কা ভাবে নিতে চাইছেন। "হারাবার কিছু থাকলে তবে তো ভয়? চমচমে আমাদের কিছু লুকোবারও নেই, হারাবার নেই।"

কিন্তু তাঁর মনেও যে কিছু চিন্তা জমা হয়ে আছে তা হরিময়বাবু লুকিয়ে রাখলেন না।

ইংরিজি কাগজে এতো সুনাম বেরিয়েছে চমচমের, তবু যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হবার কারণ রয়েছে হরিময়বাবুর।

পিকলু বুঝতে পারছে, হরিময়বাবুর মনে তেমন আনন্দ নেই। সেই সেব্আর যখন এই কলকাতাতেই সর্দির ভাইরাস চোরদের মুখোমুখি

হয়েছিলেন তখনও ওঁর মুখে এইরকম আধা-মেঘলা ভাবছিল।

এবার একটু নাড়া দিতেই হরিময়বাবু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করলেন, "সকাল থেকে ফোন তো এলো সাড়ে-সাতাশটা, কিন্তু কাজ কী হবে?"

সাড়ে ব্যাপারটা হরিময়বাবু নিজেই বুঝিয়ে দিলেন। "পুরো ফোন এলো সাতাশটা, কিন্তু একটা হাফ। ফোন এলো, হ্যালো বললাম, কিন্তু কোনও উত্তর কানে এলো না। বোধ হয় হাওড়া কিংবা শিয়ালদার পাবলিক বুথ থেকে কেউ ফোন করছিল। কয়েন ফেললেও কখনও কখনও কাজ হয় না, তখন গোটা কয়েক থাপ্পাড় লাগাতে হয় টেলিফোন বক্সে। যে ফোন করেছিল সে বেচারা বোধ হয় জানে না।"

কাজ বলতে এই মুহূর্তে হরিময়বাবুর মাথায় যা ঘুরছে তা হলো পত্রিকার সার্কুলেশন। যে সাতাশজন সকাল থেকে ফোন করেছেন তাঁরা যদি ঝপ করে চমচম পত্রিকার গ্রাহক হয়ে যেতেন তা হলে মন্দ হতো না! চাঁদার বাৎসরিক হার ২৯ টাকা নিরানব্বই পয়সা, দ্বিবাৎসরিক ৫৭ টাকা নিরানব্বই পয়সা, আর তিন বছরে নব্বুই টাকা নব্বুই পয়সা। এই নয়া পয়সার কায়দাটা হরিময়বাবু বাটা কোম্পানির জুতো থেকে নিয়েছেন। একশ টাকা আর নিরানব্বুই টাকা নিরানব্বুই পয়সার মধ্যে আকাশপাতাল তফাত — মনস্তত্ত্ব নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়ে কানাডিয়ান জুতো কোম্পানির সায়েবরা এসব বার করেছেন। পিকলু বলেছে, "তিন বছরের গ্রাহক চাঁদার অঙ্ক আপনার গোলমাল হয়ে গিয়েছে হরিময়দাদা।"

একগাল হেসে হরিময়বাবু জানালেন, 'ইচ্ছে করেই ব্যাপারটা করা হয়েছে মিস্টার পিকলু। যাতে কেউ দু'বছরের কেউ বেশি গ্রাহক না হয় — তিন বছর পরে ছাপার কাগজের রিম কত হবে কে জানে?"

হরিময়বাবুর ধারণা, কাগজের মিলেও কিছু অভিশাপ আছে। প্রথমে টিটাগড়ের পেপার মিলের কাগজে চমচম ছাপা হতো, সে মিলে তালা পড়লো। তারপর বেঙ্গল পেপার মিলের কাগজে ছাপা হতো, সে মিলও অসুস্থ হলো। তারপর আই-পি-পি, সে মিলও অসুস্থ হলো — এখন স্থানীয়

মিলের কাগজ সাপ্লায়াররা ভয় পেয়ে যায় চমচম ছাপা হবে শুনলে। তারা বলে, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাগজ নিন, একবার উড়িষ্যার জে-কে, একবার কর্ণাটকের মাণ্ডিয়া, একবার অন্ধ্রপ্রদেশ, একবার ইন্দোনেশিয়ান ফরেন, যাতে একটা মিলের ওপর অপয়া ভাবটা না গিয়ে পড়ে।"

একটু পরেই পরিস্থিতির পরিবর্তন। এক অজানা পাঠিকা ফোনে দু'বছরের গ্রাহক হতে চাইলেন। হরিময়বাবু বুঝছেন পিকলুর কলমের জোর আছে। এই ফোন পেয়ে হরিময়বাবুর স্থির বিশ্বাস স্টেটসম্যানে একটা প্রবন্ধের জোরেই বেশ কিছু গ্রাহক আসবে। স্পেশাল আশার একটা কারণ যে-ভদ্রমহিলা ফোনে গ্রাহক হতে চাইলেন তিনি সাউথপয়েন্ট ইস্কুলের শিক্ষিকা। হরিময়বাবু শুনেছেন, পৃথিবীর কোনো ইস্কুলে এতো ছাত্রছাত্রী নেই — এরা যদি সবাই চমচমের গ্রহক হয়ে যায়, তাহলে হরিময়বাবু তো একলা সামলাতেই পারবেন না!

এবার বীরের মতন তাকাচ্ছেন হরিময়বাবু। পিকলুকে তিনি বললেন, "তোমার দাদুর ধারণা, আমার মাথায় কোনও বিজনেস বুদ্ধি ঢোকে না, ঢুকলে কবে নাকি আমি চমচমের দাম দশ টাকা রেঞ্জে নিয়ে যেতাম। তোমার দাদু বুঝছেন না, আমি আরও চালাক। অতি কম লাভ এবং অত্যধিক সার্কুলেশন, এই হচ্ছে চমচমের বিজনেস পলিসি। বাড়িওয়ালা বংশগোপাল বিশ্বাস মশায়ের মুখে শুনেছি, কথামৃত প্রথম খণ্ড প্রকাশ করার সময় লেখক শ্রীম পরামর্শ নিয়েছিলেন বসুমতীর উপেন মুখোপাধ্যায়ের। তিনি বলেছিলেন, ভাল কাগজে এবং অত্যন্ত ভাল ছেপে, ভাল দামে বইটা বিক্রি করতে। দূরদর্শী মাস্টারমশাই শেষ ভাল ত্যাগ করে প্রচণ্ড সস্তায় প্রথম খণ্ড শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ছেড়েছিলেন স্রেফ চার আনা পার কপি প্রফিট রেখে। ফলে হই হই পড়ে গেলো। আসলে মাষ্টারমশাই বুঝেছিলেন, কাঞ্চনের প্রতি টান যত কমবে কাঞ্চন ততই তোমার পিছু নেবে।"

"দাদুকে আপনার অর্থনৈতিক পলিসিটা বুঝিয়েছেন?" জানতে চাইছে শ্রীমান পিকলু।

পিকলু জানে দাদু ভবনাথ সেনও একটু সেকেলে। সারাক্ষণ দুনিয়ার

সব মানুষের মঙ্গল চাইছেন তিনি। এইটাই নাকি বাংলা সাহিত্যের ধারা।

ম্যানেজমেন্ট ইস্কুলে পড়ে পিকলু এখন কিছুটা খবরাখবর রাখছে। সে বলেছে, "দাদু, পৃথিবীর সবার মঙ্গল একসঙ্গে চাইলে শেষ পর্যন্ত কারও মঙ্গল হবে না। দুনিয়ার বড় বড় লেখকরা এটা ভালভাবে বুঝেছেন।"

দাদু তর্কে নামেননি। মৃদু হেসেছেন, কিন্তু এই বয়সে তিনি যে তাঁর মত পাল্টাতে চান না তাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

"জানো দাদু, মুম্বাইতে এমন ফিল্ম রাইটার আছন যাঁদের খোদ ওয়ার্ডেন রাডে তিনখানা ফ্ল্যাট আছে। প্রত্যেকের ইমপোর্টেড গাড়িও আছে।"

ভবনাথ এসব খবর বিস্তারিতভাবে একবার লেখক বিমল মিত্তিরের কাছে শুনেছিলেন। কিন্তু সেজন্য তাঁর মধ্যে কোনো হিংসে নেই।

ভবনাথ নিজের লেখার টেবিলে বসে মা সরস্বতীর সাধনা করতে-করতে বলেছিলেন, "আমার কোনও দুঃখ নেই, পিকলু ভাই। গল্প লিখে, উপন্যাস লিখে, প্রবন্ধ লিখে সংসারতো চালিয়ে দিয়েছি কোনও রকমে। শেষ বয়সে ঠাকুরের দয়ায় সল্ট লেকে একটা সাড়ে সাতশ স্কোয়ার ফুটের বাড়িও হয়েছে। তোমার বাবাকে যাদবপুরে কম্পিউটার টেকনলজি পড়িয়েছি, আর কি চাইতে পারে একজন বাঙালি লেখক, পিকলু?"

"দাদু, তুমি জানো না, এখন ইন্ডিয়ান রাইটাররাও বই ছাপার আগে কোটি টাকা অ্যাডভান্স পাচ্ছেন!" বললো পিকলু।

ভবনাথ হাসলেন। "ওসব ভবিষ্যতের জন্যে। নতুন যুগে যারা নতুনভবে লিখবে তারা জনস্বীকৃতি এবং সেইসঙ্গে অর্থসুখ পাবে। আমাদের বাংলায় যেমন সম্পাদক, যেমন প্রকাশক, তেমন লেখক, সবারই এক অবস্থা। আর্থিক টানাটানি। জানো পিকলু, স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানা বই বছরে মাত্র বিশখানা বিক্রি হয়! বিশ কোটি বাঙালি রয়েছে পৃথিবীতে, অন্তত এক কোটি নতুন বাঙালি জন্ম নিচ্ছে প্রতি বছরে, তবু স্বয়ং মহাকবির এই অবস্থা, আমরা তো কোন ছার।"

নিজের কথা সব সময় না ভেবে দাদু মাঝে মাঝে তাঁর অনুগামী হরিময়

চৌধুরীর কথাও ভাবেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন "হরিময়ের লোক চলে গেলে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবে কারা?"

চমচমের সম্পাদককে ভবনাথ সেন মাঝে মাঝে বকাবকিও করেন। যুগের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পরামর্শ দেন। কিন্তু ভবনাথ মনে মনে হরিময়ের তারিফ করেন। তাঁর মতে, "এঁরা হলেন খোদ মা সরস্বতীর পাণ্ডা — এঁরা না থাকলে দেবীদর্শন অসম্ভব। এঁদের টিকিয়ে রাখাটা ভক্তদেরই কাজ।"

পিকলুর ঠাকুমার নাম কে বিলাসিনী দেবী রেখেছিলেন কে জানে? কারণ এই বয়সেও তাঁর মধ্যে বিলাসের নামমাত্র নেই। সংসারের সব কাজ বিলাসিনী একা করেন। বাংলা বই লিখে যে ভবনাথ সংসার চালাতে পেরেছেন এবং সংসার চালিয়েও যে মাথা গুঁজবার ঠাঁই হয়েছে এবং স্বামী যে এতো সম্মান অর্জন করতে পেরেছেন তাতেই ঠাকুরমার গর্ব।

পিকলুর বাবা বহুবার মুম্বাই থেকে বাবাকে নিয়মিত টাকা পাঠাতে চেয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "বাবা কত দিন আর কষ্ট করবেন? হিন্দুস্তান লিভারে আমার চাকরিটা তো খারাপ নয়। এবার আমাকে আমার কর্তব্য করতে সুযোগ দিন।"

চিঠি পেয়ে দাদু হেসেছেন। বলেছেন, "লেখার কষ্ট কোনো কষ্টই নয় পিকলুভায়া — সব লেখক চায়, মরবার সময়েও যেন হাতের কলম হাতে থাকে। লেখকের সব চেয়ে কষ্ট যখন কলম শুকিয়ে আসে, অথচ মনের মধ্যে লেখার আগ্রহটা পুরো থেকে যায়।"

এরপর ভবনাথ সেন তাঁর ছেলেকে চিঠি লিখেছেন, "আমাদের দিন ভালভাবেই চলে যাচ্ছে, বিপদে-আপদে দেখবার জন্যে তুমি, বউমা ও পিকলু তো রইলেই। আপাতত আমি লেখা নিয়ে ব্যস্ত অছি।"

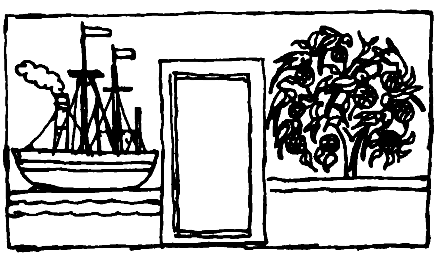
চমচম সম্পাদকও ভবনাথের জীবনের এসব কথা জানেন। তবে ইদানীং মাঝে-মাঝে তিনি হতাশায় ভোগেন।

আজ দুপুরের দিকেও নজর আলি লেনে আরও কয়েকটা টেলিফোন এলো। বোঝাই যাচ্ছে, সবাই ইংরিজি কাগজে পিকলুর লেখাটা পড়েছে।

হরিময়বাবু একসময় পিকলুকে বললেন, "ভীষণ সিক্রেট একটা আইডিয়া এসে গিয়েছে — চমচমের ইংরিজি সংস্করণ প্রকাশ করলে কেমন হয় বলো তো? নামটা 'ফ্রুটকেক' বা ওই ধরনের একটা কিছু করতে হবে।"

"কেন? বাংলায় চমচমে আপনার ক্লান্তি আসছে নাকি হরিময়দাদা?" জিজ্ঞেস করেছে ইয়ং পিকলু। সে চায় বাংলার এইসব বিশিষ্ট জিনিস সগর্বে এবং স্বমহিমায় টিকে থাকুক এবং প্রতিটি সংখ্যা আরও ঝলমলে হয়ে উঠুক।

পিকলুর বাবাও মুম্বাইতে বসে হিন্দুস্তান লিভারের বন্ধুদের বাংলার লিট্‌ল ম্যাগাজিন সম্বন্ধে একই কথা বলেন। খোদ প্রবাসী পত্রিকাও প্রথমে এইভাবে ক্ষুদ্রাকৃতিতে প্রকাশিত হয়েছিল। পিকলুর বাবার অফিস-সহকর্মীরা একমত যে কয়েকটা ব্যাপারে বাঙালিরা এখনও একটু আলাদা।



হরিময়বাবু গম্ভীর মুখে বললেন, "চমচম মার্কেট রিসার্চের রিপোর্টটা আজকেই এলো, মিস্টার পিকলু। তোমার এবং তোমার দাদুর কথামতো গোপনে জানতে চেয়েছিলাম, পাঠকের মনে চমচমের স্থান কোথায়? কী তারা চাইছে? কোন বিষয়ে লেখা তাদের মনের মতো হবে?"

রিপোর্ট যে আদৌ ভাল নয় তা সম্পাদকের মুখ দেখে পিকলু আন্দাজ

করে নিচ্ছে।

হরিময়বাবু ফিসফিস করে বললেন, "এই মুহূর্তে কলকাতার বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই আমাদের চমচমে। বেশকিছু ইংরিজি ইস্কুলের ছেলেমেয়ে হোল লাইফে চমচমের একটা সংখ্যাও পড়ে দেখেনি। তারা বলেছে, এই ধরনের কাগজ তাদের দেখবার সময়ও নেই। ভবনাথ সেনের নাম শুনেছে তারা, তবে বাংলা গল্পের লেখক হিসেবে নয়, হিন্দি টি. ভি সিরিয়াল 'ঘটঘটাও'-এর দৌলতে!"

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন হরিময়বাবু, তারপর বললেন, "অথচ এই নবেল প্রথমে চমচমেই বেরিয়েছিল। বাংলায় নাম ছিল 'চলমান'। পাবলিকের নজরে তেমন আসেনি।

মার্কেট রিসার্চ কোম্পানি চমচম কর্তৃপক্ষকে গোপন উপদেশ দিয়েছেন, অমিতাভ বচ্চন, আজারহারউদ্দীন আর শচীন তেণ্ডুলকর এই তিনজনকে দিয়ে একটা জয়েন্ট-ধারাবাহিক উপন্যাস লেখাবার চেষ্টা করতে এক্সক্লুসিভলি ফর চমচম। অন্য কোনো ম্যাগাজিনে এই উপন্যাসের একলানইও আগামী তিন বছরের মধ্যে পাওয়া যাবে না, আর সেই ঘোষণাটা ডিডি এবং স্টার টিভিতে প্রত্যেক এগারো মিনিট অন্তর বিজ্ঞাপন করা বিশেষ প্রয়োজন।

"পাগল!" বলে উঠলেন হরিময়বাবু। তারপর পিকলুকে জিজ্ঞেস করলেন, "টিভিতে এর জন্যে কত খরচ হতে পারে? লাখ তিনেক?"

"পাঁচ ছ' কোটি টাকা!" মার্কেটিং-এর ছাত্র পিকলু হিসেব করে বললো।

পাথরের মতন বসে রইলেন হরিময়বাবু। "পিকলু, তুমি ইংরিজিতে আমার সম্বন্ধে না-লিখলেই ভাল করতে। অমিতাভ বচ্চনের বাবা কবি হরিবংশ বচ্চনের কবিতার অনুবাদ অমি চমচমে ছেপেছিলাম। অমিতাভর শ্বশুর তরুণ ভাদুড়িও লেখা দিতে রাজি হয়েছিলেন চম্বলের মেয়ে-ডাকাত সম্বন্ধে। কিন্তু সে-লেখা ভোপাল থেকে আসবার পথে রহস্যজনকভাবে পথে ডাকে চুরি হয়ে গেলো। আমারই ভুল, ভি-পিতে লেখা পাঠাতে বলা

উচিত ছিল! তরুণ ভাদুড়িমশাই লোকটি বড় ভাল মানুষ ছিলেন।"

"ভি-পি করে লেখা পাঠানো?"

"হ্যাঁ, বাইরের অনেক লেখক সম্পাদক সম্মানী দেবেন কি না বিশ্বাস করতে না-পারলে লেখাটা ভি-পি করতেন হাতে হাতে টাকা পাবার জন্যে।"

হরিময়বাবু এবার রিপোর্ট দিলেন। "মার্কেট রিসার্চ কোম্পানির মিস্টার জয়বিক্রম তলাপাত্র ফোন করেছিলেন। লোকটি বিচক্ষণ, বাঙালিদের আর্থিক এবং মানসিক অবস্থা বোঝেন। তিনি বললেন, অমিতাভ বচ্চন এবং ক্রিকেটারদের পাকড়াও না করতে পারলে আপনাকে একমাত্র রক্ষে করতে পারেন ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। নেতাজি এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণ এই দুটো বিষয়ে পড়তে বাঙালিরা কখনও ক্লান্ত হয় না। রিসার্চে একথা প্রায়ই বেরিয়ে পড়ে।"

"সেই সঙ্গে বোধ হয় উত্তমকুমার।" পিকলু তার নিজস্ব মতামত দিল।

"না, মিস্টার পিকলু। উত্তমকুমারকে নিয়ে চমচমে আমি কিছু করতে পারবো না। সঙ্গে সঙ্গে সুচিত্রা সেনের প্রসঙ্গ চলে আসবে। যেমন রামকৃষ্ণের কথা তুললেই বিবেকানন্দ হাজির হয়ে যান। মাথা টানলে কান আসবেই।"

একটু থামলেন হরিময়বাবু। "একটা খবর আমি চুপি চুপি পাচ্ছি, সুচিত্রাদেবীও চুপি চুপি ঠাকুরের মস্ত ভক্ত হয়ে উঠছেন। বরানগর মঠ যেখানে ঠাকুরের আদি ভক্তরা তাঁর মৃত্যুর পর আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার লাগোয়া এক বেলতলা ছিল। সেই বেলতলা এতোদিনে নিজের খরচে অথচ খুব গোপনে কিনে দিয়েছেন সুচিত্রা সেন। সিনেমার কোনো কাগজ হাতে থাকলে এই জমি কেনার খবরটাই বড় বড় করে বেরিয়ে যেতো, হৈ হৈ পড়ে যেতো ভক্ত সমাজে।"

পিকলুর ইচ্ছে আরও খবর জোগাড় করে সুচিত্রা সেন সম্বন্ধেও ইংরিজিতে একটা প্রবন্ধ লিখে বসে।

ইতিমধ্যে হরিময়বাবু চোখবুজে গভীরভাবে চমচম সম্বন্ধে কীসব

ভাবতে শুরু করেছেন।

চোখ খুলে হরিময়বাবু বেশ উঁচুগলায় বললেন, "গুণধর আমাদের দু'জনকে এখনই 'শীঘ্রভোজন' দাও। সুভাষচন্দ্রের শতবার্ষিকী আর রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সেন্টেনারি দুটোই পড়েছে নাইনটিন নাইনটিসেভেনে, আর চুপচাপ বসে রয়েছে চমচম। হতে পারে না।"

শীঘ্র-ভোজনের সহজ বাংলা হলো কুইক লাঞ্চ। কিন্তু গুণধরকে তিনি পুরনো বাংলা কথাটাই শিখিয়েছেন।

অর্ডার দেওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই যে-খানা অতিথির সামনে উপস্থিত হয় না তাকে হরিময়বাবু শীঘ্র-ভোজন বলতে রাজি নন।

এবার একটা লম্বা টুলে দুটো কাঁসার থালা সাজিয়ে দিল গুণধর। হরিময়বাবু ঘোষণা করলেন:"পৃথিবীর ফাস্টেস্ট ফাস্ট ফুড — ম্যাকডোনাল্ড কোম্পানির বাবা পেরে উঠবে না — রাইস্‌ড্‌ রাইস, অর্থাৎ কিনা ভাতে-ভাত। হাঁড়িতে জল গরম করে, তার মধ্যে চাল, হাঁসের ডিম এবং ডিফারেন্ট ভেজিটেবল একসঙ্গে ছেড়ে দাও। তারপর উনুন থেকে নামিয়ে খাঁটি গণেশ মার্কা সরষের তেল দিয়ে মেখে নাও, উইথ নুন।"

এবার প্রথম দলাটা মুখে পুরে দিয়ে চোখ বুজে হরিময়বাবু বললেন, "অতি উত্তম শীঘ্র-ভোজন। সুড়ুৎ করে গলা দিয়ে নেমে যায় মুম্বাই মেল স্পিডে।"

পিকলুরও বেশ ভাল লাগছে এই গরম ভাতে-ভাত। যে জিজ্ঞেস করলো, "কোন ম্যাগাজিনে এই শীঘ্রভোজনের আইডিয়াটা পেলেন হরিময়দাদা?"

"ম্যাগাজিন নয় ভাই, স্বয়ং ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণর রেসিপি — এক জায়গায় তিনি বলছেন, সংসারী লোকেদের বারফাট্টাই, ভাতের হাঁড়িতে আলুপটলের লাফালাফি! আঁচ সরিয়ে নিলেই সব শান্ত!"

হড়হড়ে ভাত গিলে খেতে খেতে হরিময়বাবু ঘোষণা করলেন, "যদি কখনও ভাতে-ভাত নিয়ে সগৌরবে কাগজে নিবন্ধ রচনা করো, তাহলে লিখো, বিশ্বখাদ্যসম্ভারে পেটরোগা বাঙালিদের এইটাই শ্রেষ্ঠ অবদান। জিভে

ঘা, দাঁতে ব্যথা, গলায় চোঁয়া ঢেকুর এটসেটরা ডোন্টকেয়ার করে রেকর্ড দু' মিনিটে খানা শেষ করে ডেলিপ্যাসেঞ্জার বাঙালি যে অফিস টাইমের সঙ্গে এতো দিন লড়াই করতে পেরেছে তার পিছনে রয়েছে এই রাইসড-রাইস!"

খাওয়া শেষ করে মৌরি চিবোতে চিবোতে হরিময়বাবু চিন্তিতমুখে জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে এখন কী করা?"

পিকলু তার বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়া অভিজ্ঞতায় হরিময়বাবুকে পরামর্শ দিলো, "অন্য সব পরিকল্পনা কোল্ড স্টোরেজে জমা রেখে আপাতত চমচমের দুটো স্পেশাল 'নেতাজি' ও 'রামকৃষ্ণ' সংখ্যা নিয়ে চিন্তা করুন।"

ডিপ ফ্রিজ, কোল্ড স্টোরেজ এইসব নতুন কথা হরিময়বাবু খুব পছন্দ করেন। শুনতে পেলেই নোট বইতে সংগ্রহ করে রাখেন — চমচমের 'শব্দমালা' ফিচারের জন্য। এই তো 'টেফলন' কথাটা শিখলেন গতবার পিকলুর কাছে –– এমন রান্নার বাসন যাতে রান্না জড়িয়ে যায় না! ইংরিজি কাগজে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে 'টেফলন' বলা হয়েছে, কারণ সংসারে থেকেও সংসারে জড়িয়ে পড়তে চাননি তিনি।

পিকলু বললো, "হরিময়দাদা, চমচম পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা দুটো সম্বন্ধে দরাজ হয়ে ভাবুন।"

"কিন্তু খরচ? "হরিময়বাবু হতাশ ভাবে প্রশ্ন তুললেন।

"হরিময়দাদা, সম্পাদকের পক্ষে খরচের জন্যে চিন্তা করা আজকাল সেকেলে ব্যাপার হয়ে গিয়েছে," বললো পিকলু। "আপনি যে মডার্ন কাগজগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না! আজকাল খরচাপাতি যা করার সব করে স্পনসর।"

স্পেনসার হোটেলের কথাটা আগে শুনেছেন হরিময়বাবু। কিন্তু স্পনসর রহস্যটা তিনি তেমন জানেন না।

পিকলু বোঝালো, "আগে ভক্তরা এবং সেবায়েতরা টাকা দিয়ে, প্রণামী দিয়ে যা করতো এখন স্পনসররা চেক পাঠিয়ে তাই করেন। যেমন

আপনার কাগজের আদি স্পনসর মিস্টার বংশগোপাল বিশ্বাস।"

জিভ বার করে হরিময়বাবু বললেন, "বালাইষাট! উনি আমাদের চমচমের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রমোটার।"

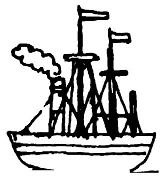
পিকলু হেসে বললো, "আপনার হাতে যদি প্রচারের বড় যন্ত্র থাকে, তাহলে হাসতে, কাঁদতে, স্নান করতে, আপনি স্পনসর পেয়ে যাবেন।"

"স্নান করতে?"

"ইয়েস হরিময়দাদা। একবার পুরীতে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার জন্যে স্পনসর আহ্বান করে দেখুন না। ওয়ার্লডের সমস্ত সাবান কোম্পানি পুরিতে পাঁচতারা হোটেলে বসে গরম হাঁড়িতে আলুপটলের মতন লাফালাফি করবে। শুধু বলতে হবে হামাম স্নানোৎসব, অথবা লাইফবয় স্নানযাত্রা, কিংবা মার্গো ফেস্টিভ্যাল।"

আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন চমচম সম্পাদক। "তার মানে, তোমার কর্ম তুমি করো, চিনি জোগাবেন চিন্তামণি। এই চিন্তামণিই হচ্ছেন আজকালকার স্পনসর!"

ফিসফিস করে দু'জনের মধ্যে আরও কিছু কথা হলো। হরিময়বাবু ভীষণ খুশি হলেন, প্রবল উৎসাহে তিনি টগবগ করছেন।



একটু পরেই পিকল্ ও হরিময়বাবু একসঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন, দক্ষিণ কলকাতার নজর আলি লেন থেকে।

পিকলু যে নিঃশব্দে একটি ঝকঝকে মোটরসাইকেলের মালিক হয়েছে তা জানতেন না হরিময়বাবু।

"দাদু কিনে দিয়েছেন, পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট হয়েছে বলে। কলকাতায় নিজের বাহন না-থাকলে চলে না হরিময়দাদা। বম্বের মতন সুবার্বন ট্রেনের সুবন্দোবস্ত নেই কলকাতায়।"

"টোটো কোম্পানির ম্যানেজারদের পক্ষে অবশ্যই আদর্শ যন্ত্র এই মোটরসাইকেল," স্বীকার করলেন হরিময়বাবু। "আমাদের চমচমে "মোটর সাইকেল সংখ্যা' বার করলে চলবে ভাল। ওইসময় ভবনাথবাবু যদি হুণ্ডা মোটরসাইকেলকে ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে স্পেশাল একটা স্টোরি লিখে দেন তা হলে তো ফাটাফাটি কাণ্ড হয়ে যাবে। পাতিরাম নির্ঘাত আড়াইশ কপি একস্ট্রা নিয়ে নেবে। বাংলাদেশেও বাড়তি পাঁচশ কপি চমচম চলে যাবে।"

তড়াং করে মোটরসাইকেলের পিলিয়নে চড়ে বসলেন হরিময়বাবু, বিন্দুমাত্র ভয় পেলেন না। আর ভটভট আওয়াজ করে বুলেটের বেগে নতুন যন্ত্রে স্টার্ট দিলো পিকলু।

স্পনসর! স্পনসর! একমনে জপ করছেন চমচম পত্রিকার অভিজ্ঞ সম্পাদক হরিময়বাবু।

স্পনসর অনেকটা সেকালের পরীর মতন, সমস্ত পার্থিব চিন্তা মুছে দিয়ে সম্পাদকের সব আর্থিক দায়দায়িত্ব নিয়ে নেবে, প্রয়োজনে টাকার হরির লুট ছড়াবে, আর হাল্কা শরীরে বিপুল উৎসাহে চমচম এগিয়ে যাবে নিজের মেজাজে। সুভাষ বসু, শ্রীরামকৃষ্ণ এঁরা দেশের জন্যে এবং মানুষের জন্যে কত কি করে গিয়েছেন। এঁরা স্পনসরবিহীন হয়ে থাকবেন একথা পিকলু ভাবতেই পারছে না।

বেশ কিছুক্ষণ মোটর সাইকেল চালিয়ে হরিময়বাবুকে একটা ঝকঝকে আপিসের সামনে নিয়ে এলো পিকলু। নামকরা এম-এন-সি অফিস বা বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান। প্রবেশের কাচের দরজা ঠেলতেই কুলকুল করে ঠাণ্ডা হাওয়া ঘামে ভেজা শরীর শীতল করলো।

সম্পাদকের মনে পড়লো, আগেকার দিনে কলকাতার মেট্রো সিনেমায় এই স্বর্গসুখ পাওয়া যেতো। হরিময়বাবু ম্যাটিনি শো-তে টিকিট কেটে মেট্রোর লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে এক ঘণ্টা এই ঠাণ্ডাসুখ উপভোগ করে সিনেমা না দেখেই হাওড়ায় চলে আসতেন।

আ হা! সেই সুখ এখন কলকাতায় বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে! কে বলে কলকাতার অধঃপতন হয়েছে? সমস্ত গায়ে কে যেন ঠাণ্ডা হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

অফিস কাউন্টারে তরুণী মেমসায়েব ঝকঝকে শাড়ি পরে মা দুর্গার মতন বিশ্বভুবন আলো করে বসে আছেন। সামনে কত টেলিফোন এবং আরও কত যন্তর। হরিময়বাবুর সন্দেহ হলো এই মা দুর্গার ঠোঁটে সিঁদুর দেখেই রাজশেখর বসু বোধ হয় সেবার লিখেছিলেন, "মা, তোমার ঠোঁটের সিঁদুর অক্ষয় হোক।"

ওয়েটিং হলকে আপিস বলে মনেই হচ্ছে না, যেন কোনো সিনেমার সাজানো সেট!

পিকলু চুপি চুপি হরিময়বাবুকে মনে করিয়ে দিলো, "এদের বিরাট

বিজনেস। রঙের কারবার, কেমিক্যালের কারবার, সেইসঙ্গে ওষুধের কারবার।" এইখানেই পিকলুর সহপাঠীর দিদি গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেন।

একটু পরেই শাড়ি-পরা আর এক মা দুর্গা প্রতীক্ষাগারে আবির্ভূতা হলেন। পিকলু ও হরিময়বাবু দুজনকেই তিনি নিজের আপিসঘরে নিয়ে গেলেন।

অদ্ভুত এই অফিসঘর — দেওয়াল আছে অথচ নেই। আসলে, কাচের পার্টিশন্, ফলে হলঘরের সব দেখা যাচ্ছে। অথচ নিজের প্রাইভেসি পুরো অক্ষত রয়েছে।

নতুন দিদি তাঁর ঘরের একটা আলমারি খুলে তিন টিন কোক্ বার করলেন — একেবারে হিমশীতল! ক্যান কোক আগে কখনও খাননি হরিময়বাবু। দেখলেন ফুটো করতে হয় না পেরেক দিয়ে। স্রেফ পাত্রের একটা কান ধরে টান দিলো পিকলু। এবার ক্যানের গর্তের মধ্যে একটা প্লাস্টিকের মোটা খড়কে ঢুকিয়ে নিলো। হরিময়বাবু হারতে রাজি নন, পিকলুকে হানড্রেড পার্সেন্ট অনুসরণ করে, খড়কের মাধ্যমে তিনিও ঠাণ্ডা কোকের রসাস্বাদন শুরু করলেন।

এই মা দুর্গা পিকলুর সব কথা শুনলেন। তারপর চমচমের লেটেস্ট সৌজন্য সংখ্যাটা নেড়েচেড়ে দেখলেন। সন্দেশ পত্রিকার কথাও তিনি তুললেন। সন্দেশে এই কোম্পানি মাঝে-মাঝে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, স্রেফ সত্যজিৎ রায়ের প্রতি সম্মান দেখাতে। "বিজ্ঞাপনের আবেদনপত্রে সত্যজিৎবাবু নিজে সই করতেন! ভাবা যায় না! সই-করা সেই আবেদনপত্রগুলোর দাম এখন সুভেনির হিসেবে হুড়মুড় করে বেড়ে যাবে।"

মিষ্টির দোকানেও সন্দেশের দর সব সময়ে চমচমের থেকে অনেক বেশি হয়। এইটাই বিশ্বসংসারের নিয়ম, অস্বীকার করে লাভ নেই। হরিময়বাবু দুটো পয়সার লোভে মিথ্যাচার করবেন না।

সেকেন্ড মা-দুর্গাটি খুব হিসেবী। সব শুনে ভরসা দিলেন এবং স্পনসরশিপের জন্য লিখিত প্রস্তাব পাঠাতে উপদেশ দিলেন। যে দেশে

যেরকম নিয়ম! আগে হরিময়বাবু শুনেছিলেন, অজানা কোনও মেয়েকে অযাচিতভাবে কোনো 'প্রস্তাব' পাঠাতে নেই। এখন সময় পাল্টেছে। সায়েবরা বোধ হয় লিখিত প্রস্তাব পেতেই ভালবাসে!

অফিস থেকে বেরিয়ে আসবার সময় হরিময়বাবু বললেন, "এ কোম্পানিতে নিশ্চয় কেউ আপিস কামাই করে না — বাড়িতে এতো ঠাণ্ডাসুখ পাবে কোথায়? সম্ভব হলে লোকে রবিবারেও আপিস করতে চাইবে!"

রাস্তায় নেমে পিকলু বললো, "নেতাজি সংখ্যার কাগজগুলো আজই তৈরি করে পাঠাতে হবে। কম্পিউটারে আবেদন তৈরি করতে হবে। ম্যানুয়াল টাইপরাইটারে লেখা চিঠি ওদের নজরে পড়বে না! মস্ত ব্রিটিশ অফিস তো।"

ব্রিটিশ শব্দটা শুনেই মুষড়ে পড়লেন হরিময়বাবু। ব্যাপারটা তাঁর মোটেই ভাল লাগছে না।

"কী হলো?" বুঝতে পারছে না পিকলু।

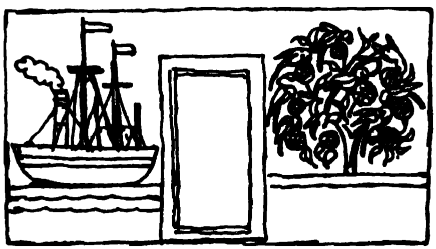
হরিময়বাবু উত্তেজিতভাবে বললেন, "মিস্টার পিকলু অত্যাচারী ইংরেজদের তাড়াবার জন্যে আমাদের নেতাজি দেশত্যাগী হলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করলেন, আর তাঁর শতবর্ষে গাঁটের কড়িতে যাতে হাত না পড়ে তার জন্যে ইংরেজ কোম্পানির কাছে ভিক্ষের হাত পাতবো এটা হয় না। তোমার দাদু শুনলে ভীষণ রাগ করবেন। চমচমের নেতাজী সংখ্যায় কোনও ইংরেজের কোনো বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে না। তবে ইংরেজ গভরমেন্ট লিখিতভাবে ক্ষমা চেয়ে যদি একটা বিজ্ঞাপন দিতে চায় তা চমচমে ছাপানো যেতে পারে।"

পিকলু ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারছে। কিন্তু নির্মম সত্যটুকু হলো, পয়সা ঢেলে সমস্ত পুরনো পাপ এযুগে মুছে ফেলা যায়।

হরিময়বাবু বেশি কথা বলছেন না। কিন্তু অর্থের জন্য কোনো অনর্থের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে তিনি এখনও উৎসাহী নন। মস্ত বিপ্লবী ছিলেন দক্ষিণেশ্বরের গদাধর চট্টোপাধ্যায়। না হলে কেউ বলতে পারেন, টাকা মাটি,

মাটি টাকা? এ-কথার পুরো মানে বুঝতে গেলে স্বয়ং কার্ল মার্কসের মাথা ধরে যাবে। বড়ই গভীর এই রামকৃষ্ণইজম!

হরিময়বাবুর ওপর বিরক্ত হচ্ছে না পিকলু। বরং তিনি যা চাইছেন তারও খোঁজখবর করা যাক। কলকাতা শহরটা তো নিতান্ত ছোট্ট শহর নয়।



মোটর সাইকেলের পিছনে হরিময়বাবুকে পরিবহন করে এরপর যা যা ঘটেছিল তা এইরকম।

অফিসে-অফিসে ঘুরতে ঘুরতে চমচমের রামকৃষ্ণ সংখ্যা স্পনসর করার জন্যে উৎসাহ দেখালো 'ব্রোঞ্জ লেবেল'।

এই লেবেল কথাটা হরিময়বাবুর মাথায় একেবারে ঢোকে না। স্পনশরশিপের প্রস্তাব পেয়ে হরিময়বাবু প্রথমে খুবই খুশি হলেন, ধন্যবাদ জানালেন পিকলুকে। তারপর জি-পি-ও'র সামনে ট্রাফিক সিগন্যালে আটকে যখন তার মুখে শুনলেন 'ব্রোঞ্জ লেবেল' মানে নাম করা কোম্পানির বীয়র, অমনি ভীষণ মুষড়ে পড়লেন।

"ঠাকুর তো কখনও মদ্যপান করতেন না!"

পিকলু এবার অধৈর্য হয়ে বললো, "অনেক মাতালের সঙ্গে তাঁর তো বিশেষ ভাব ছিল — তাঁরা তো ওঁকে দেবজ্ঞানে ভক্তি করতো, দাদু নিজে

বলেছেন।''

''হ্যাঁ, মাতালদেরও তিনি মদ না খেতে বলতেন না। ওঁর শাসনের ধারাটাই ছিল অন্যরকম। কাউকে বলতেন, প্রসাদ করে কারণ সেবন করবে, কাউকে বলতেন মদ গিলবে কিন্তু খবরদার পা যেন না টলে, কাউকে বলতেন মনের মধ্যে কুচিন্তা এলে ভাববে, তোমার সঙ্গে তোমার গর্ভধারিণী জননী রয়েছেন। মাতালদের সুঁড়িখানা দেখে একবার রাস্তার মধ্যেই তাঁর সমাধি হয়েছিল। কিন্তু তা বলে, আমাদের প্রেমের ঠাকুরকে ব্রোঞ্জ লেবেলের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলা যায় কী করে?''

পিকলু বললো, ''কেউ তো বলছে না, মদ খেতেই হবে। ব্রোঞ্জ লেবেল শুধু স্পনসর করছে অর্থ দিয়ে।''

হরিময়বাবু একটু ভাবলেন, তারপর ঠোঁট উল্টে বললেন, ''ভায়া, ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকছে না। মদওয়ালার টাকা নেবো, অথচ মনে মনে চাইবো কেউ যেন মদ না খায়, এটা সরল মানুষ ঠাকুর বোধ হয় পছন্দ করতেন না।''

অগত্যা এবার অ্যাসকো কোম্পানি। ওখানে পিকলুর বন্ধুর বড় জামাইবাবু ভাল পদে আছেন।

জামাইবাবু দু'জনকেই খুব খাতির করলেন, চমচমের প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহও দেখালেন।

হরিময়বাবুও বিপুল উৎসাহিত হলেন, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যি এখনও কলকাতায় 'প্রচণ্ড' পপুলার।

কিন্তু একটু পরেই হোঁচট খেলেন হরিময়বাবু।

অ্যাসকো বলতে যে আমেরিকান স্মোকিং কোম্পানি বোঝায় তা হরিময়বাবু গোড়াতে আন্দাজ করতে পারেননি। এঁদেরই 'হক্কাইডো' সিগারেট এখন ইন্ডিয়ার স্পনসরবাজার গরম করে রেখেছে। গান-বাজনা পুজোআচ্চার পিছনে অলিতে-গলিতে সর্বত্র সারাক্ষণ হক্কাইডো।

একবার চোখ বন্ধ করলেন হরিময়বাবু। স্বামী প্রভানন্দের লেখা শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তঃলীলা দু' খণ্ড তিনি দু'বার পড়েছেন। যে মহাপুরুষ গলায় ক্যানসার নিয়ে ডাক্তার-বৈদ্যদের সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও এতো কষ্ট পেয়ে দেহ রাখলেন তাঁর স্মরণ সংখ্যায় শরীরের পক্ষে বিষময় সিগারেট কোম্পানির ছাপ থাকবে এটা ঠিক নয়।

"ঠাকুর মদ না খেলেও হুঁকোর তামাক তো রেগুলার খেতেন। এখনও তো বেলুড়মঠে তাঁকে নিত্য হুঁকো ভোগ দেওয়া হয় রাত্রের আহারের পর।" মনে করিয়ে দিলো পিকলু। তবু হরিময়বাবু উৎসাহ পাচ্ছেন না।

হতাশ হয়ে পিকলু বললো, "তা হলে তো দা ভিঞ্চি কোম্পানি ছাড়া আর কোনও গতি থাকছে না আমাদের। ওঁরা অবশ্যি খুবই উদারহস্ত। ধর্মকর্মে মতিগতি আছে, ঠাকুরের নাম করে হাজির হলে বর্তমান মালিক বিটলুবাবু কিছুতেই না বলবেন না।"

মোটরবাইক আবার বুলেট গতিতে চৌরঙ্গি থেকে বিবাদি বাগের দিকে ছুটতে যাচ্ছিল, কিন্তু আর এগোবার প্রয়োজন হলো না।

হরিময়বাবু ভেবেছিলেন, দ্যা ভিঞ্চি যখন নিশ্চয় তখন রেনেশাঁসি আর্টের কোনও এক কোম্পানি হবে। কিন্তু যেই শুনলেন, এরা টাকা খাটায়, তিন বছরে সঞ্চয় দ্বিগুণ করার জন্যে গেরস্থরা এদের পিছনে সারাক্ষণ ঘুরে বেড়ায়, অমনি হরিময়বাবু তীব্র আপত্তি জানালেন। "গাড়ি থামাও ভায়া। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের তো টাকাই সহ্য হতো না — কামিনীকাঞ্চনের দাপট কমাবার জন্যেই তো মঠ-মিশনে এতো জপতপ সেবা-সাধনা চলেছে।"

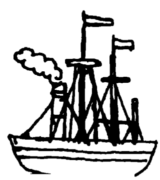
পিকলু একটু নিরুৎসাহ হলেও রাগ করলো না। এখনও হরিময়বাবুর মতন লোক যখন সংসারে রয়েছে তখন থাকুক।

সে হেসে বললো, "মিঠাই বা ডোয়ারিক ছাড়া আর কেউ আপনার চমচমকে স্পনসর করতে সাহস পাবে না। কোনও বড় উকিল বা ডাক্তার যদি নিজের পকেট থেকে এই সংখ্যার জন্যে টাকা দেন তা হলে কেমন

হয়?'

"খুবই ভাল হয়। কিন্তু আমাকে হাওড়ায় একটু চেক করাতে হবে রামকৃষ্ণ-বিশারদ প্রফেসর শঙ্করীপ্রসাদ বসুর কাছ থেকে। কোন বিশেষ কারণে ঠাকুর উকিল-ডাক্তারদের বাড়িতে অন্ন নিতে রাজি হতেন না? আজই আমি হিদারাম হালদার লেন থেকে রিকশ করে কাসুন্দে ওলাবিবিতলা লেনে শঙ্করীপ্রসাদ বসুকে কনসাল্ট করে আসবো। কোনো উকিল নাকি বলেছিল, ঠাকুরের কান মলে দেবো! ভালভাবে খোঁজখবর নিয়ে আটঘাট বেঁধে এগোতে হবে, মিস্টার পিকলু।"

পিকলুকে এবার ছেড়ে দিলেন হরিময়বাবু — সোজা সে ফিরে যাবে জোকায়। অনেকখানি রাস্তা। আর হরিময়বাবু গড়ের মাঠে একটু ক্লিন হাওয়া খেয়ে, রবীন্দ্রসদনের সামনে থেকে ট্রাম কোম্পানির বাস ধরে নদী পেরিয়ে শিবপুর মন্দিরতলায় চলে যাবেন।



বাসের জন্য রবীন্দ্রসদনের সামনে হরিময়বাবু অপেক্ষা করছেন। এমন সময় একটা ইলেকট্রিক-নীল মারুতি এইট হানড্রেড গাড়ি এসে তাঁর সামনে থেমে গেলো।

"আরে হরিময়বাবু না? কংগ্রাচুলেশন! আজ আপনার সম্বন্ধে অফিসে খুব আলোচনা হচ্ছিল। দুজন মহিলা তো আপনার সঙ্গে আমার চেনা আছে

জেনে এক বছর চমচম সাবসক্রিপসনের টাকা পর্যন্ত পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

কথা বলছেন স্বয়ং শৈল ব্যানার্জি, বাংলায় এম এ পাস করেও যিনি একদা শিল্পপতি হওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। থাকেন হাওড়াতেই, নতুন বিদ্যাসাগর ব্রিজের কাছেই। জোর করে তিনি গাড়িতে তুলে নিলেন হরিময়বাবুকে।

ড্রাইভ করতে করতে শৈলবাবু বললেন, "সুইডেন এবং বেলজিয়াম ঘুরে এলাম, ওখানেও গাড়ির সবচেয়ে জনপ্রিয় কালার ইলেকট্রিক-নীল। অথচ এখানে ডিলার আপনাকে সারাক্ষণ রেড মারুতি গছাবার চেষ্টা করবে।"

"আমাকে নয়, বিশ্বস্ত পদযুগল থাকতে আমার গাড়ি কেনার কথাই ওঠে না। আপনাকে অবশ্য গাড়িওয়ালারা জ্বালাবে — ফোর্ড, ডেয়ু, জি এম, ভোলভো, মার্সেডিজ, মারুতি এসটিম কেউ আপনাকে ছাড়তে চাইবে না।"

খুব হাসলেন শৈলবাবু! "ঠাকুরের আশীর্বাদে দু'একটা গাড়ি কেনা তো এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়! কিন্তু হাওড়ার রাস্তার গর্ত! পট-হোল বললে ওইসব গহ্বরের কিছুই বোঝা যায় না। আমার শ্যালিকা সেদিন নিউ আলিপুর থেকে হাওড়ায় আসতে গিয়ে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের গর্তে এমন মোচড় খেয়েছে যে সিরিয়াস স্পন্ডালাইটিস! ভাগ্যে স্বামী হাড়ের ডাক্তার, না হলে বেলভিউতে বেড নিয়ে চিকিৎসা করাতে একখানা মার্সেডিজ কেনার খরচ লেগে যেতো, বেচারার কী অবস্থা হতো বলুন তো! চিকিৎসা করাতে গিয়ে সব রেস্তো চলে যেতো।"

শৈল ব্যানার্জি রসিকতা করলেন, "তাহলে কবে হাওড়া ছাড়ছে চমচম? একটু নামডাক হলে কেউ তো আর হাওড়ায় থাকে না— এই অধম এবং ডাক্তার ভোলানাথ চক্রবর্তী এবং ডাক্তার শীতল ঘোষ ছাড়া।"

"চমচম ওখানেই থেকে যাবে, মিস্টার ব্যানার্জি। চমচমের শিকড় পোঁতা রয়েছে ৪২/৩ হিদারাম হালদার লেনে। যতোদিন বেঁচে আছি ততোদিন ওখানে সান্ধ্যপ্রদীপ জ্বালাবো তুলসীতলায়। বংশগোপাল বিশ্বাস

আমাকে যে অনুরোধ করে গিয়েছেন তার অন্যথা হবে না।”

এবার হরিময়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, “তা আপনি এখনও হাওড়ায় রয়ে গেলেন কেন? আপনার কোম্পানির এতো রফতানি, এতো বিদেশি মুদ্রা উপার্জন!”

“আমাদের স্পোর্টিং ক্লাবের ফাউন্ডার ছিলেন বংশগোপাল বিশ্বাস। নাইনটিন ফর্টি ফাইভে ক্রিকেট টিমে চান্স দেবার সময় প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন, কখনও এই শিবপুর ছেড়ে যাবে না। তখন না বুঝে প্রতিজ্ঞা করেছি, এখন চারা নেই!”

গাড়ি চলেছে। শৈল ব্যানার্জি বললেন, “বাইদি বাই, বিয়াল্লিশের তিন হিদারাম হালদার লেনের খবর কী?”

“আছে। একটা অংশে চমচম রয়েছে। মাঠের অন্য দিকে দাসওয়ানিদের গাড়ি রিপেয়ার গ্যারেজ এবং সেই সঙ্গে এক নাম-না-জানা কালোয়ারের পুরনো লোহালক্কড়ের গোডাউন।”

“মেন বাড়িটা তো ভেঙে পড়ছে মনে হলো! কোনও মেরামতি নেই, হোয়াইট ওয়াশিং নেই।” দুঃখ করলেন শৈল ব্যানার্জি।

“একতলায় আগে বিশ্বাসদের আপিস ছিল, এখন খালি পড়ে থাকে। আর দোতলা চিরকাল বংশগোপালবাবুর বংশধরদের জন্যে বিশেষভাবে সংরক্ষিত। ভিটে বলে কথা!”

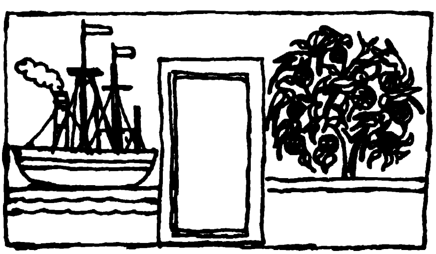
শৈলবাবু বললেন, “ছোটবেলায় ক্রিকেট খেলবার সময় কতবার ও বাড়িতে গিয়েছি। যুদ্ধের আগে থেকে ওঁদের বাড়িতে ‘পাই’ কোম্পানির বিশাল রেডিও ছিল— বংশগোপালবাবু যুদ্ধের সময় লুকিয়ে-লুকিয়ে রেডিওতে সুভাষ বোসের বার্লিন এবং টোকিও স্পিচ শুনতেন। নিজে পুরনো এন আর আই, কবে বার্মায় গিয়েছেন এবং যথাসময়ে ফিরে এসেছেন।”

হরিময়বাবু বললেন, “ওই রেডিও না থাকলে কি আর বংশগোপাল রাত জেগে নিশিযাপন করতে পারতেন? সেই রেডিও, সেই বইপত্তর, সেই চিনেমাটির টি-সেট সব সাজানো রয়েছে। শুধু মানুষটা নেই, ফিফটি ইয়ার্স

কেটে গেলো। আমার দুঃখ, বংশগোপালবাবু, চমচমের প্রথম সংখ্যার ডামি ও পেজ প্রুফ দেখে গেলেন, কিন্তু ছাপানো অবস্থায় প্রথম সংখ্যাটা ওঁর হাতে তুলে দিতে পারলাম না।"

ডামি জিনিসটা কি শৈলবাবু জানতেন না। হরিময়বাবু বুঝিয়ে দিলেন, "একেবারে নকল, অথচ আসল নয়। বংশগোপালবাবুর বংশধর— বড় ছেলে, ছোট ছেলে এবং নাতি যেন একই ছাঁচ থেকে তৈরি— পরের পর ছবিগুলো দেওয়ালে টাঙানো আছে, বোঝা যায় না কোনটা কি। বাই দ্য বাই, বর্তমান বংশধর বংশগোলাপ বিশ্বাস বহুদিন প্রবাসে বসবাস করে হঠাৎ নিজের ডেরায় ফিরে এসেছেন। লোকে বলছে, এর সঙ্গেও কিন্তু বংশগোপালবাবুর মুখের বেজায় মিল।"

"আর হাসাবেন না, হরিময়বাবু।" এই বলে হা-হা করে হাসতে লাগলেন শৈল ব্যানার্জি। বংশগোপাল থেকে বংশগোলাপ, নামগুলো কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং!" অনেক মাথাখাটিয়ে কেউ নামগুলো সাজিয়েছে।"



হাওড়া শিবপুরে এবার সন্ধ্যা নামছে। ছোট ছোট কারখানায় অসংখ্য চিমনি সারাক্ষণ ধোঁয়া ঢেকুর তুলে হিদারাম হালদার লেনের এই অঞ্চলে নির্ধারিত সময়ের আধঘণ্টা আগেই অন্ধকারকে ডেকে আনে।

পরিবেশ দূষণের দুশ্চিন্তায় ভবনাথ সেন একবার হরিময়বাবুকে

জিজ্ঞেস করেছিলেন, "প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ভারতবর্ষের গৃহবধূরা কতগুলো চুল্লি জ্বালায় বলো তো?"

টাকে হাত বুলিয়েছিলেন হরিময়বাবু, পরিসংখ্যাটা তাঁর মোটেই আয়ত্তে আসে না।

ভবনাথবাবু নিজেই উত্তর দিয়েছিলেন, "পিকলুর খবর অনুযায়ী নব্বুই কোটি ভারতবাসীর আঠারো কোটি ঘরসংসার। সব সংসারেই সাঁঝের চুল্লি জ্বলছে। শুতে যাবার আগে চারখানা চাপাটি তো সবাই খেতে চাইবেই। স্বাধীনতার যতো ব্যর্থতাই থাক, নব্বুই কোটি লোকের কারও অভুক্ত হয়ে মরার কারণ ঘটেনি। এইখানেই সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে বড় পরাজয় ঘটেছে। পরাধীন ভারতে কত মানুষ যে দুর্ভিক্ষের বলি হয়েছে তার হিসেব নেই। তবে এখনও দারিদ্র্য আছে, অনিশ্চয়তা আছে, অপুষ্টি আছে—এগুলোও ছোট পয়েন্ট নয়।"

"অর্থাৎ পিকলু বলতে চাইছে, প্রত্যেক রাতে নব্বুই কোটি লোক খেতে বসছে, তবে যতটা প্রয়োজন ততটা খাবার সবার জুটছে না।"

"ইকজফার অমর্ত্য সেনকে জিজ্ঞেস করো— তিনি বলেছেন, রিমার্কেবল কৃতিত্ব ভারতীয় গণতন্ত্রের। পরাধীনতার যুগে ইংরেজরা এর এক-তৃতীয়াংশ মানুষকে খাওয়াতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। প্রতি বছর লাখ লাখ লোককে দুর্ভিক্ষের বলি করে শ্মশানে এবং গোরস্থানে পাঠিয়েছে সায়েবরা। এই যে এম্পায়ার ভেঙে পড়লো, তার একটা অদৃশ্য কারণ পৃথিবীর শক্তিধর দেশগুলো বুঝে গেলো, সাম্রাজ্যের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে অনশনে মৃত্যু রোধ করা কোনওক্রমেই সম্ভব নয়।"

হরিময়বাবুর চোখ শিবপুরের কারখানার ধোঁয়ায় জ্বালা করছে। এই সময়ে তিনি একটু ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দেন চোখে। চোখে ভাল করে জল ছিটিয়ে কালো ফ্রেমের চশমাটা কাপড়ের খুঁটে মুছতে মুছতে হরিময়বাবু ভাবলেন, কবে হাওড়ায় সব সংসারে গ্যাস আসবে? কিংবা সৌরচুল্লি বসবে। তখন হাওড়ার আকাশ আবার নীল আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। যে-আকাশ একসময় রাতজাগা গভীর রাতে বংশগোপাল বিশ্বাসের

হিদারাম হালদার লেনের বাড়ির দোতলায় বসে তিনি প্রাণভরে দেখতেন।

চমচমের হাওড়া হেড অফিসের কাজের লোকটির নাম বিজয়। একেও হরিময়বাবু সম্মান দিয়ে কার্যনির্বাহী সাব-এডিটর হিসেবে চমচমের প্রথম পাতায় নিয়মিত পরিচিত করে চলেছেন। অফিসে ফিরে এসে বিজয়কে দেখতে পাচ্ছেন না হরিময়বাবু।

এই ব্যাপারে পিকলু একবার কৌতূহল প্রকাশ করেছিল। ওর দাদু নাকি বলেছেন, "যত সব হরিময়ের পাগলামো!"

কিন্তু হরিময় অন্য মত পোষণ করেন। তিনি বললেন, "শুধু মাইনে দিলেই আজকাল চলে না মিস্টার পিকলু। মানুষকে যত সম্মান দেওয়া যায় ততো কাজ বেশি পাওয়া যায়। কলকাতা কার্যালয়ের গুণধর কেমন রান্না ও সম্পাদনা দুই সামলাচ্ছে। তেমন হাওড়া শিবপুরে বিজয়ও চমচম সম্পাদকের ক্ষুধানিবৃত্তি ছাড়াও সারাক্ষণ মুদ্রণ ও সম্পাদনা নানাভাবে সাহায্য করে যাচ্ছে।"

এই মুহূর্তে বিজয়ের পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। নিশ্চয় কথাসাহিত্যিক চিরন্তন চ্যাটার্জির বাড়িতে সে আটকে পড়েছে। ঔপন্যাসিক চিরন্তনবাবুর ধারণা তিনি বিমল মিত্তিরের দরের লেখক, তাই নিজের গুরুত্ব প্রকাশের অন্য পথ না পয়ে, ধারাবাহিক উপন্যাসের কিস্তি লাস্ট মোমেন্টে সরবরাহ করেন, যেমন খেয়ালী ও অভিমানী বিমলবাবু শেষজীবনে কখনও কখনও করতেন।

চমচম অফিস থেকে বেরিয়ে শ্রীমান বিজয় হাজির হবে চিরন্তন চ্যাটার্জির বেহালার বাড়িতে। বিজয় উপস্থিত হয়েছে দেখলে তাকে ঘরের বাইরে বসিয়ে রেখে কিস্তি লিখতে শুরু করবেন চিরন্তন চ্যাটার্জি এবং শেষ পাতার শেষ লাইনে একটা মারাত্মক মোচড় দিয়ে তলায় ক্রমশ লিখে পাণ্ডুলিপির কতকগুলি শ্লিপ তুলে দেবেন বিজয়ের হাতে।

চিরন্তন বলবেন, "খবরদার জিজ্ঞেস করবে না, এর পরে নায়ক অনন্ত মল্লিকের নাইজিরিয়ার অরণ্যে কী অবস্থা হবে!"

এই অবস্থায় বিজয়ের কাঁচুমাচু মুখ দেখে দয়াপরবশ হয়ে চিরন্তন

বলবেন, "তোমাদের মতন পাঠকের দুশ্চিন্তা আমি বুঝি। লিখতে-লিখতে আমার হঠাৎ কিছু হয়ে গেলে চমচমের পাঠকদের কী অবস্থা হবে? অসমাপ্ত উপন্যাসে আধ-কপালে হলে ভীষণ মাথা ধরে, মানুষ ভীষণ কষ্ট পায়, একথা ডাক্তার বিধান রায় পর্যন্ত স্বীকার করতেন।"

এরপর চিরন্তন নিশ্চয় বলবেন, "প্রুফ রিডার রাধারমণবাবুকে অবশ্যই একবার ফোন করতে বোলো, ওঁকে আমি ভীষণ বিশ্বাস করি। ভাবছি রাধারমণবাবুকে আমি উপন্যাসের পরিণতিটা চুপিচুপি জানিয়ে রাখবো। শরীরের যা অবস্থা! তবে আমার অঘটন কিছু ঘটলে, তোমাদের বিভূতি রায়কে দিয়ে আমার অসমাপ্ত উপন্যাস অবশ্যই সমাপ্ত করাবে না। ওই লোকটা প্লটের অ-আ-ক-খ বোঝে না, একেবারে গপ্পোকানা!"

চিরন্তনবাবুর মুখে বিজয় এই ধরনের গল্প শুনে খুবই আনন্দ পায়। হরিময় ভাবেন, হয়তো আজ চিরন্তনবাবু স্লিপ দিতে দেরি করছেন। বিজয়ের জন্যে আর অপেক্ষা করা ঠিক নয়।

স্নানঘরে ঢুকে হাত-পা ধুয়ে গায়ে একটা নামাবলী জড়িয়ে খালি পায়ে বাড়ির উঠোনের দিকে এগোলেন হরিময়বাবু। এই নামাবলীটি ঐতিহাসিক--- লাল অক্ষরে সারা গায়ে লেখা-- হরে রাম হরে রাম হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। পুরনো চাদর, লেখাগুলো বেশ অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে-- প্রুফ রিডার রাধারমণ একটু কংগ্রেসী ভাবাপন্ন, বামফ্রন্টকে দেখতে পারেন না। তিনি সখেদে বলেন, নামাবলীতে লেখা : হবে বাম, হবে বাম, হবে কষ্ট, হবে কষ্ট। বিজয়ের মধ্যে কিন্তু বামভাব প্রবল, সে এসব মন্তব্য একেবারেই পছন্দ করে না।

খালি পায়ে, শ্রীঅঙ্গে নামাবলী জড়িয়ে হরিময়বাবু বাড়ির প্রাঙ্গণে তুলসী মঞ্চের কাছে হাজির হলেন।

সন্ধ্যাকালের এই নিত্যকর্মটি বহু বছর আগে বংশগোপাল বিশ্বাস মশায় নিজের হাতে করে আনন্দ পেতেন। বংশগোপাল ধীরে ধীরে পরমযত্নে পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাতেন। তারপর প্রদীপগুলি সাজিয়ে দিতেন শ্বেতপাথরে বাঁধানো পবিত্র তুলসী মঞ্চে।

তুলসী সম্বন্ধে কত কথাই জানতেন বংশগোপালবাবু। বলতেন, "এমন মহাশক্তিধর গাছ ঈশ্বর আর দুটি সৃষ্টি করেননি। সাধে কি আর ভারতবর্ষের মানুষ আড়াই হাজার বছর ধরে এই তুলসীকে তোয়াজ করে আসছে। এই তুলসীতলায় যে পরিবার নিয়মিত আলো দেয় তার অমঙ্গল করার সাধ্য কারও নেই। স্বয়ং যমও তাকে সমীহ্ করেন।"

"আপনি তো সায়ান্স লাইনে কাজ করেছেন, দীর্ঘদিন প্রবাসে থেকেছেন, আপনি এসবে বিশ্বাস করেন?" হরিময়বাবু সেই সময় জিজ্ঞেস করেছেন বংশগোপাল বিশ্বাসকে।

"সায়ান্সের সঙ্গে, ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সঙ্গে তো ঈশ্বরের কোনও সংঘাত নেই, হরিময়। বিশ্বস্রষ্টা না থাকলে সায়ান্স কোথায় রাজত্ব করতো?" উত্তর দিয়েছেন বংশগোপাল।

তরুণ হরিময়বাবু তখনও অতশত বুঝতেন না। বংশগোপাল নিজের মনে বলতেন, "রামকৃষ্ণ মিশনের হরিপ্রসন্ন বলে একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন-- ইউ পি-তে বড় সরকারী কাজ করতেন। সন্ন্যাসী হয়েও তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং ছাড়েননি, ইঞ্জিনিয়ারিংও তাঁকে ছাড়েনি। সন্ন্যাসী হয়ে নাম নিয়েছিলেন বিজ্ঞানানন্দ।"

হরিময়বাবু পরে একবার এই গল্প ভবনাথ সেনের কাছে করেছিলেন। ভবনাথ বললেন, "মস্ত সাধু এই বিজ্ঞানানন্দ-- বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মন্দির তো ইনিই তৈরি করেছিলেন। পরে মঠ-মিশনের অধ্যক্ষ পর্যন্ত হয়েছিলেন, ওখানে যাঁকে বলা হয় কি না প্রেসিডেন্ট মহারাজ।"

দশ মিনিট ধরে প্রাণভরে হরিময়বাবু তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যা প্রদীপ নিবেদন করলেন। দীর্ঘদিনের প্রথা এবং বংশগোপালের অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী সাঁঝের প্রদীপ জ্বালার পরে হরিময়বাবু তুলসী মঞ্চে কয়েকখানা বাতাসা ছড়ালেন। ভোগ, প্রসাদ, হরির লুট-- এইসব বিতরিত হয় বলেই তো ছেলেরা এখনও দেবদ্বিজে কিছুটা আগ্রহ রেখেছে। দেবতা তো কিছু নিয়ে নেন না। সুতরাং তাঁকে নিবেদন করতে আপত্তি কোথায়? নিবেদন করলেই প্রসাদটা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

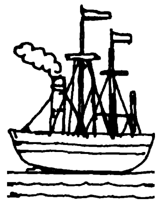
পিকলুর কথাও মনে পড়ছে। আজই সে জিজ্ঞেস করেছে, "কোথায় যেন কী একটা রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। বংশগোপাল কোন খেয়ালে আপনার এবং চমচমের ওপর এই তুলসীমঞ্চের দায়িত্ব দিয়ে গেলেন? এতে কার কী মঙ্গল হবে।"

হরিময়বাবু বলেছেন, "অতশত বুঝিনি ভাই। নতুন কাগজ করার নেশায় তখন বুঁদ হয়ে আছি। লোকমুখে শুনেছি রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী সবাই কাগজের সম্পাদনা করেছেন, ও লাইনে আমাকেও ঢুকতে হবে।"

পিকলু তখন মিটমিট করে হাসছিল। তাই দেখে হরিমায়বাবু বলেছেন, "মিস্টার পিকলু, চমচমকে কেন্দ্র করে তখন যা ঘটছে তা অবিশ্বাস্য। আমরা প্রায় বিনা পয়সায় অনন্তকাল থাকবার সুযোগ পাচ্ছি। তার পরিবর্তে যদি একটু সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাবার হাঙ্গামা নিতে হয় তো হবে।"

পিকলুর ধারণা, বংশগোপালবাবুর মাথায় হয় ছিট ছিল, না হয় বংশধরদের সম্বন্ধে কোনও অভিমান ছিল। অথবা বড় ধরনের কোনো গোলমালে তিনি জড়িয়ে পড়ছিলেন যার বিবরণ আমরা এখনও জানি না।

এইসব চিন্তা এতোবছর পরে মাথায় এনে লাভ নেই। এবার প্রদীপ জ্বালাতে জ্বালাতেই হরিময়বাবু দেখলেন, দোতলায় এক আধপাকা দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক বংশগোপালবাবুর ঘর থেকে তুলসীমঞ্চের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছেন।



সন্ধ্যা হওয়ার একটু পরেই শ্রীমান বিজয় একটা চিরকুট নিয়ে এলো। ওপরের ভদ্রলোক হরিময়বাবুর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাইছেন। হরিময় অবশ্যই কথা বলবেন। বাড়ির মালিক বলে কথা!

খবর পেয়ে ভদ্রলোক নিজেই নীচে নেমে এলেন। একটু ভারী শরীর, কিন্তু বাঙালির তুলনায় দীর্ঘ দেহ। ভদ্রলোকের মুখটা বেশ লম্বাটে— দেখলেই বোঝা যায় বংশগোপালবাবুর বংশধর। কিন্তু শরীরের সাদৃশ্যটা প্রায়ই প্রকৃতির খেলায় কখন যে কার সঙ্গে কাকে মিলিয়ে দেয় তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। কখনও বংশধরের মুখের আদলটা পৈতৃক পথ ছেড়ে মায়ের পথ অনুসরণ করে। বাবার মতো দেখতে এমন অনেক ছেলেকে হরিময়বাবু জানেন। আবার কেউ কেউ মায়ের মতন দেখতে হয়- - মাতৃমুখী পুত্ররা সাধারণত খুব সুখী হয়, সফল হয়। যেমন ভবনাথ সেন, যেমন হরিময়বাবু নিজে। স্বদেশী বিপ্লব আন্দোলনে জড়িয়ে পড়বার পরে প্রাণটা যে আদৌ টিকে থাকবে এবং এমন নির্ঝঞ্ঝাট বাকি জীবন কাটবে তা ভাবতেও পারেননি হরিময়বাবু।

চমচমের অফিস ঘরে বসে ভদ্রলোকের পায়ের চটির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন হরিময়। এঁর নামটি একটু অদ্ভুত — বংশগোলাপ বিশ্বাস। হঠাৎ শুনলে বংশগোপালবাবুর সঙ্গে নামটা গোলমাল হয়ে যায়। কিন্তু বংশগত নাম, ইচ্ছে করলেই এই বয়সে তা পাল্টানো যায় না।

"আসুন, আসুন। পাঁচদিন হলো হাওড়ায় পদধূলি দিয়েছেন অথচ এখনও দেখা হয়নি," ভাবতে খুব লজ্জা পাচ্ছেন হরিময়বাবু।

বংশগোলাপবাবুর হাতে হরির লুটের দু'খানা বাতাসা ধরিয়ে দিলেন হরিময়বাবু। আগন্তুক ভদ্রলোক বাতাসা মাথায় ঠেকালেন, কিন্তু খেলেন না।

"ব্লাডসুগারটা ইদানিং একটু গণ্ডগোল করছে" সরলভাবে জানালেন বংশগোলাপ।

হরিময়বাবর মনে পড়লো, বংশগোপালবাবুরও শেষ জীবনে ডায়াবিটিস হয়েছিল। ডায়াবিটিসের দোষ কি। সারাক্ষণ বারান্দায় বসে বসে ভদ্রলোক একমনে কী ভাবতেন। যারা খুব বেশি ভাবে, ডায়াবিটিস তাদের খুব বেশি পছন্দ করে। ভাবনাটা যদি দুর্ভাবনা হয় তাহলে তো কথাই নেই!

হরিময়বাবু এবার চায়ের অর্ডার দিলেন। বিনা চিনি, কিন্তু নতুন আশ্চর্য বটিকা 'ইকোয়াল', যা তাঁর ভাইপো কিছুটা সঙ্গে করে এনেছিল মার্কিনমুলুক থেকে।

"আপনারও কি রক্তে চিনি? ইন্ডিয়ায় বাঙালিদের মধ্যে হায়েস্ট নাম্বার ডায়াবিটিক, সব চেয়ে কম পাঞ্জাবিদের," বললেন বংশগোলাপ। বারাণসীতে খবরটা তিনি শুনেছেন।

"না মশাই। সায়েবমেমরা রক্তে চিনি না থাকলেও আজকাল চিনি খাবে না-- স্রেফ শরীরে একটু স্নেহ জমবে বলে। ব্যক্তিগত ওয়েইং মেশিনের দিকে নজর রাখতে গিয়ে গোটা পৃথিবীর ভোজনসুখ নষ্ট হয়ে গেলো। ভাবা যায় না! টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির এইটাই সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি! প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও বৈরাগ্যের সাধনা এবং ত্যাগের হাতছানি।

জোরে হাসলেন বংশগোলাপ বিশ্বাস। "আমি অনেকবছর হাওড়া ছাড়া, এবার সব খবর নেবো আপনার কাছ থেকে। তা আপনাকে আজ তুলসীতলায় দেখলাম-- এটা কেন?"

হা ঈশ্বর! আপনি নিজেই জানেন না, কার দায়িত্ব কে পালন করছে? আপনার পিতৃপুরুষের নির্দেশে। শুধু নির্দেশ নয়, লিখিত নির্দেশ!"

বংশগোপালবাবুর লিখিত নির্দেশে_এইটাই প্রধান শর্ত ছিল চমচমের পরিচালকদের ওপর। হয় আমি, না হয় আমার সহকারী সম্পাদক বিজয় ভক্তিভরে রোজ এই কাজটা করি-- তুলসী মঞ্চে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালানো।"

"আপনি এসব ওং ভোং-এ বিশ্বাস করেন?" জিজ্ঞেস করলেন বংশগোলাপ বিশ্বাস।

"দেখুন, আমার বিশ্বাসটা বড় কথা নয়-- এটা একটা শর্ত, আমি কেবল পালন করছি, চমচম পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে।"

বংশগোলাপবাবু সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন, "এই দায়িত্বটা নিজের বংশধরদের দিলেন না কেন বংশগোপাল?"

প্রথমে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন হরিময়বাবু। তারপর উত্তর দিলেন, "অত চিন্তা করবেন না, মিস্টার বিশ্বাস। হয়তো বংশগোপালবাবু আশঙ্কা করেছিলেন, হাতের গোড়ায় বিশ্বাস বংশের কে কখন এখানে থাকবেন তার ঠিক নেই। অথচ এই তুলসীমঞ্চ সম্পর্কে ভীষণ দুর্বলতা ছিল তাঁর। তাই তাঁর প্রতিষ্ঠিত চমচম পত্রিকার ওপর বাড়তি দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কোথাও তো প্রদীপ দেওয়ার সম্বন্ধে তেমন বিধিনিষেধ নেই। এখন থেকে নিন না দায়িত্বটা আপনারা। আপনাদের পূর্বপুরুষদের দায়িত্ব আপনারা পালন করবেন, এর থেকে ভাল কী হতে পারে? চমচমের দিক থেকে কোনও আপত্তি হবে না।"

বংশগোলাপ বিশ্বাস কিন্তু এখনই কোনও দৈনন্দিন হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়তে চান না। সেই শিশুবয়সে বাংলা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, প্রায় সমস্ত জীবন প্রবাসে কাটিয়ে সবে হাওড়ার ৪২/৩ হিদারাম হালদার লেনে ফিরেছেন। এখানকার সমস্ত ব্যাপারটা তিনি বুঝে নিতে চান আগে।

আজ যে হরিময়বাবুর সঙ্গে দেখা করবার বিশেষ আগ্রহ বংশগোলাপের তার কারণ ইংরেজি কাগজে হরিময়বাবু এবং চমচম সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর প্রবন্ধ।

বংশগোলাপ বললেন, 'লেখাতে বংশগোপাল বিশ্বাস সম্বন্ধেও অনেক নতুন খবর পেলাম, মিস্টার চৌধুরী। খুবই ইন্টারেস্টিং লোক ছিলেন আমার পূর্বপুরুষ।''

''ইন্টারেস্টিং বলে ইন্টারেস্টিং! বংশগোপালবাবু গভীর রাত্রে কয়েক ঘণ্টা একেবারে ঘুমোতে পারতেন না। সেই সময় আমার সঙ্গে যে কত কথা হতো! নিয়মিত নোট করা থাকলে একখানা ভাল বই হয়ে যেতো। লেখার নামটা পর্যন্ত ঠিক করে ফেলেছিলাম-- 'মাঝ রাতে মশগুল'। কিন্তু অতীতের সব কথা ঠিকমতন স্মরণ করতে পারি না। তাই বই লেখা হলো না। আসলে সে সময় নিজের কাঁচাঘুম ভাঙিয়ে গল্প করা তো!''

বংশগোলাপবাবুর সঙ্গে কথা বলে খুব আনন্দ পাচ্ছেন হরিময়বাবু। ''ওয়েলকাম টু হাওড়া অ্যান্ড টু হিদারাম হালদার লেন। আপনি তো মশাই পৈতৃক ভিটেতে বসবাসই করলেন না, সেই কবে চলে গিয়েছিলেন শৈশবকালে দাদুর কোলে চড়ে। আমার এখনও মনে আছে। তারপর মশাই আপনি তো ছাপমারা প্রবাসী বাঙালি হয়ে এতোদিনে ব্যাক টু বেঙ্গল!''

দাদুর কথা উঠতেই বংশগোলাপবাবু আবার চক্ষু বিস্তার করলেন। ''প্রপিতামহ বংশগোপাল বিশ্বাসের কথা আমার এক ফোঁটা মনে নেই, কিন্তু দাদু বংশবিনয়বাবু তো ছিলেন আমার বাবার মতন। বেনারসে নিজের হাতে তিনি আমাকে মানুষ করেছেন।''

হরিময়বাবু বললেন, ''মশাই, আপনার বিষয় সম্পত্তি, ঘরসংসার, আপনি এবার ঠিক করে বুঝেসুঝে নিন, আমি তো বংশগোপালবাবুর মৃতুকালীন নির্দেশ অনুযায়ী রামচন্দ্রের খড়ম পাহারা দিয়ে বসে আছি।''

''আপনার দাদুর পিতৃদেব বংশগোপাল বাবুর বেশ কয়েকটা ছবি আমার কাছে আছে, একখানা ছোট্ট অয়েল পেন্টিং তো অফিস ঘরেই ঝুলছে, কিন্তু কখনও চমচমে ছাপা যায়নি।''

''রঙিন ছবি ছাপতে অনেক খরচ বুঝি?'' বংশগোলাপ জানতে চাইলেন। তিনি ভাবছেন খরচের কথা ভেবেই বংশগোপালের রঙিন ছবি চমচমে ছাপা হয়নি।

"হরিময়বাবু সন্দেহের অবসান ঘটালেন। ওঁর ছবির ছাপানোর খরচ নিয়ে মাথা ঘামানোর কথাই উঠে না বংশগোলাপবাবু। কিন্তু আপনার দাদুর বাবার লিখিত নির্দেশ, আমাকে সবসময় আড়ালে রাখবে, আমাকে নিয়ে কখনও হইচই করবে না। নিজের তীব্র বাসনার জন্য অনেক শিক্ষা পেয়েছি জীবন থেকে -- অথচ সেসব ভুল ইচ্ছে থাকলেও সংশোধনের উপর নেই।"

বংশগোলাপবাবু জানালেন, "আমার দাদুর বাবা যে বেজায় খেয়ালি এবং কিছুটা রহস্যময় লোক ছিলেন তার কিছু নমুনা আমার শোনা আছে। এক সময় সুবিধেমতো আপনাকে সব বলা যাবে। ছোটবেলায় বেনারসে পড়াশোনা করে আমার বাংলাটা একটু দুর্বল হয়ে গিয়েছে, থিংকিংটা এবং উচ্চারণটা একটু হিন্দি-হিন্দি হয়ে গিয়েছে। আমার দুর্ভাগ্য, চমচমটাও নিয়মিত পড়া হয়নি, যদিও আপনি এতো বছর ধরে নিয়মিত সৌজন্য সংখ্যা পাঠিয়ে গিয়েছেন আমার দাদুর কাছে।"

হরিময়বাবু জানালেন, "দেখুন, আমি নেমকহারামি করতে পারি না। আপনাদের সম্পত্তিতে বসবাস করে আপনাদের পূর্বপুরুষ প্রতিষ্ঠিত কাগজ সম্পাদনা করি। আপনাদের কাগজ না পাঠিয়ে উপায় আছে?" হরিময়বাবু আরও বললেন, "বংশবিনয়বাবু দেহরক্ষা করা পর্যন্ত প্রতিটি কপি আন্ডার সার্টিফিকেট অফ পোস্টিং পাঠিয়েছি। তারপর আপনাকে গোটা চারেক চিঠি দিয়েছি, নতুন নাম জানাবার জন্যে, কোনও রিপ্লাই আসেনি। তখন লেট বংশবিনয় বিশ্বাস বলেও কাগজ পাঠিয়েছি। শেষে বই ফেরত এলো, অ্যাড্রেসি লেফট বলে। আমিও ছাড়বার পাত্র নই-- লেফট যখন তখন অবশ্যই লোকটা অন্য ঠিকানায় চলে গিয়েছেন, কিন্তু বংশের কেউ তো আছে। অর্বশেষে আপনার সঙ্গে পোস্টাল যোগাযোগ স্থাপিত হলো, তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আপনি লিখলেন, আমার পরিবারের কেউ বাংলাচর্চা করে না, সুতরাং কাগজ পাঠাবার কষ্ট নেবেন না।"

হরিময়বাবু প্রথমে আন্দাজ করেছিলেন, প্রবাসে কর্মজীবনের পালা শেষ

করে, পরিণত বয়সে বংশগোলাপবাবু পৈতৃক ভিটেতে ফিরে এসেছেন।

কিন্তু বংশগোলাপবাবু নিজেই বললেন, "আরও কয়েক বছর চাকরির মেয়াদ ছিল, ইচ্ছে করলে কর্মজীবন চালাতে পারতাম, কিন্তু হঠাৎ ভি আর এস নিয়ে নিলাম।"

"ভি আর এস ব্যাপারটা কী জানেন তো?" জিজ্ঞেস করলেন বংশগোলাপ।

"অবশ্যই জানি। আমাদের হাওড়াকে তো মশাই ভি আর এস নগর বলতে পারেন। এখানে বড় বড় কোম্পানির অবস্থা যত খারাপ হচ্ছে, কোম্পানির পার্সোনেল ম্যানেজাররা তত মানুষকে ভি আর এস নিতে বাধ্য করছে। এই শহরের লোক জানে, ছাঁটায়ের শোভন সংস্করণ হলো ভি আর এস।"

বংশগোলাপ বললেন, "ওখানে কিন্তু তা নয়। স্বেচ্ছায় যদি চাকরি ছেড়ে চলে যাও তা হলে অনেক বাড়তি সুবিধে দেবে। অনেকে এক কোম্পানি থেকে ভি আর এস নিয়ে আরেক জায়গায় চাকরিতে ঢুকছেন, যদিও আমি ওসব হাঙ্গামায় যাইনি। আমার দাদু বংশবিনয়বাবু, জীবনের শেষপ্রান্তে প্রায়ই তাঁর পিতৃদেব বংশগোপালকে স্মরণ করতেন, তাঁর নানা কথা আমাদের শোনাতেন। বংশবিনয়বাবু বলতেন, মরবার আগেও বাবা চিঠি লিখে গিয়েছেন, অবশ্যই আমার প্রতিটি নির্দেশ সারা জীবন মেনে চলবে। জেনে রেখো আমার নির্দেশ বিনা প্রশ্নে অনুসরণ করলে, তোমাদের হাতে এতো অর্থ আসবে যে তোমরা নিজেরাই বিশ্বাস করতে পারবে না।"

এবার হা-হা করে হাসতে লাগলেন বংশগোলাপবাবু। "ভি আর এস নেওয়া মাত্রই আমার বয়সটা যেন কুড়ি বছর বেড়ে গেলো, হরিময়বাবু। আর সবচেয়ে যা মজার, এখন প্রায়ই দাদুর কথা বসে বসে ভাবি। ভারি পিতৃভক্ত মানুষ ছিলেন বংশবিনয় বিশ্বাস। ওঁর স্থির বিশ্বাস ছিল যে হিদারাম হালদার লেনের বিশ্বাসরা একদিন সত্যিই বংশগোপালের আশীর্বাদে বিশাল ধনী হয়ে উঠবে।"

বংশগোলাপ মজা করে দাদুকে জিজ্ঞেস করতেন, "কোন সময়ে

ভাগ্যলক্ষ্মীর দরজা খুলবে দাদু?"

বংশবিনয় বেঁচে ছিলেন ১৯১০ সাল পর্যন্ত। তিনি একটু ভেবে বলতেন, "ঠিক সময়টা জানি না। মনে হয়, আরও কিছুদিন পরে। আমার বাবা বংশগোপাল বিশ্বাসের হাবভাব চালচলন একটু রহস্যময় ছিল। কোনো কিছুই খোলাখুলি বলতেন না। মাঝে মাঝে লিখিত নির্দেশ পাঠাতেন — কখনও সেই সব নির্দেশের ওপরে একটা সংখ্যা লেখা থাকতো। যেন কত লিখিত নির্দেশ তিনি দিয়েছেন তার একটা হিসেব রয়েছে। কিন্তু মৃত্যুশয্যায় একবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'বিনয়, নাইনটিন নাইনটিসেভেন আর কত বছর পরে?' আমি ঠিক উত্তর দিতে পারলাম না। তখন আমার মাথার ঠিক নেই। আমি তখন নিজের দুঃখে পাগল হয়ে উঠছি। বাবা মৃত্যুশয্যায় এই খবর পেয়ে দু'দিনের জন্যে বেনারস থেকে হাওড়ায় হিদারাম হালদার লেনে তাঁকে দেখতে এসেছি কোনোরকমে।"

এতোদিন পরে হরিময়বাবু বিশ্বাসবংশের পুরনো কথাগুলো মন দিয়ে শুনলেন। স্বাধীনতার সামান্য ক'বছর আগে থেকেই এই বিশ্বাস পরিবারের সুখদুঃখের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে রয়েছেন। এই পরিবারে অবশ্যই অনেক কিছু ঘটে থাকতে পারে যা তাঁর জানা নেই।

বিশ্বাসবংশের প্রতিনিধি হিসেবে বংশগোলাপবাবুকে এই বাড়িতে ফিরে পেয়ে হরিময়বাবু খুব খুশি হয়েছেন।

"এতোদিনে এই ৪২/৩ হিদারাম হালদার লেনে যেন প্রাণ ফিরে এলো, বংশগোলাপবাবু। এমন সুন্দর বাড়ি, অথচ মূল বাড়ির একতলা-দোতলায় কেউ থাকেনা এটা ভাল কথা নয়। নীচে আপনাদের আদি আপিসঘর বহুদিন খালি পড়ে রয়েছে। খোলা জমির এক দিকে পুরনো গাড়ি সারাবার ওপেন গ্যারেজ — বুড়ো বুড়ো গাড়ি গোঁত খেয়ে যেন হাসপাতালের জেনারেল ওয়ার্ডে শুয়ে আছে। ওদিকে পুরনো লোহার স্ক্র্যাপ ইয়ার্ডে সারাক্ষণ যে কী হয় বোঝা যায় না। লরি থেকে মাল নামছে, আবার লরিতে কিংবা ঠেলাগাড়িতে মাল উঠছে। নামাওঠা চলেছে তো চলেছেই।

মাঝ রাতেও এর বিরাম নেই।"

বংশগোলাপবাবু বললেন, "ভাড়াটেরা আছে বলে এই শিবপুরের সম্পত্তি আমাকে ঘরের পয়সা দিয়ে পুষতে হয়নি। এতোগুলো বছর তো শান্তিতে কেটে গিয়েছে।"

হরিময়বাবু বললেন, "বাড়ির ট্যাক্সোটা চমচমও কিছুটা দিচ্ছে। যদি আপনি বলেন, আরও কিছু বাড়ানো যায়। বংশগোপালবাবু অবশ্য লিখিত নির্দেশ দিয়েছেন মোট পাঁচ সিকে দেবার।"

বংশগোলাপবাবু হাঁ হাঁ করে উঠলেন। 'ইচ্ছে থাকলেও নেবার উপায় নেই। আদি কর্তা বংশগোপাল দাদুকেও লিখিত নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন বংশধরদের চমচম পত্রিকার কাছ থেকে কোনো ভাবেই মাসিক পাঁচসিকের বেশি নেওয়া চলবে না।"

হরিময়বাবু বললেন, "বংশগোপালবাবু যখন সস্নেহে ভাড়ার পরিমাণ সম্পর্কে এই সব নির্দেশ দিয়েছিলেন তখন চমচম বয়সে শিশু— এতো বছর পরে তার তো নাবালক থেকে যাওয়ার কথা নয়। আপনি ভাড়া বাড়ান, চমচম অবশ্যই তা মান্য করবে।"

কিন্তু হরিময়বাবু লক্ষ্য করলেন, পিতৃপুরুষের নির্দেশ অমান্য করার সাহস বা ইচ্ছা কোনওটাই নেই বংশগোলাপবাবুর।

"এতে মশায় বংশের অমঙ্গল হতে পারে।" তিনি সোজাসুজি জানালেন হরিময়বাবুকে। "বংশের অমঙ্গলের কথা উঠলে আদি পুরুষ বংশগোপালও শিউরে উঠতেন। আমারও মশাই, এইসব আশঙ্কা পুরোপুরি যায়নি, এসব ব্যাপার আমি কোনো ঝুঁকি নিতে রাজি নই।"

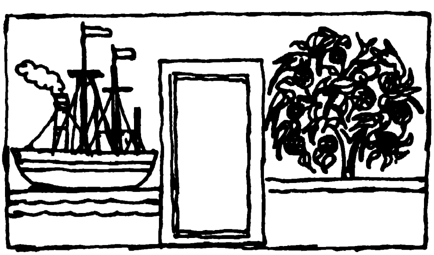
"আপনি না মশাই বি এসসি এবং বি কম পর পর পড়ছিলেন বেনারসে?"

"তাতে কী এসে যায়, মশাই? এই বিশ্বাস বংশের দুঃখের একটা মস্ত ইতিহাস আছে। দুঃখের কারণটা আমার দাদু বংশবিনয় খুঁজে বার করবার অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি। ভাবছি আরও খোঁজখবর নেবার জন্যে আমি নিজেই এবার আমি উঠেপড়ে লাগবো যখন

হাওড়ায় হাজির হয়েছি। হাতে তেমন কাজও নেই।"

আর কথাবার্তা নয় আজ। কাজের লোক বিজয় প্রধান কার্যালয়ে ফিরলো বেশ দেরি করে।

যা আশঙ্কা করেছেন হরিময় তাই। লেখক চিরন্তন চ্যাটার্জি ধারাবাহিকের কিস্তি তৈরি করতে বেজায় সময় নিয়েছেন। অথচ বেশি তাগাদা দেওয়ার উপায়ও নেই। অভিমানী লেখক তখনই বলে বসবেন, "এ সংখ্যায় তা হলে লেখা বন্ধ থাক। সম্পাদকীয় পাতায় বক্স করে দশ পয়েন্ট বোল্ড টাইপে ছাপিয়ে দেবেন, চিরন্তন চট্টোপাধ্যায় অসুস্থ। তাই অনিবার্য কারণে এ সংখ্যায় ধারাবাহিক ছাপা গেলো না।" ওই সব হাঙ্গামায় যাবেন না হরিময়বাবু, তারপর যদি অনেক চিঠি এসে যায় উদ্বিগ্ন পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে তা হলে চিরন্তনবাবু আরও বিগড়ে যাবেন এবং নিজের বাজার দর বাড়াবার জন্যে পরের বার লেখা দিতে আরও দেরি করবেন।



চমচম পত্রিকার রেসিডেন্ট কম্পোজিটর উপেনবাবু রেডি হয়ে আছেন, আজ রাত্রেই তিনি চিরন্তনবাবুর লেখাটা 'কম্বোজ' করে ফেলবেন। কোনো অজ্ঞাত কারণ এলাইনে ছাপাকে 'ছাবা' এবং কম্পোজকে 'কম্বোজ' বলা হয়ে থাকে। কলকাতা শহরে উপেনবাবুর থাকবার জায়গা নেই, এই চমচম

অফিসেই রাত্রি কাটান। খোদ আপিসঘরে কম্পোজিটর দিবারাত্র বসবাস করলে কর্তৃপক্ষের সুবিধে অনেক-- উপেনবাবু রাত্রেও আছেন বলে, কোনও এমার্জেন্সিকেই ভয় করেন না চমচম সম্পাদকীয় বিভাগ। মাঝ রাতে কাজ করা যাবে প্রয়োজন হলে। অনেক রাত ধরে হরিময়বাবুও আজ চিরন্তন চ্যাটার্জির ধারাবাহিক উপন্যাসের প্রুফ সংশোধন করছেন।

দ্বিতীয় প্রুফ সংশোধিত হয়ে এখনই আসবে। রাতদুপুরে হরিময়বাবু দেখলেন, বিশ্বাস পরিবারের মূল বাড়ির দোতলায় বংশগোপালবাবুর পুরনো ঘরে আলো জ্বলছে। মনে হলো, বংশধরটিও একইভাবে রাত জেগে বসে রয়েছেন।

এবার ওপর থেকে বংশগোলাপবাবুও দেখলেন, হরিময়বাবুর চমচম অফিসেও আলো জ্বলছে।

রাতদুপুরে দূত মারফত একটা স্লিপ পেয়ে হরিময়বাবু তাঁর তক্তপোশ থেকে উঠে পড়লেন। ক্লাসিক স্টাইলের একটা ডেস্কের উপর হরিময়বাবু সম্পাদকীয় কাজ করেন।

বংশগোলাপবাবু অতিশয় ভদ্রলোক। তিনি লিখেছেন, "দূর থেকে দেখলাম আপনি জেগে রয়েছেন। অনুমতি পেলে নেমে আসতে পারি।"

হরিময়বাবু ভদ্রতা করে নিজেই চললেন এই সম্পত্তির মালিক বংশগোলাপের সঙ্গে দেখা করতে।

রাতদুপুরে চমচম সম্পাদককে কাছে পেয়ে খুব খুশি হলেন বংশগোলাপ বিশ্বাস। রাত জেগে সম্পাদক প্রুফ দেখছেন শুনে তিনি আরও অবাক হলেন। একটা মাসিক ম্যাগাজিন বার করা যে সোজা কথা নয় তা বংশগোলাপ এবার বুঝতে পারছেন।

কিন্তু বংশগোলাপবাবু স্বয়ং কেন নিদ্রাহীন? তিনি বললেন, "এ-বাড়িতে এসে অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটেছে, হরিময়বাবু। সন্ধ্যা ন'টা থেকে সাড়ে-বারোটা পর্যন্ত ঠিক ঘুমোই-- তারপর হঠাৎ কেন যে ঘুম ছুটে যায়! পাকা তিন ঘণ্টা আমি বসে জেগে থাকি-- মনে হয় পূর্বপুরুষ বংশগোপালের

ছবিটা জীবন্ত হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, বিশেষ করে এই মাঝ রাতে।”

হরিময়বাবু জানালেন, “বংশগোপালবাবুরও ওই অসুবিধে ছিল। আড্ডাবাজ লোক, একলা থাকতে পারতেন না। রাত দুপুরেই আমার খোঁজ করতেন।” যদি বংশগোলাপবাবু একটু মনোবল পান এই আশায় কথাগুলো বললেন হরিময়।

হরিময়বাবু আরও বললেন, “রাত্রে অনেক সময় যখন পাচ্ছেন এবং আপনার হাত যখন খালি, তখন ধীরেসুস্থে পূর্বপুরুষদের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করুন। পিকলু বলছিল, আমেরিকায় বহু লোক কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে নিজেদের বংশের লুপ্ত ইতিহাস সংগ্রহ করছেন। শিকড় না কী বলে। ইংরিজিটা হলো, রুটস। তেমন হলে হিন্দিতে লিখুন-- চমচমের বিশেষ হিন্দি সংখ্যায় ছাপা যাবে বংশগোপাল বংশকথা।”

বংশগোলাপবাবু খুশি হলেন। “হরিময়বাবু, আপনি ভাল পরামর্শ দিয়েছেন। আমাদের এই ঘরের লাগোয়া একটা ছোট্ট স্টোররুমে অনেকগুলো কালো রঙের ট্রাঙ্ক রয়েছে। বংশগোপালের মৃত্যুর পরে বোধ হয় আর খোলাই হয়নি। ওইসব বাক্সে অনেক কাগজপত্তর আছে।”

হরিময়বাবু বললেন, “আমার সম্পাদকীয় হাঙ্গামা এখনও শেষ হয়নি। চিরন্তন চ্যাটার্জি তাঁর উপন্যাসের কিস্তির শেষ প্যারাগ্রাফটা এবার বিজয়ের হাতে দেননি। এখনও তিনি ভাবছেন। রাত তিনটের সময় হয়তো অফিসে ফোন করে নিজেই ডিকটেট করে দেবেন লেখার চাপ থাকলে। বিমল মিত্রের মতন উনিও রাত্রে ঘুমোন না। সেদিকে মশাই আমাদের প্রিয় লেখক ভবনাথ সেন ভীষণ ভাল-- লেখায় কোথাও কোনও আচমকা ঝাঁকানি বা প্যাঁচ নেই, তাই রাত্রে ওঁর ঘুমোতে কোনও অসুবিধে হয় না। রাত দশটা থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত চমৎকার ঘুমিয়ে চুপিচুপি উঠে পড়ে ভবনাথ লিখতে শুরু করেন। ভোরবেলার লেখাগুলো সাধারণত স্নিগ্ধ হয়। যত মারপ্যাঁচ থাকে এই মাঝ রাত্রের বেবিগুলোতে। বিমল মিত্তির মশাই বলতেন, অনেক বড় বড় লোক রাত্রে ঘুমোতে পারে না। যেমন বম্বে

ফিলমের গুরু দত্ত। ওঁকে নিয়ে বিমলবাবু বিনিদ্র বলে একটা বই লিখছিলেন। অজ্ঞাত কারণে, মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেলো।"

বংশগোলাপ দুঃখের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের বংশে এই রাত জাগা রোগ কেন এলো বলুন তো?"

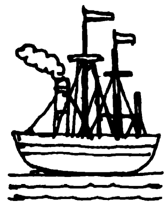
"এটা তো মশাই বংশগত ব্যাধি নয়। স্রেফ একটা নির্দোষ অভ্যাস।"

"আমাকে যিনি মানুষ করেছেন, আমার দাদু বংশবিনয়, তিনিও আমাকে বলেছেন, মাঝরাতে তাঁর ঘুম চটে যায়। ফলে অফিসে যেতে লেট করতেন বেনারসে। তিনি আবার রসিকতা করতেন-- খেয়ে হাগে, শুয়ে জাগে সে ছেলে না কোনও কাজে লাগে। বাংলায় যে কত রকমের ছড়া আছে এবং কত যে তার মানে!"

আরও খবর জানা গেলো। বংশগোলাপ বললেন, "একসময় আমার দাদু বংশবিনয়ের বড়ি খাবার অভ্যাস হলো। ঘুমের বড়ির জোরে ঘুম। কিন্তু এটা ভাল নেশা নয়। ক্রমশই ওষুধের মাত্রা বাড়িয়ে যেতে হয়। আমাকে দিয়ে দাদু দিব্য করিয়ে নিয়েছিলেন, কখনও ঘুমের বড়ি খাবে না। জানেন মশাই, এই পিল খেয়েই দাদুর সর্বনাশ হলো। বৃদ্ধ বয়সে ভুলে একবার অনেকগুলো বড়ি খেয়েছিলেন। বাঁচানোর বহু চেষ্টা করা গেলো, কিছু হলো না। বংশবিনয় বলতেন, সমস্ত দুনিয়া যখন ঘুমোচ্ছে, তখন একলা ধুনি জ্বালিয়ে জেগে থাকার কোনো মানে হয় না। এ মস্ত এক অভিশাপ। ওপরে গিয়ে পিতৃপুরুষের সঙ্গে দেখা হলে আমি রহস্যটা জেনে নেবো।"

হরিময়বাবু বললেন, "আমি এবং মিস্টার পিকলু, দু'জনে বিজ্ঞানবাদী। আমরা অভিশাপটাপে বিশ্বাস করি না। তবে আমি জানতাম না, বংশবিনয় বসুর মৃত্যুও স্বাভাবিক নয়।"

"আমিও এসব বিশ্বাস করতাম না মশাই, কিন্তু নিজের পিতামহ, যিনি আমাকে নিজের সন্তানের মতন মানুষ করেছেন, তিনি প্রায়ই নিজের মনে কথাটা আওড়াতেন-- অভিশাপ, অভিশাপ। মুক্তি দাও, মুক্তি দাও মহাপাপ থেকে। ক্ষমা করো, ক্ষমা করো, আমাকে ঘুম দাও।"



ভোর হয়েছে। সকালেই সল্ট লেক থেকে ভবনাথ সেনের ফোন এলো। "হরিময়, তুমি সত্যিই পিকলুকে চার্জ করেছো।"

"চার্জের বাংলাটা যেন কী? চমচমের নতুন নীতি হচ্ছে যথাসাধ্য খিচুড়ি বিদেশি শব্দ ব্যবহার না করা।"

"বাংলায় বলে 'মন্ত্রমুগ্ধ', কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক এক নয়। সোজা ভাষায় বলা যায়, পিকলুকে তুমি মজিয়েছ। আই আই এম জোকা কলেজের লম্বা ছুটিতে এবার পিকলু বোম্বাই ফিরছে না। কারণ তার বাবা হিন্দুস্তান লিভারের কাজে সস্ত্রীক মিশরে যাচ্ছেন দু'মাসের জন্যে।"

ভবনাথবাবু খুবই আনন্দিত। আদরের নাতি কয়েকটা সপ্তাহ তাঁরই কাছেই থাকবে।

ভবনাথবাবু এবার জানালেন, "পিকলু তার মোটরসাইকেল নিয়ে আধঘণ্টা আগে বেরিয়ে পড়েছে চমচম সদর দপ্তরের সন্ধানে। সম্পাদকের কাজের সঙ্গে একটু জড়িয়ে পড়তে চায়।"

হরিময় সগর্বে ঘোষণা করলেন, "দু চাকা বা চার চাকা থাকলে হাওড়া এবং বিধান নগরের মধ্যে কোনও দূরত্বই নেই! কলকাতার ইস্টার্ন বাইপাস এবং বিদ্যাসাগর সেতুর ব্যাক গ্রাউন্ডে স্যর আপনি একখানা 'পমো' লিখুন।"

ভবনাথবাবু প্রথমে বুঝতে পারলেন না, 'পমো' কথাটা আগে কখনও কানে আসেনি।

হরিময়বাবু হাসলেন। 'পিকলুকে জিজ্ঞেস করবেন। এখনকার ছেলেমেয়েরা আর পুরো নাম, পুরো কথা ব্যবহার করে না। 'পমো' মানে উপন্যাসোপম বড় গল্প। যেমন পলসায়ান্স মানে পলিটিকাল সায়ান্স। ইটি মানে ইকনমিক টাইমস, হরি মানে হরিময় চৌধুরী। একদিন হয়তো চমচমকেও ওরা ডাকবে 'চম' বলে। অবশ্য তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই, যদি কাগজের পাঠক সংখ্যা কয়েকশো বাড়ে।"

টেলিফোন নামিয়ে রেখেই হরিময়বাবু ভটভটিয়ার আওয়াজ শুনলেন। পিকলুকে ওয়েলকাম করবার জন্য সম্পাদকীয় দপ্তর থেকে তিনি দ্রুত বেরিয়ে এলেন।

ভটভটিয়া এসেছে, কিন্তু পিকলু নয়। সেই লোকটা যে নজর আলি লেনের হরিময়বাবুর সঙ্গে দেখা করেছিল অ্যানটিকের সন্ধানে। সাতসকালে এখানকার ঠিকানাও সে খোঁজ করেছে।

মিস্টার সামতানি অফ পুরাতনী এবার হরিময়কে নমস্কার করলেন। অনেক আগে এই প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল প্রাচীনা। সামতানি বললেন, "ইয়েস, নাম কয়েকবার পাল্টেছে। বিদেশে ভীষণ অসুবিধা হচ্ছিল, বাইরের লোকরা ভাবছিল আমরা চিনের পুরনো জিনিস বিক্রি করি।"

সামতানি আবার শহিদ বীরেন্দ্র দত্তগুপ্তর উল্লেখ করলো। "টেবিলটা না হয় আপনি রাখলেন, কিন্তু ফাঁসির আগে লেখা কোনও চিঠিপত্তর? কিংবা বাঘা যতীনের কোনও কাগজপত্তর? বীরেনবাবু তো ফাঁসিকাঠে ওঠবার আগে বাঘা যতীনের নামে অন্যায় রিপোর্ট করার জন্যে ক্ষমা চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, ভুল হয়েছিল। সেই চিঠিটা বেলজিয়মে একজন কিনতে চান।"

"দাম উঠছে বুঝি?" জিজ্ঞেস করেন হরিময়বাবু।

"এবার চড়চড় করে দাম উঠবে, মিস্টার চৌধুরী। টেগার্টের দু'খানা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডায়রি পাওয়ার চান্স রয়েছে আজ। আর কোথাও যদি কিছু

তাকে একটু দেখবেন।"

হরিময়বাবু বললেন, "যে লোকটা সূর্য সেনকে ফাঁসি দিয়েছিল তার ছেলে ইদানীং কলকাতায় মুখ খুলেছে। এদের ফ্যামিলি কিন্তু ক্ষুদিরামের ফাঁসি দেওয়ার কাজ রিফিউজ করেছিল, কিন্তু মাস্টারদার ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেনি। ফাঁসুড়ে নাকি পরে খুব দুঃখ করেছিল। করুন না খোঁজ, হয়তো ফাঁসির দড়িটা পেয়ে যেতে পারেন।"

মিস্টার সামতানি এবার ৪২/৩ হিদারাম হালদার লেনের সম্পত্তিটা ঘুরে ঘুরে দেখলেন। নানা প্রশ্ন করলেন বংশগোপাল বিশ্বাস সম্পর্কে। "খুবই ইন্টারেস্টিং মানুষ ছিলেন মনে হয়। সেই সঙ্গে কালেকটর।"

হরিময়বাবু সরল মনে বললেন, "এই অদ্ভুত ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ তাঁর জীবনের শেষ পর্বে। নাইনটিন ফর্টি ফাইভ থেকে যখন আমি ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে জেল খেটে হতাশায় নেতিয়ে পড়েছি। বংশগোপাল নিশ্চয় এক সময় সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য করেছেন। গোড়ার দিকে সুরেশ মজুমদার, মাখন সেন, গণেন মহারাজ, বাঘা যতীনদের সঙ্গে ভাবভালবাসা ছিল, সেই সূত্রে নিবেদিতাকেও জানতেন একসময়। তবে নিজে কখনও বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েননি।"

"কেন?" সামতানি প্রশ্ন করলো। "আমার নিজের হিসট্রি সম্বন্ধে একটুও আগ্রহ নেই, কিন্তু পুরনো মাল বেচাকেনা করতে গেলে একটু পুরনো ব্যাপার-স্যাপার জানতে হয়।"

ব্যাপারটায় চাপা কৌতূহল অনুভব করেন হরিময়বাবু নিজেও। তিনি বললেন, "আমি একবার চুপিচুপি বংশগোপাল বিশ্বাসকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি রহস্যময় হাসি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, "আমি তখনও খুব ধনী হতে চাইছি হরিময়। তা স্বামী সারদানন্দ একবার আমাকে বলেছিলেন, যে বড়লোক হতে চায় তার আর কিছু হওয়া সম্ভব নয়!"

সামতানি জিজ্ঞেস করলেন, "তা হলে, বংশগোপালবাবু স্বামী সারদানন্দকে চিনতেন?"

"তাই তো মনে হয়। উনি একটা ডাকনামও ব্যবহার করতেন-- দাঁড়ান

এক মিনিট-- রামকৃষ্ণ মঠের সবাই মনে রাখে, অথচ আমার মাথায় থাকে না-- শরৎ মহারাজ-- শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী।"

"ইনি জন্মেছিলেন হ্যারিসন রোড-আমহার্স্ট স্ট্রিটের সংযোগস্থলে-- ১২৫ নম্বরে। বাবার নাম গিরিশচন্দ্র, মা নীলমণি দেবী, আদিনিবাস জনাই। মেডিক্যাল কলেজের সামনে আরপুলি লেনের ওপরে ওষুধের দোকান ছিল — ইম্পিরিয়াল ড্রাগিস্টস্ হল।"

অবাক হয়ে গেলেন হরিময়বাবু। "কী করে জানলেন আপনি, মিস্টার সামতানি।"

ওঁর জানবার কথা নয়, কিন্তু তিনি গিয়েছিলেন জ্যোতি বসুর জন্মস্থান সম্পর্কে খোঁজ করতে ওই হ্যারিসন রোড-আমহার্স্ট স্ট্রিটে। "যদি কিছু পুরনো মাল পাওয়া যায়, একসময় গভরমেন্ট নিশ্চয় চড়া দামে কিনবে। তা খোঁজ করতে গিয়ে শুনলাম, একই জায়গায় এই সন্ন্যাসীরও জন্ম! এঁদের কবিরাজি ওষুধের দোকানের খবরটাও পাওয়া গেলো।"

সামতানিকে বিজয়ের হাতে তুলে দিয়ে হরিময়বাবু সেকেন্ড প্রুফটা নিয়ে বসতে চান, এই ফর্মা আজই ছেড়ে দিতে হবে মেশিনম্যানকে।

আরও অনেকক্ষণ জায়গাটা ঘুরিয়ে বিজয় একসময় সামতানিকে চমচমের অফিস ঘরে নিয়ে এসে চায়ে আপ্যায়িত করলো। কারণটা পরিষ্কার, বিজয়ের হাতে কড়কড়ে দুখানি পঞ্চাশ টাকার নোট জুটেছে। সামতানি লোহার গোলাতেও ঢুকেছেন, তুলসীতলাও দেখেছেন, তবে বংশগোলাপের ওখানে যাননি।

সামতানি চা পান করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন, "তা হলে আপনিই এই বিশাল জমিদারির মালিক।"

"আমি মালিক হতে যাবো কোন অধিকারে? চমচমকে দয়া করে একটু অধিকার দিয়ে গিয়েছেন বংশগোপাল বিশ্বাস-- সেটুকু সবিনয়ে এবং সসম্মানে ব্যবহার করছি। বেঁচে থাকুন বংশগোলাপবাবু এবং তাঁর বংশধররা। আমি কে? আমি তো ব্যাচেলার, চোখ বুজলেই সব শেষ-- আমার নাম দিতে পারেন বংশলোপাট চৌধুরী।"

এবার আরেকটা মোটরবাইকের আওয়াজ পাওয়া গেল। চোখে কালো চশমা লাগিয়ে আবির্ভূত হলেন স্বয়ং শ্রীমান পিকলু সেন। "বিদ্যাসাগর ব্রিজ ধরে আসতে গিয়ে চারদিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায় হরিময়দাদা, হাওড়াকে কলকাতা থেকে বেশি সুন্দরী মনে হয়।"

"হুম! হাওড়া চিরকালই সুন্দর ছিল-- গঙ্গার পশ্চিমকূল বারাণসী সমতুল! সাধে কি আর নরেন্দ্রনাথ দত্ত বিশ্বভুবন ঘুরে এসে এই হাওড়ায় বেলুড়মঠ স্থাপন করলেন! দুঃখের ব্যাপার তাঁর বন্ধু কালীবেদান্তী স্বামী অভেদানন্দ হাওড়াকে তেমন পছন্দ করতেন না। আমেরিকা থেকে ফিরে এসে তিনি চেয়েছিলেন মঠকে বেলুড় থেকে কলকাতায় সরিয়ে নিতে।"

সামতানির দিকে একবার তকিয়ে দেখলো পিকলু। কিন্তু তখন সামতানি মোটরবাইকে স্টার্ট দিচ্ছেন। পিকলু জিজ্ঞেস করল, "মিস্টার সান্যাল কোথায়?"

সমতানির প্রথম দিনের সঙ্গীর কথা হরিময়বাবু ভুলেই গিয়েছিলেন। দুঃখ করে বললেন, "এবার বোধহয় আমাকে হিমালয় ড্রাগ কোম্পানির মেনটাট খেতে হবে, আয়ুর্বেদিক ওয়ান্ডার ওষুধ, স্মৃতিশক্তি বর্ধনে অপরিহার্য।"

এবার বিজয়ের সঙ্গে পিকলুকেও সম্পত্তিটা ঘুরে দেখানোর কনডাকটেড ট্যুরে পাঠালেন হরিময়।

ফিরে এসে পিকলু মন্তব্য করলো, "এতো একটা রাজত্ব, হরিময়দাদা। চমচম যদি পৃথিবীর তেতাল্লিশটা ভাষায় প্রকাশিত হয় তা হলেও জায়গার কোনও অভাব হবে না।"

হরিময়বাবু বললেন, "সবই যাকে বলে কি না ঠাকুরের ইচ্ছে-- তিনিই জুটিয়ে দিয়েছেন। অবস্থা বুঝলে তিনিই কেড়ে নেবেন।"

"জায়গাটা একটু অগোছালো হয়ে পড়ে আছে।" এটা পিকলুর সকৌতুক মন্তব্য।

"এটাই তো স্বাভাবিক। মস্ত জায়গা, কিন্তু সম্পত্তি থেকে তেমন রোজগার নেই। ওই ভাড়াটিয়ারা যা দেয় তার থেকে কোনওক্রমে ট্যাক্সো

ও জমাদারের খরচ উঠে যায়। এখন মালিকের বংশধর ফিরে এসেছেন, এবার যদি মাথা ঘামিয়ে তিনি কিছু করতে পারেন। উপার্জন বৃদ্ধি এবং শ্রীবৃদ্ধি একসঙ্গেই হতে পারে।"

পিকলু বললো, "এতখানি খালি জায়গা, কিন্তু সবুজ দেখলাম কেবল ওই তুলসীমঞ্চের কাছে। ওটার নাম দিন চমচম পার্ক।"

হরিময়বাবু বললেন, "আমি ভাবছিলাম, নাম দেবো বংশগোপাল উদ্যান। কিন্তু ওই ভদ্রলোক কোথাও নিজের নামের কোনও চিহ্ন রাখতে চাইতেন না। সব কিছু লুকিয়ে লুকিয়ে করতে ভালবাসতেন।"

"ইন্টারেস্টিং!" পিকলু বললো।

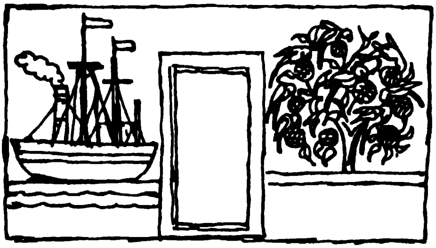
"লুকিয়ে লুকিয়ে লেখাও!" জানালেন হরিময়বাবু। "বংশগোলাপবাবু গত রাত্রে অনেক সন্ধান করেছেন রাত জেগে— অকস্মাৎ বংশগোপালবাবুর পুরনো কিছু রচনা ও ডায়রির সন্ধান পেয়েছেন।"

পুরনো ব্যাপারে ইদানীং পিকলুর আগ্রহ জেগেছে। সে বললো, "চলুন না, কাগজগুলো দেখি। অন্তত পঞ্চাশ বছরের পুরনো রচনা।

"দাদু বলছিলেন, ওঁর ভীষণ ইচ্ছে, একবার অন্তত শ্রীম অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথ গুপ্তর অরিজিন্যাল ডায়রিগুলো দেখার। উনি অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর সঙ্গে ফোনে এ বিষয়ে কথা বলেছিলেন, কিন্তু শঙ্করীপ্রসাদবাবু নিজেও কখনও ওই ডায়রি দেখেননি।

"অথচ কবে আমেরিকায় ওসবের ফটো কপি চলে গিয়েছে।"

এবার হরিময়বাবু দুঃখ করলেন, "ভাল জিনিস, দামি জিনিস এদেশে কিছুই থাকবে না, মিস্টার পিকলু, সব ইংল্যান্ডে চলে যাবে— কোহিনূর থেকে আরম্ভ করে কবিগুরুর গীতাঞ্জলির অরিজিন্যাল পাণ্ডুলিপি পর্যন্ত। বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, মহাত্মা গান্ধী, বিবেকানন্দ, এমন কি ক্ষুদিরাম-বাঘা যতীনের জিনিসপত্র সব এক্সপোর্ট হয়ে যাবে।"



হাওড়া শিবপুরের এই জায়গাটা পিকলুর বেশ ভাল লেগে গিয়েছে। "এখানে হিসট্রির সোঁদা গন্ধ রয়ে গিয়েছে, হরিময়দাদা।"

সম্পত্তির ভিতরে বিরাট বিরাট কয়েকটা আম গাছ এবং একটা বটগাছ আছে। এই ধরণের গাছ থাকলে মরুভূমিও বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। না-চাইলেও পাখিরা এসে হাজির হয়, ভোরবেলায় গান গায়। তার সঙ্গে ইতিহাসের নীরব হাতছানি।

হরিময়বাবু অতশত ইতিহাস বোঝেন না। বললেন, "কোথায় হিসট্রি? যে লোকটা এই সম্পত্তি তৈরি করেছিলেন তাঁকে আমি দেখেছি। মূল বাড়িটার অবস্থা এখন ভাল নয়-- কিন্তু বাড়ির জন্ম-বয়স লেখা রয়েছে-- ১৮৯৭। তার মানে এই সেদিনের। অথচ সিমেন্ট ব্যবহার না করে স্রেফ সুরকির ওপর কাজ করায় অকালবার্ধক্যের কিছু লক্ষণ দেখা দিয়েছে। এ দেশে মানুষও বেশি বছর টেকে না, বাড়িও টেকে না।"

"সত্যি এখানে বয়সটা তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়, হরিময়দাদা। প্যারিসের, লন্ডনের তিনশ বছরের পুরনো বাড়ি দেখুন, মনে হবে যেন গত বছর তৈরি হয়েছে।"

হরিময়বাবু ইতিমধ্যে ভবনাথ সেনের সঙ্গে আবার দেখা করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন।

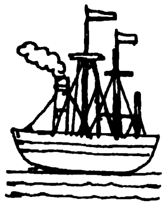
পিকলু বললো, "আজ বিকেলে দাদু কোথাও মিটিঙে যাবেন। দেখা

করতে·হলে এখনই যেতে হবে আপনাকে।"

হরিময়বাবুকে চুপিচুপি ভিতরের খবর দিল পিকলু। "আজ দিদিমা স্পেশাল খিচুড়ি রাঁধছেন উইথ ইলিশ মাছ ভাজা, ঢাকা থেকে দাদুর এক ভক্ত দিয়ে গিয়েছেন সকালে। ঢাকার ইলিশ যে ওয়ার্লডের সেরা ভবনাথ সেন এটা বইতে লিখিতভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন।"

হবিময়বাবুর মাথায় আচমকা আইডিয়া এসে গেলো। ইলিশের ওভারডোজের পর শরীরের পক্ষে যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় তা হলো দুলালের দই। সাদা দই হজমের পক্ষে সেরা। বাংলায় একটা প্রবন্ধ পড়ে হরিময়বাবু রঙিন দই কেনা ছেড়ে দিয়েছেন।

কালিবাবুর বাজারের কাছে পিকলুর মোটরকবাইক থামিয়ে হরিময়বাবু মিষ্টি দই ও আরও একটা বাক্স নিয়ে নিলেন। বাক্সে যে চমচম কয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। "চমচমের পক্ষ থেকে দেখা করতে যাওয়া, অথচ হাতে চমচম নামক মিষ্টান্নের বাক্স থাকবে না এটা গ্রামাটিক্যালি এবং ড্রামাটিক্যালি ভুল, "মিস্টার পিকলু। "গ্রামার না হয় বোঝা গেলো, কিন্তু ড্রামা?" হরিময়বাবু উত্তর দিলেন, "সব সম্পর্কের মধ্যে মাঝে মাঝে একটু নাটকীয়তা একটু বিস্ময় না রাখলে লাইফটা বিস্বাদ হয়ে ওঠে, মিস্টার পিকলু।"



ভবনাথবাবু ঝটিতি হরিময়বাবুর বাক্স থেকে একটা বিগ সাইজ চমচম তুলে নিলেন। দু'মিনিট চোখ বুজে রসাস্বাদন করে তিনি বললেন, "অতি উত্তম! আজ অতি শুভদিন। যাচ্ছি কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে বক্তৃতা করতে। ইচ্ছে আছে, সময় পেলে কাশীপুরে গোপাললাল শীলের বাগান বাড়িটাও খোঁজ করে আসবো।"

"সেটা কোথায়?" জানতে চাইছেন হরিময়বাবু।

"সেইটাই তো গোলমাল! ওই বাড়িতে ভক্তদের নিয়ে স্বামীজি কয়েক রাত্রি কাটিয়েছিলেন আমেরিকা থেকে ফেরবার পরেই অর্থাৎ ১৮৯৭ সালে। এই বাড়িতে বহুজনের পদধূলি পড়েছিল। বাড়ির ভিতরকার ছবিও আছে। অথচ একশ বছর যাবার আগেই বাড়িটার পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না— স্বামী প্রভানন্দ অফ বেলুড়মঠ হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন। অথচ প্রভানন্দ জানেন না এমন খবর রামকৃষ্ণ মিশনে নেই। বহু বছর ধরে পরম ধৈর্যের সঙ্গে গবেষণা করে যাচ্ছেন, একের পর এক বই লিখে যাচ্ছেন। একটা বাড়ির খবর পাওয়া গেলো, কিন্তু সেটা গঙ্গাতীর থেকে অনেক দূরে। বরুণ মহারাজ আশঙ্কা করছেন, গোপাললাল শীলের ঐতিহাসিক বাড়িটা সি ই এস সি-র কাশীপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মধ্যে বহু বছর আগেই বিলীন হয়ে গিয়েছে। কাশীপুর পাওয়ার স্টেশনের বয়স তো কম হলো না। কিন্তু দুঃখ

করা চলবে না, কারণ স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন, এদেশে প্রচুর বিদ্যুৎ উৎপাদন হোক এবং তার জোরে দেশের রূপ পাল্টে যাক।''

ভবনাথবাবু যৌবনকালে ও মধ্যবয়সে শ্রীরামকৃষ্ণ নিয়ে তেমন মাথা ঘামাননি। বছরখানেক আগে অসুস্থ হয়ে পি জি হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডে থাকবার সময় হরিময়বাবু তাঁর হাতে একখানা অখণ্ড শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত গছিয়ে দিয়েছিলেন।

হরিময়বাবু রসিকতা করে বলেছিলেন, ''স্রেফ সস্তা বলে দিলাম— এই সংস্করণের ছাপা ও বাঁধাই অনবদ্য।''

''তুমিই তো সেবার আমার ক্ষতিটা করলে, হরিময়। পি জি থেকে ফিরে এসেও ঠাকুর সম্পর্কে আমার তৃষ্ণা অপরিতৃপ্ত থেকে গেলো। এখনও কিছু কিছু পড়ে যাচ্ছি, দু' একটা প্রবন্ধও লিখে ফেলেছি, তবে ছোটখাটো লেখা। কিন্তু সেইসব লেখা অনেকের নজরে পড়েছে। ফলে মঠের মহারাজরা আদর করে সভাসমিতিতে ডাকতে শুরু করেছেন।''

হরিময়বাবু রসিকতা করলেন, ''সংসারের সর্বস্ব ত্যাগ করে, মাথা কামানো সন্ন্যাসীরা কি করে মহারাজ হন, ভবনাথবাবু? আসলে তো ওঁরা ভিক্ষাজীবী!''

হা-হা করে হাসলেন ভবনাথ সেন। ''আদিতে ওঁরা রাজা-মহারাজা কিছুই ছিলেন না। তারপর স্বামীজির চেলা স্বামী সদানন্দ এলেন বরানগর মঠে, হাতরাস স্টেশনের কর্মচারী ছিলেন, ইউ-পি-তে অনেক পুরুষের বাস। উনিই উত্তর ভারতের স্টাইলে গৈরিকধারী সন্ন্যাসীদের মহারাজ বলা শুরু করলেন, নিজেও হয়ে গেলেন গুপ্তমহারাজ! দ্যাখো, যাঁরা সর্বস্ব বিসর্জন দিতে পারেন একমাত্র তাঁদেরই মহারাজ হওয়া সাজে!''

এরপর পিকলুর বাজার সার্ভের কথা ঠাণ্ডা মাথায় তুললেন হরিময়বাবু।

''পিকলু বলেছে, এই শতভঙ্গ বঙ্গদেশে এখনও দু'জন মহারাজের মার নেই— শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এবং নেতাজি। আমিও সাহস পেয়ে গিয়েছি। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্পেশ্যাল সংখ্যায় আমি কাউকে স্পনসর নেবো না, কারণ কাঞ্চনের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন কোনও কোম্পানি এখনও দুনিয়ায়

প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু ঐ সংখ্যায় আপনার একটা লেখা চাই। ভবনাথ সেন যদি ঠাকুর সম্বন্ধে একটা গরম লেখা চমচমে শুরু করেন তা হলে পাঠকদের মধ্যে ফাটাফাটি শুরু হয়ে যাবে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর মাসিক বসুমতীতে ঠাকুরের ধারাবাহিকের পরে অনেকদিন রামকৃষ্ণসাহিত্যের তেমন বাজারে হইচই পড়েনি।"

প্রস্তাব শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন ভবনাথ সেন। হরিময়কে বললেন, "বড় কঠিন বিষয় এই রামকৃষ্ণ। মাস্টারমশাই মহেন্দ্র গুপ্ত এ-লাইনের বারোটা চিরকালের জন্য বাজিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, সেই সঙ্গে শরৎ মহারাজের দু'খণ্ডে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ। এ বিষয়ে আর কিছু লেখার প্রয়োজন নেই। শরৎ মহারাজ সব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে বিচার করে ঠাকুর সম্বন্ধে যা গ্রহণ করবার এবং যা বর্জন করবার তা করে, তবে দেহ রেখেছেন। মস্ত সন্ন্যাসী যে মস্ত লেখক হতে পারেন তার বেশ কিছু উদাহরণ পাবে এই রামকৃষ্ণ মিশনে।"

"পূর্বসূরীদের অনুসন্ধানে কিন্তু কিছু ফাঁক সারাক্ষণ থেকে যায়," ভবনাথবাবুকেই উদ্ধৃত করলেন হরিময়বাবু। "আপনিই তো গত মাসে রবিবাসরীয় বর্তমান পত্রিকায় লিখেছেন, ঠাকুর এখনও খেলা দেখাচ্ছেন এবং দেখাবেনও। তা না হলে অচিন্ত্যবাবুর পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কীভাবে পাঠক মহলে এমন হইচই বাধায়? লোকে তো বোকা নয়, নিশ্চয়ই কিছু পেয়েছে। লোকমুখে রটে গেলোঃ ঠাকুর তোমায় কে চিনতো, না চেনালে অচিন্ত্য!"

পিকলু এতক্ষণ চুপচাপ কথা শুনে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে বলে বসলো, "দাদু, তুমি কখনও রহস্যকাহিনী লেখোনি। সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনকথা আজকাল আমার বন্ধুরা তেমন পছন্দ করছে না। তারা পছন্দ করে উত্তেজনা, কিছুটা অনিশ্চয়তা, সারাক্ষণ একটা কী হয় কী হয় ভাব।"

"এসেছে! এসেছে— আইডিয়া এসেছে!" সোফা থেকে তড়াং করে উঠে দাঁড়িয়ে হরিময়বাবু এবার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। "ভীষণ ব্যাপার হবে। আমি এ সংখ্যাতেই একটা রঙিন কাগজ পেস্ট করে অ্যানাউনস

করছি: বাংলার ডিকেন্স সাহিত্যসাধক ভবনাথ সেনের প্রথম ভক্তিঘন রহস্যকাহিনী। আগমী সংখ্যা থেকে চমচমে প্রকাশিত হবে।"

ভবনাথবাবুর মাথায় তখনও ব্যাপারটা ঢুকছে না। হরিময়বাবু বললেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিয়ে গান লেখা হয়েছে, পুঁথি লেখা হয়েছে, নাটক লেখা হয়েছে, কথামৃত লেখা হয়েছে, পত্রাবলী হয়েছে, কিন্তু রহস্যকাহিনী এখনও রচিত হয়নি ভবনাথবাবু। ভগবানের ইচ্ছেয় এই দুর্লভ দায়িত্বটা আপনাকেই পালন করতে হচ্ছে।"

"কীসব আজগুবি আইডিয়া দিচ্ছো হরিময়!" মৃদু প্রতিবাদ জানালেন ভবনাথ সেন।

হরিময় পাল্টা আঘাত করলেন, "আপনিই এবারে তো লিখেছেন, ঠাকুর হলেন পূর্ণ। কোন দুঃখে বাংলা সাহিত্যে তিনি অপূর্ণ থেকে যাবেন? বিশেষ করে চমচম পাঠকরা যখন প্রস্তুত রয়েছে, ভবনাথ সেনের সব রকম পরীক্ষানিরীক্ষার গিনিপিগ হতে।"

ভাবনাথ বললেন, "হরিময় তুমি বুঝছো না। লোকে নিন্দে করবে। বলবে— বুড়ো বয়সে কথাসাহিত্যিক ভবনাথ সেনের মাথার ব্যারাম হয়েছে! পরমপুরুষদের নিয়ে কস্মিন কালে কেউ কি ডিটেকটিভ গল্প লেখে?"

ব্যাপারটা পিকলুকে খুব আনন্দ দিচ্ছে। সে এবার জিজ্ঞেস করলো, "রামকৃষ্ণকে নিয়ে কি কোনও রহস্য আজও কি রহস্যময় হয়ে আছে? সেইটা নিয়ে প্রথমে খোঁজখবর করা যেতে পারে? তারপর তো রহস্যামৃত।"

ভবনাথ বললেন, "হরিময়দাদুকে জিজ্ঞেস করলে, উনি বলে বসবেন, পরমপুরুষদের সমস্ত জীবনটাই তো রহস্যময়।"

পিকলুর দিদিমা চতুর্থ দফায় চিঁড়ে-ভাজা ও চা সাপ্লাই করতে এসে ব্যাপারটার মধ্যে গল্প গন্ধ পেয়ে স্বামীকে বললেন, " দশটা নয় পাঁচটা নয়, একটা মাত্র নাতি আব্দার করে তোমাকে একটা লিখতে বলছে, আর তুমি তা শুনছো না!"

ভবনাথবাবু বললেন, "যিনি নায়ক তাঁর কোনো রহস্য না থাকলে রহস্যরচনা কী করে হবে? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষটা তো ছিলেন কাচের মতন স্বচ্ছ— কোথাও কোনও অস্পষ্টতা ছিল না। আত্মীয়দের সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক ছিল, স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক ছিল, ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক ছিল, নিয়োগকর্তার সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক ছিল, শিষ্যদের সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক ছিল এসব তো ভক্তদের কাছে এবং সন্দেহপ্রবণদের কাছেও সব জলের মতন পরিষ্কার।"

পিকলু উত্তর দিলো, "তাহলে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ডক্টরেট গবেষক কেন বাঁকা-বাঁকা কথা লিখেছে এই বছরে? স্টেটসম্যান বুক রিভিউ পড়োনি দাদু?"

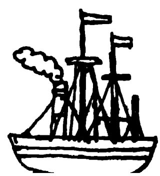
"পড়েছি। কিন্তু ওসব মানসিকভাবে অসুস্থ লোকদের কাজ, পিকলু। লেখকের মনোরোগের চিকিৎসা দরকার। মাথায় একটা বদ্ধ নোংরা ধারণা নিয়ে প্লেনে চড়ে এদেশে এসেছিলেন, সেটা গোপন করে এদেশের সন্ন্যাসীদের দয়াদাক্ষিণ্যের সুযোগ নিয়েছেন। আতিথেয়তার অপব্যবহার করেছেন, তারপর ফিরে গিয়ে শরীরের ভিতরে জমে ওঠা নোংরাটা বমি করে দিয়েছেন। কিন্তু এতে ফল ভাল হয় না। ঠাকুর যেমন ছিলেন ঠিক তেমনই আছেন।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের সবটাই স্বচ্ছ। কিছুই যে লোকচক্ষুর অন্তরালে নেই তা ভাবতে চাইছেন না হরিময়বাবু। কিন্তু তিনি যুক্তিতে পেরে উঠছেন না। হরিময় বললেন, "ওই যে ভগবান রামকৃষ্ণ নিজেকে একজন পেন্সিলার বলতেন! আপনার বেয়াই, পুলিশের ডি আই জি সি আই ডি রঞ্জন সেন সেদিন টি-ভি-তে বললেন, সাট্টা খেলার চক্রে বড়বাজারে দু'জন পেন্সিলার ধার পড়েছে।"

"আর হাসিও না, হরিময়। ঠাকুর বেঁচেছিলেন ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত। তখনও পর্যন্ত এখানে কেউ সাট্টার নামও শোনেনি। আসলে, পেন্সনার অর্থাৎ অবসরভাতার ভোগীকে ঠাকুর সরল মনে পেন্সিলার বলতেন। ওঁর নিজের যে মাসে সাত টাকা পেনসন ছিল, দক্ষিণেশ্বর মন্দির থেকে— পূজা

করুন চাই না করুন, এই টাকা পাবেন।"

ভবনাথবাবু স্বীকার করছেন, রামকৃষ্ণ রহস্যামৃত নামটা চমচম পত্রিকায় জমবে ভাল, কিন্তু রহস্য গল্পের প্লটটা মাথায় না-আসা পর্যন্ত তাঁর পক্ষে এ-বিষয়ে রাজি হওয়া একেবারেই সম্ভব নয়। "বড় কঠিন সাবজেক্ট এই ঠাকুর অ্যান্ড হিজ টিম, বুঝলে হরিময়, বড় বড় লেখক ওখানে দাঁত ফুটোতে গিয়ে দাঁতে প্রবল ব্যথা নিয়ে সরে এসেছেন।"



সল্টলেকে রাতের ডিনার সেরে হরিময়বাবু আবার পিকলুর বুলেট বাইকের পিছনে বসেছেন।

প্রচুর খাইয়ে দিয়েছেন পিকলুর দিদিমা, সেই সঙ্গে টিফিন কেরিয়ারে লুচি দিয়েছেন ফর টুমরো। বাসি লুচি উইথ শিবপুর শ্রীদুর্গা মিষ্ঠান্ন ভাণ্ডারের দরবেশ ইজ অমৃতবৎ।

পিকলু আবার কলকাতায় এসে খাস্তা কচুরির ভক্ত হয়ে উঠেছে। হরিময়বাবু সারাজীবন ধরে বোঁদে, জিলিপি এবং কচুরি সম্পর্কে রিসার্চ করে যাচ্ছেন। বোঁদের পিছনে নাকি পনেরো হাজার বছরের ইতিহাস রয়েছে।

পিকলু এখন কয়েকটা দিন হরিময়বাবুর সঙ্গে কাটাবে। আউটিংকে আউটিং, এডুকেশনকে এডুকেশন!

হরিময়বাবু কোলের কাছে টিফিন কেরিয়ার ধরে রেখে চলমান অবস্থায় বললেন, "স্বামী বিবেকানন্দ বাঙালির কচুরি-জিলিপি জলখাবারের ওপর বেজায় চটে উঠেছিলেন কেন বুঝতে পারি না। উত্তর কলকাতার নরেন দত্ত তুমি, ময়রার দোকানের জলখাবারের নিন্দে করবে কেন? ওঁর বন্ধু, ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান স্বামী ব্রহ্মানন্দ কিন্তু কুস্তিলড়ার পর প্রতিদিন আধসের নোনতা এবং মিষ্টি খেতেন। ফলে বাঁচলেনও বেশিদিন, বিবেকানন্দ মারা যাবার পরে প্রথমপর্বে মঠমিশনকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেলেন।"

পিকলু মোটরসাইকেল চালাতে চালাতে বললো, "হরিময়দাদা, ভাগীরথীর ওপর এই নতুন বিদ্যাসাগর ব্রিজ একখানা যা হয়েছে না!"

"এর নাম হওয়া উচিত ছিল লা-জবাব, অর্থাৎ কিনা যার কোনো জবাব নেই!" বিদ্যাসাগরমশাই নিজের চোখে দেখলে খুশী হতেন।

দ্বিচক্রযানের স্পিড বাড়িয়ে দিয়েছে পিকলু। "অসুবিধে হচ্ছে না তো?" সে জিজ্ঞেস করলো।

হরিময়বাবু যে মোটরবাইকে চড়তে একটু ভয় পান তা কারও অজানা নয়। কিন্তু ক্রমশই তাঁর সাহস বেড়ে যাচ্ছে। এত নামই সঙ্গসুধা!

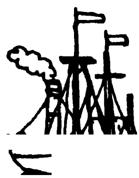
হরিময়ের উত্তর, "অসুবিধে কী? সমস্তটাই তো সুবিধে— ঠাণ্ডা মিষ্টি হাওয়া! সমস্ত শরীরে যেন আইসক্রিম স্প্রে করছে, মিস্টার পিকলু।"

ব্রিজের ওপর গাড়ি থামিয়ে পিকলু ও হরিময়বাবু দু'জন কিছুক্ষণ মুখ ঘুরিয়ে কলকাতার অনির্বচনীয় সৌন্দর্য উপভোগ করলো।

হরিময়বাবু হঠাৎ উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন, "ওয়ার্লডের বেস্ট সিটি মশাই এই কলকাতা! জ্যোৎস্নায় নিউ হাওড়া ব্রিজ থেকে নিউ ক্যালকাটা দেখবার জন্যে হাজার টাকা টিকিট করা উচিত সায়েব ট্যুরিস্টদের জন্যে। তাতেও ডেলি লাখো লোক হবে, আর পূর্ণিমার দিনে তো পুলিশ বসাতে হবে ভিড় সামলাবার জন্যে। বেটার দ্যান তাজমহল আমাদের নিজস্ব ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল।"

"লিখুন না আপনি," পরামর্শ দিল পিকলু।

“এ বিষয়ে ইংরিজিতে লিখতে হবে তোমাকে। বাংলায় লিখলে আজকাল কারও নজরে পড়ে না, কেন জানি না,” গভীর দুঃখ প্রকাশ করলেন চমচম সম্পাদক। “আমাদের মুরোদ আসানসোল পর্যন্ত, বুঝলে ব্রাদার।”





পিকলুর বুলেট বাইক যখন শিবপুর মন্দিরতলা পেরিয়ে ৪২/৩ হিদারাম হালদার লেনে পৌঁছল তখন রাত অনেক। হাওয়া ব্রিজের শোভা দেখতে গিয়ে বেশ দেরি হয়ে গিয়েছে।

চুপিচুপি গেট ঠেলে পিকলু ও হরিময়বাবু কম্পাউন্ডের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। কোথাও কোনও পাহারাদার নেই। — উদ্বিগ্ন হরিময়বাবু মন্তব্য করলেন, “নাইট সিকিউরিটির তো দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা উচিত ছিল। অদ্ভুত এই নিউজেনারেশন দারোয়ান পার্টি, এরা দিনেও ঘুমোয়, রাতেও ঘুমোয়। দারোয়ানের ভাইপোটা রান্নাবান্না করে। কিছু বলার উপায় পর্যন্ত নেই— সেই বংশগোপালবাবুর সময় থেকে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা— আজন্ম পারিবারিক অ্যাপয়েন্টমেন্ট । প্রথম প্রহরীর করে রেখেছে নাম ছিল লাট্টু সিং, দ্বিতীয় প্রজন্মের প্রহরীর নাম টায়ার সিং। তার ভাইপোর নাম রেখেছে ম্যানেজার সিং! এ পাড়ার কালোয়ারদের সঙ্গে দারোয়ানাদের খুব ভাবসাব। পাড়ার প্রহরীদের সমর্থনও সাহায্য না পেলে ওয়াগন ব্রেকিং শিল্পে টু পাইস হয় না।”

পিকলু জোকার ম্যানেজমেন্ট স্কুলের ছাত্র হিসেবে জানতে চাইলো, "এ-অঞ্চলের প্রধান বিজনেস কী?"

হরিময়বাবু সৎ উত্তর দিলেন, "আগে ছিল ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, ওয়াগন শিল্প— এখন হয়েছে ওয়াগন ব্রেকিং। রেলের ইয়ার্ডে দূরদূরান্ত থেকে আসা যত মালবোঝাই ওয়াগন দাঁড়িয়ে থাকে সেগুলো লুট করলে অনেক পয়সা। সুযোগ পেলে এঁরা বি এন আর লাইনটা উপড়ে কালোয়ারদের কাছে বিক্রি করে দেবেন!"

হরিময়বাবু সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে নামটা পছন্দ করেন না, পুরনো বি এন আরই তাঁর পছন্দ! সস্তায় খুন করবার জন্যেও অনেক পার্টি এখানে নিয়মিত আসেন। বললেন, "দাম পড়তে পড়তে বডি ফেলিয়ে দেবার টোটাল ফি এখন মাত্র একশ পঁচাশি টাকা পঁয়তাল্লিশ পয়সায় নেমে গিয়েছে। ভাবছো এরকম অদ্ভুত রেট কেন? আসল রেট হল একশ পঁচাশি, বাকিটা হল বিক্রয় কর! শুনছি কিছুদিনের মধ্যে আবার সার্ভিস চার্জও চাপবে! ট্যাক্সওয়ালাদেরও দোষ নেই, তাদেরও তো সরকারের খরচ তুলতে হবে।"

পিকলুর চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। হরিময়বাবু ব্যাপারটা বুঝে তাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

বললেন, "আমার তক্তপোশে শুতে পারো— সোফা-কাম-বেডের অনুপ্রেরণায় তৈরি অফিস-কাম-বেড, বিছানা থেকে শুধু চমচমের গুলো সরিয়ে নিলেই হলো।"

ফিস ফিস করে হরিময় বললেন, "বহুবছর আগে একদিন নাকি সিস্টার নিবেদিতা এ-বাড়িতে এসেছিলেন বংশগোপালবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। রাত হয়ে যাওয়ায় এবং হাওড়া ব্রিজ খোলা থাকায় ওঁকে এখানে থেকে যেতে হয়েছিল। সেইদিনই পবিত্র হয়েছিল এই তক্তপোশ।"

ব্রিজ খোলার ব্যাপারটা পিকলু তখনও বুঝতে পারছে না। হরিময়বাবু বললেন, "তখন রবীন্দ্রসেতুও হয়নি, বিদ্যাসাগর সেতুও হয়নি— স্রেফ পন্টুন ব্রিজ। প্রায়ই খুলে দেওয়া হতো জাহাজ চলাচলের জন্যে। হাওড়ার

লোকদের পুল খুলে দেখার সময় শুনে কাগজে দেখে তবে কলকাতায় আসতে হতো। কেন যে বংশগোপালবাবু এই হাওড়া শহরে এমন বাড়ি করেছিলেন তা তিনিই জানেন!"

পাশের ঘরে স্টিল টিউবের ফোল্ডিং খাট দাঁড় করানো রয়েছে। যুদ্ধের পরে ডিসপোজাল থেকে কিনেছিলেন হরিময়বাবু ফর চমচম— এমার্জেন্সি অতিথি সেবার জন্য এখনও ভাল সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে। সেই ভাঁজ করা খাট বিছিয়ে আজ রাত্রে একটু দূরে শোবেন হরিময়বাবু। ওঁর একটু নাক ডাকানোর বদ অভ্যাস আছে। শুনেছেন বিদেশে নাকডাকা মানুষের নাকের সায়লেন্সার বেরিয়েছে। বিদেশের ভাইপোকে হরিময়বাবু বলবেন একটা নমুনা পাঠাতে।

কয়েক মিনিটেই পিকলুকে ঘুমিয়ে পড়তে দেখে খুব খুশি হলেন হরিময়বাবু। কম বয়সের ছেলেমেয়েদের হাজার সুবিধে, ঘুমটা কত সহজে এসে যায়। আর বুড়ো হলে ইঞ্জিনটা ঠাণ্ডাই হতে চায় না, শরীর ও মন দুটোই শান্ত না হলে ঘুম আসবে কী করে?

হরিময়বাবু ভাবছেন, কী করে ভবনাথ সেনের ওপর আর একটু চাপ দেওয়া যায়? একমাত্র ভবনাথই পারেন চমচমকে চাঙ্গা করতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে পরের পর লিখে। অমন চমৎকার নামটা পর্যন্ত ঝট করে এসে গেলো— শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ রহস্যামৃত। এই নামে নিশ্চিত সাফল্য। প্রয়োজনে দেওয়ালে চমচমের পোস্টার সাঁটাবেন সারা কলকাতায়— থিয়েটার-সিনেমার স্টাইলে, তাতে যদি কিছু টাকা যায় যাক। চমচমের পলিসিই হলো, বেশি টাকাকড়ির ফাঁদে জড়িয়ে না-পড়া। ঠাকুর আগে বলেছেন, যত মত তত পথ, ভাল করে খুঁজলে হয়তো কোথাও পাওয়া যাবে যত আয় তত ব্যয়!

কিন্তু ভবনাথবাবুর দ্বিধাটা কোথায়? একটু শ্রীরামকৃষ্ণ গবেষণার? তা হরিময়বাবু প্রয়োজনে শঙ্করীপ্রসাদ বসুর কাছে এখান থেকে রিকশ চড়ে নিয়মিত চলে যাবেন— উনি হচ্ছেন ঠাকুর-স্বামীজি সংবাদের স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া! দুনিয়ায় মঠ মিশন সংক্রান্ত যত পিকুলিয়র খবর ভদ্রলোক

ঘুরে ঘুরে, টুকে টুকে এবং পড়ে পড়ে সংগ্রহ করে চলেছেন।

তবে শঙ্করীপ্রসাদ বাবু মহাশয় বেজায় ভক্ত লোক, মহাপুরুষদের সমালোচনা, ভুল ধরা এসব একদম পছন্দ করেন না। চমচম থেকে ওঁকে 'ভক্তিরসসাগর' টাইটেল দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। সেই সঙ্গে একখানা গোল্ডেন জিলিপি পুরস্কার। হঠাৎ আরেকজনের কথা স্মরণে এসে গেলো— মিস্টার হুটকো হালদার। এই হিদারাম হালদারদেরই আত্মীয়। কিছুদিন হলো, বম্বে থেকে কাজে অবসর নিয়ে চলে এসেছেন নিজের জন্মস্থানে শান্তভাবে বাকি জীবন যাপন করতে।

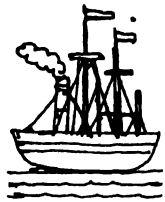
ভদ্রলোক প্রথমে ছিলেন ওলাবিবিতলা লেনে, সম্প্রতি এই মন্দিরতলায় ফ্ল্যাট নিয়ে উঠে এসেছেন। সেদিন চমচমের ব্যাক কপি কিনতে এসেছিলেন। সেই সঙ্গে ঠাকুর-স্বামীজি সম্বন্ধে অনেক মজার কথা বলে গেলেন।

ঠাকুরের মুখে একদম আগল ছিল না, তিনি নাকি বলতেন— হেগো-গুরুর পেদো শিষ্য! তার মানে, এই গুরু সিস্টেম সম্বন্ধেই ঠাকুরের মনোভাব একেবারে আলাদা ছিল।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু মহাশয় অবশ্য একপা এগিয়ে, তিনি ঠাকুর-স্বামীজির জীবন সম্পর্কে সমস্ত ভুলের মধ্যেও নির্ভুলকে খুঁজে বার করে চলেছেন। ওইটাই ওঁর শক্তি এবং সাধনা।

হুটকো হালদার দীর্ঘদিন ধরে অনেক খুঁটিনাটি ঠাকুর-সংবাদ সংগ্রহ করে যাচ্ছেন। তিনি বললেন, "ছোট সংসারের জয়গান গাইছেন হরিময়বাবু। রবি ঠাকুররা পনেরো ভাইবোন, কবি নিজে চতুর্দশ সন্তান। আমাদের স্বামী বিবেকানন্দও যে দশ ভাইবোনের এক ভাই তা অনেকের মনে থাকে না। বিশ্বনাথ দত্তর চার পুত্র ও ছয় কন্যা। স্বামীজির এক বোন আত্মহত্যা করে স্বামীজীকে খুব কষ্ট দিয়েছিলেন।"

হুটকো হালদারের সাহায্য পেলে ভবনাথবাবু কি লিখতে উৎসাহিত হবেন? "হে ঠাকুর দয়া করো।" চোখ বুজে প্রার্থনা করতে লাগলেন হরিময়বাবু।



হরিময়বাবু আপন মনে প্রার্থনা করছেন, ঠিক সেই সময় দরজায় মৃদু টোকা পড়লো। টায়ার সিং গাঁজা-টাঁজা খেয়ে টলমল অবস্থায় অফিসে উপস্থিত।

টায়ার সিং বললো, "উপরের বাবু আপনার খোঁজ করছেন।" খবরটা সে প্রায় সমাধিস্থ অবস্থায় হরিময়কে দিলো।

তার মানে মাঝরাত হয়েছে! এরপর সোজা দোতলায় উঠে এসেছেন হরিময়বাবু। গেরুয়ারঙের পাঞ্জাবি ও ধুতি পরে চায়ের ট্রে নিয়ে মধ্যরাতের আসর আলো করে বসে আছেন এই সম্পত্তির মালিক বংশগোলাপ বিশ্বাস। তাঁর মুখ একটু গম্ভীর।

বেশ কাতরভাবেই বংশগোলাপ বললেন, "এবাড়িতে এসে রোগটা জেঁকে বসছে, হরিময়বাবু। মধ্যরাত্রি হলেই আমার ঘুম পালাচ্ছে।"

হরিময় সান্ত্বনা দিলেন, "হতাশ হবেন না বংশগোলাপবাবু। রাতদুপুরে প্রত্যেক মানুষকে ঘুমোতেই হবে এমন কথা কোনও শাস্ত্রে লেখা নেই। এখানকার কত জুট মিলে এবং গেস্টকিনের কারখানায় নিত্য নাইট শিফট চলছে। দুটো পয়সার জন্যে মানুষ হাসিমুখে কাজ করছে।"

"জেগে কাজ করা আর শুয়ে জেগে থাকা এক জিনিস নয়, হরিময়বাবু।" কাতরভাবে নিবেদন করলেন বংশগোলাপ বিশ্বাস।

হরিময়বাবু বললেন, "আরে মশাই, জওহরলাল নেহরু পর্যন্ত বলে গিয়েছেন— ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট— মধ্যরাতে ছাড়া মানুষের জেনুইন স্বাধীনতা কখনও হয় না।"

বংশগোলাপবাবু এবার হরিময়ের সামনে কাপে গরম চা ঢেলে এগিয়ে দিলেন। কাপ দুটো যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।

বংশগোলাপ বললেন, "আজ স্টোর রুম থেকে উদ্ধার বিলিতিকাপগুলো করলাম— মনে হচ্ছে পূর্বপুরুষ বংশগোপালবাবু হাফ এ সেঞ্চুরি আগে এই কাপ ব্যবহার করতেন। কাপের বর্ডারে সোনালী জলে লেখা বি-বি।"

কাপ চিনতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না হরিময়বাবুর। বললেন, "এই অধম বহুবছর আগে এই কাপে এইখানে বসেই বহুবার চা খেয়েছে। যেখানে আপনি বসে আছেন, ঠিক সেখানে পরমশ্রদ্ধেয় বংশগোপালবাবু আসর আলো করে বসতেন। এইভাবেই চলেছে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত— হাফ এ সেঞ্চুরি কেটে গিয়েছে তারপরে।"

কথায় কথায় মনে পড়লো, ছেচল্লিশ সালের আগস্ট মাসের দাঙ্গার কথা। এইখানে রাত জেগে চা খেতে-খেতে বংশগোপালবাবু একদিন বললেন, "১৫ই এবং ১৬ই আগস্ট ইন্ডিয়ার পক্ষে মস্ত দিন হরিময়। অথচ তিনি যখন একথা বলছেন তখনও দেশের স্বাধীনতার কথাই ওঠেনি। শুধু আমি জানতাম শ্রীঅরবিন্দর পবিত্র জন্মদিন ১৫ই আগস্ট— কিন্তু তখনও তাঁর খ্যাতি অতো ছড়ায়নি— তিনি নিজেও বেঁচে আছেন পণ্ডিচেরিতে।"

বংশগোপালবাবু সব কথা শুনছেন অধীর আগ্রহে। "আর কিছু?" তিনি এবার হরিময়কে জিজ্ঞেস করলেন।

একটু দ্বিধা করে হরিময় বললেন, "আপনাদের পারিবারিক ট্রাজেডিটা। আপনার পূজনীয় পিতৃদেব, মানে বংশগোপালবাবুর নাতির ট্রাজেডিটা। ১৬ই আগস্ট ১৯৪৬ মুসলিম লিগের ডাইরেক্ট অ্যাকশন দিবসে কলকাতা থেকে শিবপুরের বাড়ি ফেরার পথে হাওড়া ময়দানের কাছে বাস থেকে নামিয়ে বংশবিজয় চৌধুরীর অসহায় নিরপরাধ শরীরটা উন্মত্তরা দ্বিখণ্ডিত

করলো।"

সেসব অনেক দিনের কথা। পুত্র বংশগোলাপ তখন দুগ্ধপোষ্য শিশু। কিন্তু সেসব কথা নিশ্চয় তিনি যথাসময়ে পিতামহ বংশবিনয়ের কাছে বিস্তারিতভাবে প্রবাসের মাটিতে শুনেছেন। সেসব ভয়ঙ্কর কথা এতোদিন পরে আবার শুনবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই বংশগোলাপের। কোন্ ছেলে অকালমৃত পিতার অপঘাত মৃত্যুর বর্ণনায় ফিরে যেতে চায়?

তবে হরিময়বাবুর স্পষ্ট মনে আছে আগস্টের সেই ভয়াবহ দিনটির কথা। দুঃসংবাদ পেয়ে পিতামহ বংশগোপাল বিশ্বাস বেশ কিছুক্ষণ পাথরের মতন বসেছিলেন উত্তরে দিকে মুখ করে। কিন্তু তার আগে তিনি দিকবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলেন। পুত্র বংশবিনয়কে কয়েকবার জিজ্ঞেস করলেন, বেলুড় মঠটা কোন দিকে রে? আমি ঠিক মনে করতে পারছি না।"

পুত্র বংশবিনয় বাবাকে উত্তর দিকটা দেখিয়ে দিলেন। হরিময়বাবু নিজেও শিবপুর শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন। স্বয়ং বংশবিনয়বাবুও যথাসময়ে এলেন শিবপুর ঘাটে অপঘাতে মৃত পুত্রের মুখাগ্নি করতে। শোকের সে-দৃশ্য চোখে দেখা যায় না।

তার কিছুদিন পরেই অকালবিধবা যুবতী পুত্রবধূ এবং নাতি বংশগোলাপকে কোলে নিয়ে বংশবিনয় বিশ্বাস বেনারাস চলে গেলেন। পিতৃদেব বংশগোপালকেও সঙ্গে যেতে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু শোকার্ত হলেও বংশগোপাল কিছুতেই রাজি হলেন না। বললেন, "আমাকে থাকতে হবে, থাকতেই হবে। দয়া করে এখানে থাকতে দাও আমাকে। তোমাকেও একদিন আবার ফিরে আসতে হবে বিনু, না-এসে তোমার যে উপায় নেই বাছা।" পুত্রের অকালমৃত্যুর দিনে মুরগিহাটায় বংশবিনয়ের কাগজের দোকানও লুটপাট হয়েছিল। বংশবিনয় করুণভাবে পিতৃদেব বংশগোপালকে বলেছিলেন, "আমাদের কী হবে বাবা? আমাদের যে কিছু রইলো না? কী অপরাধ করেছি আমরা ভগবানের কাছে?"

বংশগোপাল দাড়িতে হাত দিয়ে পাথরের মতো দাঁড়িয়েছিলেন। প্রথমে তিনি চোখ বন্ধ করে কাউকে স্মরণ করবার চেষ্টা করলেন, তারপর ঠকঠক

করে কাঁপতে লাগলেন। অবশেষে হঠাৎ বললেন, " হবে হবে। বংশগোপাল যা করে তা ভুল করে না। সে যা চেয়েছে তা সে পাবেই। এই বিশ্বাসবংশ একদিন মস্ত বড়লোকের বংশ হবে, বিনু।"

এতো বছর পরে হরিময়বাবুর দিকে তাকিয়ে বংশগোলাপ বললেন, "দাদুর মুখে বেনারাসে বসেও আমি একই কথা শুনেছি। অথচ, আমরা তো ধনী নই। আমার পূর্বপুরুষ, বিশেষ করে প্রপিতামহ বংশগোপাল কেন বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখতেন? কেন বংশগোপাল একথা বললেন, বিশ্বাসবংশ মস্ত বড়লোকের বংশ হবে? কোথাও একটা গভীর রহস্য থেকে যাচ্ছে।"

মধ্যরাতের আসরে হরিময়বাবু ব্যাপারটা হালকা করবার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন "রাইটার ভবনাথ সেন, এই সেদিন আমাকে বললেন, ধনী অনেক রকমের— তবে এমন ধনে ধনী হওয়া যায় যখন মণিকে মানবার কোনো প্রয়োজন হয় না। অর্থ নয়, সেটা হলো পরমার্থর অনুসন্ধান!"

রাত আরও বাড়ছে। হরিময়বাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে বংশগোলাপ বিশ্বাস কাপে আরও চা ঢাললেন আমেরিকান মিলিটারি ফ্লাস্ক থেকে। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, " একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করলাম। বংশগোপাল বিশ্বাস মাঝে-মাঝে দিনলিপি রাখতেন। তারই একটা অংশ আজ উদ্ধার করেছি— তবে ভেরি ব্যাড লাক। স্টোর রুমের ওইধারে দেওয়ালে কিছুটা উই ধরে আছে— সেই উই দেওয়াল কাঠের আলমারি ফুটো করে বেশ কিছু কাগজপত্র শেষ করে দিয়েছে। ওই আলমারির মধ্যে ছোট একটা অ্যালুমিনিয়াম সুটকেস রয়েছে। সেখানে ঢোকবার চেষ্টা করে উইদের অবশ্য সাফল্য আসেনি।"

" বলেন কি?" হরিময়বাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। "আপনি তো মশাই এখানকার রাখালদাস ব্যানার্জি হয়ে উঠবেন— হরাপ্পা মহেঞ্জোদড়োর না হোক আমাদের নিজস্ব হাওড়া সম্বন্ধে ঐতিহাসিক উপাদান পুনরুদ্ধার করে ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন। আমি আপনাকে বলছি, স্যার মর্টিমার হুইলার যাই লিখুন, আমাদের এই হাওড়া হরপ্পা থেকে কিছু কম যায় না।

হাবভাব দেখে মনে হয় হরপ্পা থেকেও পুরনো কোনো সভ্যতা এখানে মাটির তলায় ঘুমিয়ে আছে। সাধে কি স্বামী বিবেকানন্দ এই হাওড়াতে রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের হেডকোয়ার্টার স্থাপন করলেন। মহাপুরুষ মাহাত্ম্যের সঙ্গে স্থানমাহাত্ম্যকেও তিনি অশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন।"

বংশগোলাপ বিশ্বাস সোজসুজি উত্তর দিলেন, "লজ্জা দেবেন না হরিময়বাবু। রাখালদাস ব্যানার্জি উদ্ধার করেছিলেন হরাপ্পা সভ্যতা অ্যাট মহেঞ্জোদাড়ো, আর নাম হয়েছিল মার্শাল সাহেবের। শুনেছি শেষ পর্যন্ত রাখালদাসের চাকরি নিয়েও টান পড়েছিল তুচ্ছ চুরির অভিযোগে। হাওড়া শহরের বা জেলার ইতিহাস আমি তো সন্ধান করছি না, আমি স্রেফ নিজের বংশের পুরনো বাক্স ঘাঁটছি— বড়জোর বংশগোলাপ নামটা পাল্টে আমাকে বলতে পারবেন বংশপেটিকা!"

হরিময়বাবু ফিক করে হাসলেন। "জেলার ইতিহাস, শহরের ইতিহাস মানে তো ইটকাঠ ইমারতের ইতিহাস নয়, সেখানকার বসবাসকারী কতকগুলো বিশিষ্ট মানুষের ইতিহাস। হয়তো একদিন দেখবেন, ঠাকুরের আশীর্বাদে আপনাদের বংশের ইতিহাসটাই হাওড়ার ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

বংশগোলাপ বলে উঠলেন, "হাওড়া শহর, বিশ্বাস পরিবার এসব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এটা ভাল কথা, কিন্তু এর মধ্যে আবার ঠাকুরের দয়ার কথা টেনে আনছেন কেন, হরিময়বাবু।"

হরিময়বাবু কথাটা কথার কথা হিসেবে প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু এখন আন্দাজ করছেন, জিনিসটা বংশগোলাপের পছন্দ হয়নি, তিনি একটু অস্বস্তি বোধ করছেন। ব্যাপারটা হাল্কা করবার জন্যে হরিময়বাবু বললেন, চমচম পত্রিকার "রামকৃষ্ণ সংখ্যার কথা ভাবছি তো, তাই অজান্তেই ঠাকুরের অনন্ত দয়ার কথা মাঝে মাঝে মুখে এসে যায়, বংশগোলাপবাবু।"

অদ্ভুত এক হাসিতে বংশগোলাপের মুখ ভরে উঠলো। "আপনার কী মনে হয়, তিনি শুধু দয়াই করতেন? ওই দয়া পেয়ে কারও কারও কী শোচনীয় অবস্থা হয়েছে তারও একটা হিসেব প্রয়োজন, হরিময়বাবু।"

হঠাৎ বংশগোলাপ বললেন, "ইন এনি কেস, এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার মতন শক্তি এবং সময় আমার নেই। আপনি বলবেন, আমার হাতে সময় তো অনেক আছে। আমি আপনাকে সোজা বলছি, সময় যতটুকু আছে তার সবটুকু আমি বিশ্বাসবংশের জন্য নিয়োগ করতে চাই। ভেরি ইন্টারেস্টিং পরিবার এই বংশবিশ্বাস ফ্যামিলি।

হরিময় বললেন, "এটাও কম কথা নয়, বংশগোলাপবাবু। আজকাল ছেলেমেয়েরা পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে কোনো আগ্রহ দেখায় না। অনেকসময় দাদামশায়ের নাম পর্যন্ত বলতে পারে না, অতীত সম্বন্ধে কোনও ইন্টারেস্ট নেই। তর্পণের সময় যে সাতপুরুষের নাম লাগে তা খুব ধনী পরিবার এবং সুবর্ণবণিক পরিবার ছাড়া অনেকেই মনে রাখে না।"

"আমরা সুবর্ণবণিক নই, কিন্তু সাতপুরুষের নাম করে তাঁদের মুখে সোজাসুজি জল দিতে পারি। শুনুন, আমার দাদু বংশবিনয় প্রতিবছর আমাকে মুখস্থ করিয়েছেন বেনারসেঃ

(১) বংশবিস্ময় বিশ্বাস

(২) বংশধর বিশ্বাস

(৩) বংশগীত বিশ্বাস

(৪) বংশগোপাল বিশ্বাস

(৫) তাঁর দুই ছেলে— বংশমহিমা এবং বংশবিনয় বিশ্বাস

(৬) বংশবিজয় বিশ্বাস

(৭) তারপর আমি বংশোগোলাপ

এবং লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, আমার একমাত্র সন্তান বিশ্বাস পরিবারের শিবরাত্রের সলতে (৮) বংশেগৌরব বিশ্বাস।"

চোখ বড়বড় হয়ে উঠছে হরিময়বাবুর। বংশ শব্দটিকে যে একটি পরিবারে এইভাবে বিস্তার করা যায় তা তাঁর সামান্য বাংলা জ্ঞানে জানা ছিল না।

হাসলেন বংশগোলাপবাবু— "সে-ব্যবস্থা আমার প্রপিতামহ বংশগোপাল অনেক আগেই করে গিয়েছেন। সাত নয় ষাট প্রজন্মের যাতে

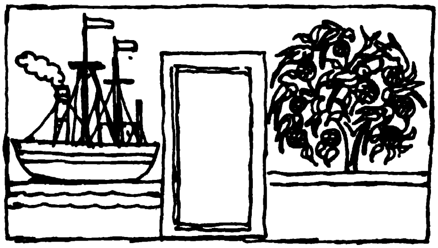
নামের অভাব না হয় তার আগাম ব্যবস্থা করে গিয়েছেন পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, অভিধান ইত্যাদি দেখে। বংশগোপালের ডায়রিটা আপনাকে দেখাবো — ষাটটা সুন্দর সুন্দর নাম সংগ্রহ করে গিয়েছেন যার আদিতে 'বংশ'— যেমন বংশবিকাশ, বংশতনু, বংশবিচক্ষণ, বংশবিত্ত, বংশকিরণ, বংশভানু, বংশধীমান এটসেটরা, এটসেটরা। ষাটটা নাম মানে পঁচিশ বছরের গ্যাপে দেড় হাজার বছর পর্যন্ত চলে যাবে এই বিশ্বাস পরিবারের, যদি না এই পরিবারে অশুভ কিছু ঘটে যায়।"

কৌতূহলী হরিময়বাবু স্থির করলেন নামগুলো পরের পর খাতায় লিখে রাখবেন। এবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "মেয়ে হলে কীরকম নাম হবে? বংশলতিকা এবং বংশবিচিত্রা ছাড়া তো আমি তো অন্য কিছু ভাবতে পারছি না।"

"দূর মশাই, সেগুড়ে বালি। বংশগোপালবাবুর এক বড় বোন ছিল, তারপর এবংশে মেয়েই জন্মায় না। বংশগোপালের বড় বোন শ্বশুরবাড়িতে মনোকষ্টে আত্মহত্যা করেছিলেন। বংশগোপালবাবু তাঁর দিনলিপিতে লিখেছেন : দুঃখ আমার একার নহে, দুঃখ বিশ্বসংসারের। নরেন্দ্রনাথ আমার শোক সংবাদ পাইয়া লিখিয়াছে, একই আঘাত আমার কপালেও জুটিয়াছে। আমার অতি স্নেহের ভগ্নীও অজ্ঞাত দুঃখে আত্মহত্যা করিয়া তাহার সমস্ত দুঃখযন্ত্রণার অবসান ঘটাইয়াছে। লোকে আমার নিন্দা করিয়াছে, আমার পক্ষে এখন শোক নাকি বিধিবহির্ভূত। কিন্তু বিচিত্র এই মনুষ্যসমাজ!"

নরেন্দ্রনাথ! নরেন নামটা যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে, কিন্তু বংশগোপালকে জিজ্ঞেস করা গেলো না। কবে এই বংশে কে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছে তার স্মৃতি এতোদিন পরেও তাঁকে বিমর্ষ করে তুলছে।

ভদ্রলোক বললেন, "ওপরের কর্তাদের মর্জি বুঝে ওঠা ভার! কারও বংশবিস্তার, আবার কারও বংশলোপ। মশাই, এক এক সময় মনে হয়, যাদের পারিবারিক ইতিহাস নেই তারা আমার মতন অভাগার থেকে অনেক ভাল আছে।"



লজ্জার মাথা খেয়ে হরিময়বাবু অত রাত্রে ভবনাথ সেনকে ফোন করলেন।

"হ্যালো সেদিন আপনি স্বামীজির বোনের আত্মহত্যার কথা বলছিলেন। কী নাম যেন বললেন?" ভবনাথ উত্তর দিলেন, "শুনুন দশ ভাই-বোনের নাম। প্রথম পুত্র (শৈশবে মৃত), দ্বিতীয় কন্যাও শৈশবে মৃত, তৃতীয় হারামণি (২২ বছর বেঁচেছিলেন), চতুর্থ স্বর্ণময়ী (৭২ বছর বেঁচেছিলেন), পঞ্চম কন্যা (শৈশবে মৃত), ষষ্ঠ নরেন্দ্রনাথ (৩৯ বছর বেঁচেছিলেন), সপ্তম কিরণবালা (১৯ বছর বেঁচেছিলেন), অষ্টম যোগীন্দ্রবালা (২২ বছর বেঁচেছিলেন), নবম মহেন্দ্রনাথ (৮৭ বছর বেঁচেছিলেন) এবং দশম ভূপেন্দ্রনাথ (৮১ বছর)।"

নামগুলো শুনে নিয়ে, ফোন নামিয়ে রেখে হরিময়বাবু বলে উঠলেন, "জ্যাকপট! বোনের নামটা মিলে যাচ্ছে। তার মানে এই নরেন্দ্রনাথই হচ্ছেন বেলুড়ের স্বামী বিবেকানন্দ। তার মানে বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দর কিছু অপ্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত চিঠি এই বিশ্বাস পরিবারে এখনও থাকতে পারে।"

"এত রাত্রে কেন মানুষকে ফোন করলেন?" একটু অবাক হয়ে গেলেন বংশগোলাপ।

''আর্জেন্ট ম্যাটার। আমার অথর, যাঁকে দিয়ে স্পেশাল একটা ধারাবাহিকের জন্যে উঠেপড়ে লেগেছি, মিস্টার বিশওয়াস। কিন্তু মুশকিল হল কি, সৃষ্টিধর্মী লেখক, কিছুতেই পুরনো ঘটনার চর্বিতচর্বণ করবেন না। কিন্তু বংশোগোলাপবাবু, যেসব বিখ্যাত লোক বহুযুগ আগে টেঁসে গিয়েছেন তাঁদের সম্বন্ধে নিত্যনতুন ঘটনা আমরা কোথায় খুঁজে পাবো?''

''দয়া করে টেঁসে যাওয়া, পটল তোলা, এসব শব্দ যখন-তখন ব্যবহার করবেন না। বড় মানুষদের 'মহাপ্রয়াণ' হয়, তাঁরা ইহলীলাসংবরণ করেন, অন্তত পক্ষে তাঁরা 'পরলোক' গমন করেন,'' সাবধান করে দিলেন বংশগোলাপবাবু।

সেই রাত্রে আর কথাবার্তা তেমন হয়নি। বংশগোলাপের হঠাৎ মনে হলো তাঁর ঘুম আসতে পারে। ঘুমকে ডেকে নিয়ে আসার সহজতম উপায় মুখ বুজে এবং চোখ বুজে শুয়ে থাকা। তবে হিদারাম হালদার লেনের বিশ্বাস পরিবারের ইতিহাস উদ্ধারের জন্যে বংশগোলাপ যে এতোদিন পরে সত্যই উৎসাহী হয়ে উঠেছেন তা হরিময়বাবুর বুঝতে দেরি হলো না।

পরের রাতেও হরিময়বাবুর ঘুমে বাধা পড়লো। ডাক এলো দোতলা থেকে। হাজার হোক এই সম্পত্তির মালিক এবং চমচমের আদি স্থপতিদের অন্যতম এই বংশবিশ্বাস পরিবার। সুতরাং না গিয়ে উপায় নেই।

বংশগোলাপ আজও একটা গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি এবং ধুতি পরে আরাম কেদারায় আধশোয়া হয়ে রয়েছেন।

''গত রাত্রে ঘুম হয়েছিল?'' জিজ্ঞেস করলেন হরিময়।

''কোথায় ঘুম? বেনারসে তবু মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোর আসতো, হিদারাম হালদার লেনের এ-বাড়িতে ঢোকা পর্যন্ত যত ঘুম দিনদুপুরে। বলতে পারেন, কোনো এক অভিশাপে রাত্রি আমাদের দিন। এটা বংশের ধারা। আমার দাদু বংশবিনয় বিশ্বাস, তিনি আমাকে বেনারসে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন আমার বাবা বংশবিজয় খুন হয়ে যাবার পরে। তিনিও রাত্রে

ঘুমোতে পারতেন না, বলতেন আমি নিশাচর। অথচ আমার প্রপিতামহ বংশগোপাল একজায়গায় লিখে গিয়েছেন, একসময় তিনি ছিলেন ভীষণ ঘুমকাতুরে — কোথা দিয়ে রাত কেটে যেতো তা বুঝতেই পারতেন না। তারপর কোনো এক সময় কিছু একটা অঘটন ঘটে যায়, যার সম্বন্ধে আমরা তেমন কিছু জানি না। তখন থেকে রাতদুপুরে বংশগোপাল বিশ্বাসের ঘুম ছুটে যেতো। ফলে আকাশ-পাতাল ভাবতে বসতেন তিনি। রাতদুপুরে লোককে হাতের গোড়ায় পাবেন কী করে? ফলে অনেককে তিনি চিঠি লিখতেন, চিরকুট পাঠাতেন অথবা ডায়রিতে নিজের মনোভাব লিপিবদ্ধ করে রাখতেন।

একটু থামলেন বংশগোলাপ। তারপর বললেন, "তবু বংশগোপাল বিশ্বাস সম্বন্ধে কোনো সমালোচনা আমাদের মুখে মানায় না, হরিময়বাবু। যেখানে যতটুকু বিষয়-আশয় দেখছেন সবই তাঁর সৃষ্টি। তার আগে বংশবিশ্বাসদের কিছুই তেমন ছিল না। বংশগোপাল নিজের চেষ্টায়, নিজের সাধনায় এইসব সম্পত্তি করেছিলেন। আমরা ঠিকমতন দেখাশোনাও করতে পারিনি। আর আমিও দেখুন না, কত যুগ পরে প্রবাস থেকে এখানে ফিরে এলাম। আমি তো জানতামই না, প্রপিতামহের স্মৃতিজড়ানো এতো কাগজপত্র, দলিলদস্তাবেজ এই শিবপুর মন্দিরতলার বাড়িতে জমা হয়ে আছে।"

বংশগোলাপ ক্ষতিপূরণ দিচ্ছেন দিনরাত পিতৃকুলের হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস অনুসন্ধান করে।

আজ তিনি হরিময়বাবুকে বললেন, "যত জানছি তত ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠছে। বংশগোপাল মানুষটিকে চেনা ক্রমশই একটু কষ্টকর হয়ে উঠছে। যতদূর শুনেছিলাম, কলকাতায় ছাত্রজীবন অতিবাহিত করে প্রপিতামহ প্রথমে বার্মায় পাড়ি দেন। সেখানে কোনও বিজনেসে দ্রুত বেশ কিছু অর্থ উপার্জন করে, আবার অজ্ঞাত কোন কারণেই তিনি হঠাৎ হাওড়ায় ফিরে আসেন এবং শিবপুরে সাড়ে-চার বিঘের সম্পত্তি কিনে নিজের নকশায় আমাদের এই বাড়ি তৈরি করেন। ধনী হবার খুব ইচ্ছে

ছিল বংশগোপালের, এটা সহজেই আন্দাজ করা যায়। কারণ প্রায়ই চিঠির শেষে লিখতেন, মা আমাকে বড়লোক করো। বড়লোক না হলে এ কোনো পৃথিবীতে সুখ নেই মা। দিনলিপিতেও ধনবান হবার প্রার্থনা রয়েছে বেশ কয়েকবার।"

বংশগোলাপ বিশ্বাসের বিশেষ অনুরোধে হরিময়বাবু এবার চোখ বুজে বিশ্বাস বংশের স্মৃতিচারণ করলেন। বললেন, "সত্যি ইন্টারেস্টিং ক্যারাকটার আপনার প্রপিতামহ এবং আমাদের প্রতিষ্ঠাতা বংশগোপাল বিশ্বাস। আমি তো কম বয়সে তাঁর শেষ বয়েস দেখেছি। সব কথা আমাকে বলতেনও না, ওঁর সব কথা আমি বুঝতামও না। বিশেষ করে সুদূর অতীতের কথা। তবে বংশগোপালবাবু প্রতিনিয়ত ধনী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতেন। বংশগোপাল বলতেন, "ধনবান বংশের কথাই আলাদা, হরিময়। এই যে ইস্পাহানি, রাজেন মুখুজ্যে, বিড়লা এবং জালানের এতো সামাজিক প্রতিপত্তি, তার কারণ বংশপরম্পরায় এঁদের হাতে প্রচুর অর্থ এসেছে এবং সেই সম্পদ সঞ্চিত হয়েছে। গেরস্থ বাঙালির মুশকিল হলো ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কিছুটা বেঁকে বসলেন, অর্থকেই অনর্থের কারণ বলে চিহ্নিত করলেন। ভোগের পথ সম্পূর্ণ এড়িয়ে তিনি জাতটাকে ত্যাগের পথে সরে যেতে বললেন।"

"যখন বংশগোপাল এইসব কথা আমাকে বলতেন, তখন তাঁর হতের গোড়ায় থাকতো সবুজ মলাটের একখণ্ড শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।" হরিময়বাবু তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে একখণ্ড কথামৃত সেই বয়সে পড়েছিলেন। বইটা তখন তেমন টানেনি, ভালও লাগেনি। তবে বুঝেছিলেন, ঠাকুর বলছেন, সাধনার পথে মস্ত বাধা হলো অর্থ।"

"বংশগোপাল বেশি তর্কে যেতেন না। একবার বললেন, সংসারী লোকদের পয়সাকে অসম্মান করতে বলেছেন ঠাকুর একথা আমি বিশ্বাস করি না। মাস্টারমশায় মহেন্দ্রনাথ গুপ্তর লেখা খুঁটিয়ে দেখতে হবে। আপনি বলছেন, মাস্টার বানিয়ে লিখে থাকতে পারে?"

"বংশগোপালবাবু সেবার কিন্তু রহস্যময়ভাবে হেসেছিলেন। অনেক

লোক আছে মিথ্যাচার যাদের শরীরে নেই, স্বভাবে নেই। মাস্টারমশাই সেইরকম লোক।"

পাবলিশিং লাইনে তিনিও গিয়েছেন এবং পরম ভক্ত বসুমতীর উপেন মুখোপাধ্যায়ও গিয়েছেন। কিন্তু মাস্টারমশায় প্রকাশনা থেকে অর্থ চাননি। যা উপার্জন করেছেন সব বিলিয়ে দিয়েছেন। আর উপেন মুখার্জি তো চেয়েছিলেন তিনি ধনপতি হবেন।"

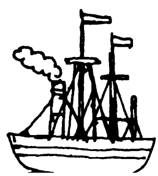
রাত দুপুরে দোতলার বারান্দায় বসে বিশ্বাস পরিবারের চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে হরিময়বাবু একসময় বংশগোলাপকে বললেন, "আপনার প্রপিতামহর সঙ্গে কথা বলার সময় আমার বিদ্যে অত্যন্ত লিমিটেড ছিল। শঙ্করীপ্রসাদ বোসকেও তখন চিনতাম না। চিনলেও কী হতো, তখন তো তিনি বালক মাত্র। এখন ভবনাথ সেন, শঙ্করীবাবু, প্রভাবনন্দ পূর্ণাত্মানন্দ এটসেটরার পাল্লায় পড়ে এবং হুটকো হালদার মশায়ের গালগল্প শুনে শুনে একস্ট্রা অনেক কিছু কথা জেনেছি। মাস্টারমশায় যখন ঠাকুরের কথা শুনেছেন তখনই বক্তব্য নোট করেননি। বাড়ি ফিরে এসে সাঙ্কেতিক ভাষায় ডায়েরিতে পয়েন্ট নোট করেছেন। যখন নোট করেছেন তখনও বিস্তারিত বিবরণ লেখেননি। নোট দেখে চোখ বুজে সব 'রিক্রিয়েট' বা পুনর্গঠন করে ভক্তের পাতে গরম গরম পরিবেশন করতে প্রায় হাফ-এ সেঞ্চুরি লেগে গিয়েছে। ঠাকুর দেহত্যাগ করলেন ১৮৮৬ সালে, আর কথামৃতর শেষ পর্ব প্রকাশিত হলো ১৯৩২ সালে।"

বংশগোলাপবাবু উদাসভাবে বললেন, "ওইসব ভক্তির হাঙ্গামায় আমি জড়িয়ে পড়তে চাই না, হরিময়বাবু। কেউ ইচ্ছা করলেই তার অভিশাপ নেমে আসতে পারে একটা বংশের ওপর এসব বিশ্বাস করতে কষ্ট লাগে। আমি একই সঙ্গে কার্ল মার্কস, এঙ্গেলস এবং কাকাবাবুর লেখা পড়তে চেষ্টা করছি। কাকাবাবু জানেন তো? মুজফ্ফর আহমেদ। তবু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চান্স পেলেই আমার মাথাটা মাঝে মাঝে ঘুরিয়ে দেন। আমার দাদু বংশবিনয় বলতেন, বংশগোপাল নাকি গোপনে তাঁকে বেলুড়ে যেতে নিষেধ করেছিলেন। ফলে এত কাছে বসবাস করেও বেলুড় মঠে যাননি

তিনি কোনওদিন। তারপর একমাত্র সন্তানের অকাল মৃত্যুর পরে বংশবিনয় আমাকে কোলে নিয়ে হাজির হলেন বেনারসে।''

মধ্যরাতে ঘড়ির কাঁটাও বোধহয় একটু ঝিমিয়ে পড়ে। কারণ হরিময়বাবু দেখলেন এতো কথার পরেও এখন মাত্র রাত দেড়টা।

সায়েবরা এই দুপুররাতকে কী করে মর্নিং বলেন তা তাঁরাই জানেন। ওঁদের 'হৃস্যিদীর্ঘ্যি' জ্ঞান আছে বলে মনে হয় না।



বংশগোলাপ এবার বোমা ফাটালেন। ''দাদুর বাবার একটা দীর্ঘ লেখা গত রাতে উদ্ধার হয়েছে হরিময়বাবু। বংশগোপাল বিশ্বাসের দিনলিপি।''

এবার হরিময়ের অনুরোধে আস্তে আস্তে সেই দিনলিপির অংশবিশেষ পড়তে লাগলেন বংশগোলাপ :

''রাত্রে আমার ঘুম আসে না। কেন আসবে? সেই রবিবারে যে অন্যায় করেছি তার কোনও ক্ষমা নেই।

সেদিন মধ্যরাতের সমস্ত ঘুম আমি শ্রাবণের সেই রাতেই চিরতরে ব্যয় করে ফেলেছি সেদিন। সকাল থেকেই ব্যাপারটা বোঝা উচিত ছিল আমার — রোগাক্রান্ত শরীরে তিনি তো আগেও বিদায়ের যথেষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন।

গতরাতেও অন্য সবার সঙ্গে আমিও ওখানে রাত্রিযাপন করেছি। আমি

সাধারণ একজন দর্শক, আমি তো তাঁর লীলাপার্ষদ হবার যোগ্যতা অর্জন করিনি, হতেও চাইনি। আমি তো বলেছি, আমি উপীন মুখার্জির মতনই স্রেফ ধনী হতে চাই। কিছু অর্থ দাও, প্রাচুর্য এলেই আমি নিজেই অন্য সব সমস্যার সমাধান করে নেবো। সকলকেই নরেনের মতো বোকা হতে হবে কেন? নরেনও তো চাইবার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু সে অর্থ চাইতে পারলো না। উপীন ও আমি। আমাদের লক্ষ্য পরিষ্কার। সেদিন রবিবার। সাতসকালে তিনি যোগীনকে পাঁজি পড়তে বললেন। এই সেই যোগীন রায় চৌধুরী যে তাঁকে প্রথম দর্শনে কালীবাড়ির মালি মনে করেছিল। এই সেই যোগীন যে বিয়ে করে ভয়ে ভয়ে তাঁর কাছে এসে তিনি অভয় দিয়েছিলেন, 'এখানকার কৃপা থাকিয়ে লাখটা বিবাহ করিলেও কোনও ক্ষতি হইবে না।' এই সেই যোগীন যাকে তিনি বকুনি দিয়েছিলেন, 'ভক্ত হবি, তাহলে বোকা হবি?' এই সেই যোগীন যাকে তিনি বললেন, 'সাধুকে দিনে দেখতি, রাত্রে দেখবি, তবে বিশ্বাস করবি।' পাঁজি দেখা হলো। যথাসময়ে বাগবাজারের রাখাল মুখুজ্যে মশাই এসে সাহেবী কায়দায় তাঁকে মুরগির জুস খাবার জন্যে চাপ দিতে লাগলেন। তিনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি। একটু ভেবে বললেন, "খেতে আপত্তি নেই, তবে লোকাচার।" মুরগির জুস খেলেন না তিনি, কাল দেখা যাবে বলে তখনকার অবস্থা সামাল দিলেন।

সকালে আরও অশুভ ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু কর্তাব্যক্তিরা কিছু বুঝতে চাইলেন না। মা যে খিচুড়ি তৈরি করছিলেন তা উনুনে আরও ধরে গেলো। সেই সঙ্গে অশুভ ইঙ্গিত — একটা মাটির কুঁজো হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেলো। আমার পিতৃদেব বংশগীত বিশ্বাস ইহলোক ত্যাগের সময় একটা বড় ছবি দেওয়াল থেকে ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে ভেঙে পড়েছিল। আজ একটা কালো বেড়ালও উদ্যানবাটিতে বেশ বিরক্ত করছে।

রবিবার আমাদের চোখের সামনে কত কি ঘটলো। মূর্খ আমি, তবু আমার চোখ খুললো না। ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাতে কাতর হয়ে একবার তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। অনেক ছোটাছুটির পরে ডাক্তার এলেন। যন্ত্রণায় কাতর তিনি ডাক্তারকে বললেন, "বড় কষ্ট হচ্ছে, শরীর জ্বলছে।"

"রোগ সারবে?" তাঁর সোজাসুজি প্রশ্নের উত্তরে ডাক্তার অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে আছেন দেখে তিনি এক প্রিয় ভক্তকে বললেন, "বলে কি গো? এতদিন পরে বলে কিনা সারবে না।"

আমি সামান্য একজন কৌতূহলী দর্শক, এখানে আমাকে তেমন কেউ চেনে না, আমাকে কোনো গুরুত্ব দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। ভিড়ের মধ্যে থেকে প্রয়োজনে একটু আধটু ফাইফরমাস খাটি। মনে আছে, তিনি হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, "মরি তাতে ভয় নাই, কিসে প্রাণবায়ু বার হয় বলতে পার?"

"সন্ধ্যার আগে তাঁর একটু খিদে হলো। আমার খুব ভাল লাগলো। ওঁকে আমি, ভীষণ ভালবাসতে শুরু করেছি। সেই সময় নিকট ভক্তরা তাঁকে সুজির পায়েস দিল। কিন্তু খেতে পারলেন না। তারপর সেই অবিস্মরণীয় কথা : "দেখ, আমার হাঁড়ি হাঁড়ি ডাল-ভাত খেতে ইচ্ছে। কিন্তু মহামায়া কিছুই খেতে দিচ্ছেন না।"

রাত্রি সাড়ে-আটটা নাগাদ মূর্খের মতন আমার মনে হলো, তিনি শান্ত হয়ে বিশ্রাম করবেন। রোগের প্রকোপ একটু কমের দিকে, আমার কমবয়সী চোখে তখন দুনিয়ার ঘুম জড়ো হয়েছে।

সেরাত্রে চেনা-অচেনা নীচের তলায় উদ্যানবাটির বহু মানুষের আনাগোনা। তাঁদের অনেকেই আমাকে চেনেন না। যাঁরা মুখ চেনেন তাঁদের ধারণা, হাতের গোড়ায় একটা কমবয়সী ছোকরা থাকলে রাতদুপুরে ছোটাছুটির সুবিধে হবে।

আমারও পেটে কিছু পড়েনি। টুক করে একবার বাইরে গিয়ে চারখানা গরম কচুরি খেয়ে এলাম। কচুরিতে যে প্রচণ্ড ক্ষুধানিবৃত্তি হয় তা এই বংশগোপাল ভালভাবেই জানে। তারপর সারা শরীর জুড়ে ঘুম এলো, গভীর ঘুম। ঘুম আমার কোনও কথা শুনলো না।

ওদিকে দোতলায় তখন মহালীলা চলেছে। পিঠে বালিসের ঠেসান দিয়ে তাঁকে বসানো হয়েছে। কেউ তালপাখা দিয়ে হাওয়া করছে। কেউ পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কেউ তুলো ভিজিয়ে মুখে জল দিচ্ছে। তখনও তাঁর প্রচণ্ড ক্ষুধা। অন্নের সামান্য মণ্ড খেয়েছেন তিনি সহজে। খেয়ে বলেছেন,

"আঃ শান্তি হলো! এখন আমার কোনও রোগ নাই।"

শেষ পর্বে তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্যকে ডেকে বলেন, "এসব ছেলেদের তুই দেখিস।"

তারপর সেই পুরনো 'ওঁ' উচ্চারণ করতে করতে মহাসমাধি হলো। আর এক প্রিয় শিষ্য ঘড়ির দিকে নজর রাখেন — দেখেছেন, সময় রাত্রি ১টা ২ মিনিট।

তখনও আমি গভীর ঘুমে অচেতন। রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় পরে মহাসমাধির সময় লিখেছেন, "তখন সময় ১টা ৬ মিনিট।" কিন্তু তিনি তো সেসময় ওখানে ছিলেন না, যতদূর শুনেছি, তিনি পরে এসেছেন।

আমার ঘুম অবশেষে ভেঙেছিল। অন্য অনেকের সঙ্গে আমিও চোখের জল ফেলতে ফেলতে ছোটাছুটি শুরু করেছি। খবর পেয়ে তখন অনেকেই আসছেন বাইরে থেকে সেই চন্দ্রালোকিত রাতে। কাছাকাছি কোথাও বোধ হয় কাঙালি বিদায় হচ্ছিল — রাস্তায় লোকজনের অভাব ছিল না।

আমি তারপর আফসোস করেছি কতদিন। এত কাছে থেকেও, শেষ সময়টা দেখার ভাগ্য হলো না — কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী!

কেন এমন হলো? কেন বিদায়ক্ষণে তিনি আমাকে দৃষ্টির আড়ালে ঠেলে দিলেন। আমি তো চিরকালই লেট — দেরিটা বোধহয় আমার গ্রহের ফের। সাধে নরেন্দ্র রসিকতা করতো — লেট ললিত বলে। আমার ডাক নাম ললিত — লেট লতিফের ছোটভাই হওয়াটা আমার পক্ষে বেশ সহজ।

কিন্তু সেই অবিস্মরণীয় রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ার মূল্য কি আমাকে সারা জীবন ধরে দিয়ে যেতে হবে?

শ্রাবণের শেষ দিনে সেই রবিবারের মাঝরাতে সেই যে আমার ঘুম চটে গেলো, সে তো আর ঐ সময় কিছুতেই আসে না।

ঘুম চলে যায় হিসেব করেই, আমি প্রথম রাত ঘুমের প্রথম পর্ব শেষ করে, মধ্যরাতে জেগে থাকি, কেবল জেগে থাকি। অথচ আমি কোনো লীলায় বিশ্বাস করি না।

আমি সংসারী মানুষ। আমি সংসারের ছোটখাট সুখদুঃখ থেকে নিজেকে অযথা দূরে রাখতে চাই না। আমি তো বারবার বলেছি, উপেন মুখুজ্যের মতন আমিও ধনী হতে চাই। আমি চাই আমার বংশধররা দুধে ভাতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকুক। তাদের যেন কখনও অর্থের অভাব না হয়।

অর্থ মোটেই খারাপ জিনিস নয়। অর্থকে অযথা ভয় করলে এই সংসার তছনছ হয়ে যাবে। তোমরা দেখো, অর্থ ছাড়া এই পৃথিবীর কোনো মূল্য নেই। সাধে কি আর মহাপুরুষরা অর্থকে পেট্রল অফ লাইফ বলেছেন। পেট্রল ছাড়া গাড়ি চলে না এ সংসারে। এর মধ্যে তো কোনো গ্লানি, কোনো লজ্জা থাকার কথা নয়।

বংশগোপালের নিজের হাতে লেখা দিনলিপি কোনো ডায়েরিতে সংরক্ষিত নয়। একটা প্যাডে রুলটানা কাগজে খেয়ালখুশিমতো তিনি নিজের ভাবনাচিন্তা চাইনিজ ব্ল্যাক ইংকে লিপিবদ্ধ করেছেন বহুবছর আগে।

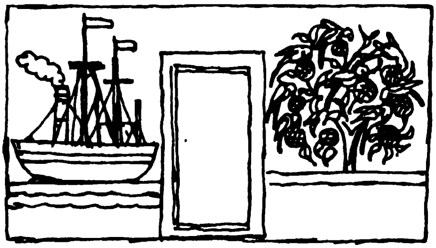
কালের খেয়ালে কালো আর কালো থাকে না, ঈষৎ ধূসর হয়ে যায়। কাগজটাও শুভ্রতা বিসর্জন দিয়া হলুদের দিকে এগোতে থাকে।

হরিময়বাবু নিজে দিনলিপি পরীক্ষা করে দেখলেন। বংশগোপাল বিশ্বাস বহুবছর আগে হরিময়ের সঙ্গে বহু বিষয়ে কথা বললেও এই সব প্রসঙ্গ একেবারেই উত্থাপন করেননি।

এখন রাত চারটে। হরিময়বাবু লক্ষ্য করলেন ভোর কুয়াশার মতন ঘুম নেমে আসছে বংশগোপালের প্রপৌত্র বংশগোলাপ বিশ্বাসের চোখে।

কথা বলতে বলতেই বংশগোলাপ নিজের চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়লেন।

আহা, মানুষটা ঘুমোতে চায় অথচ ঘুমোতে পারে না। বেচারা ঘুমোক। বংশগোলাপ নিজের চেয়ারেই গভীর ঘুমে ডুবে রয়েছেন।



ভোরবেলায় পিকলু বিছানা থেকে ওঠামাত্রই চমচম কার্যালয়ের টেলিফোন বেজে উঠলো।

সল্ট লেক থেকে ঠাকুমা স্বয়ং খোঁজ করছেন নাতি পিকলুর ঘুম হয়েছিল কি না।

দাদু ভবনাথ সেই ভোরবেলা থেকেই লেখায় ডুবে আছেন। ঠাকুরমার দুঃখ লেখার টেবিলে বসলে তিনি কাউকে চিনতে পারেন না। ভাবের ঘোরে থাকেন। লেখকরা সমাধিস্থ হন না, কিন্তু তাঁদের কিছু একটা হয়, চোখ দুটো ভিতরের দিকে চলে যায়।

পিকলু দেখলো, হরিময়বাবু চায়ের মগ হাতে নিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে একটা কাগজ পড়ছেন।

রহস্যময় কাগজ যিনি লিপি লিখেছেন এবং যাঁর মহাপ্রয়াণ সম্বন্ধে এতো কথা লিখা হয়েছে কারও নাম নেই।

একবার নয় দুবার পিকলুও মন দিয়ে কাগজটা পড়লো।

"তাহলে, আপনার বংশগোপাল বিশ্বাস কেন গভীর রাতে ঘুমোতে পারতেন না তা এতদিনে বুঝতে পারলেন? মনে কোনো অপরাধবোধ ছিল, এমন সময়ে ঘুমিয়েছেন যখন ঘুমনো উচিত ছিল না। মহাত্মা গান্ধির আত্মজীবনীতে এরকম একটা দৃশ্য আছে, দাদু বলছিলেন মহাত্মার বাবা

তখন মারা যাচ্ছেন।"

কিন্তু মাথাটা ঘুলিয়ে যাচ্ছে হরিময়বাবুর। এই "তিনি" লোকটি কে?

পিকলু জিজ্ঞেস করলো, "একটা পাঁজি আছে?"

অবশ্যই আছে, পি এম বাকচি এবং গুপ্তপ্রেস দুটোই সম্পাদকীয় টেবিলে সারাক্ষণ সাজানো থাকে।

পাঁজি দেখে পিকলু বললো, "ব্যাপারটা ঘটেছিল ১৫ই কিংবা ১৬ আগস্ট। এবারের পাঁজিতে ৩১শে শ্রাবণ হচ্ছে ১৬ ই আগস্ট।"

হরিময়বাবু ধৈর্য ধরতে পারলেন না। ভবনাথ সেনের ওপর তাঁর বিশেষ ভরসা। ফোনে তাঁকেই জিজ্ঞেস করলেন, "ছেচল্লিশ সালের ডাইরেক্ট দাঙ্গা ছাড়া ১৬ই আগস্টে স্মরণীয় আর কী কী হয়েছে?"

ভবনাথবাবু টেলিফোনেই উত্তর দিলেন, "১৫ই আগস্ট শ্রীঅরবিন্দ জন্মেছিলেন। আর ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাপারটা। দাঁড়াও একটু ভেবে দেখি। যতদূর মনে পড়ছে, ৩১শে শ্রাবণ রবিবার তিনি কাশীপুর উদ্যানবাটিতে মর্তলীলা সাঙ্গ করেছিলেন।

"ইউরেকা! ইউরেকা!"

টেলিফোনেই হরিময়ের আনন্দোচ্ছ্বাস শুনতে পেলেন ভবনাথ। জিজ্ঞেস করলেন, "কী হলো তোমার হরিময়?"

"ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ইতিমধ্যেই চমচমকে নিয়ে তাঁর লীলাখেলা শুরু করে দিয়েছেন। এবার অপ্রকাশিত এমন সব একে একে দলিল আপনার হাতে তুলে দেবো যে আপনি চমচম পত্রিকায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ রহস্যামৃত না-লিখে থাকতে পারবেন না।"

হরিময় জানালেন, "প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে ঠাকুরের লীলাবসান। অপ্রকাশিত, অবিশ্বাস্য, অভূতপূর্ব, অভাবনীয় সমকালীন দলিলের খোঁজ পেয়েছি।"

"হরিময় তুমি কী বলছো! কোথাও ঠাকুরের শেষদিন এবং শেষরাত্র সম্বন্ধে নতুন কোনো বিবরণী পাওয়া গিয়েছে জানলেই সাংবাদিকরা হৈ হৈ ফেলে দেবে। চালচল্য শুরু হয়ে যাবে ভক্ত মহলে। কিন্তু খুব সাবধান,

হরিময়। এসব দলিল অনেক সময় জাল হয়, কাগজগুলোর সত্যতা সম্বন্ধে খুব সাবধান থেকো তুমি।"

হরিময়বাবু লোভ সামলাতে পারলেন না। বললেন, "স্যার আপনার আগামী বইতে একটা অবিস্মরণীয় এবং ক্যারাকটারের নাম হতে চলেছে লেট ললিত। এই চরিত্রটি জীবনে যা কিছু করে তা সব দেরিতে। আপনি কি মনে করেন, কোনও জালিয়াতের মাথায় এমন সৃষ্টির ইঙ্গিত আসবে? বোধহয় স্বয়ং নরেন্দ্রনাথ এই লেটললিত নামটা দিয়েছেন।"

ভবনাথ সেন উত্তর দিলেন, "মনে রেখো হরিময়, আমি এই ঠাকুর-স্বামীজির ব্যাপারে তেমন কিছু জানি না। অসংখ্য খবরাখবর বিভিন্ন জায়গায় নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। কিছু খবরের পাত্তা পাওয়া গিয়েছে, অনেক কিছু এখনও সাধারণের অজানা হয়ে আছে।"

ভবনাথকে ভরসা দেবার জন্যে হরিময় বললেন, "রম্যাঁ রোলাঁ কতটুকু জানতেন, স্যার? কী করে তিনি অতবড় বই লিখে ফেললেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে?"

ভবনাথবাবু বুঝিয়ে বললেন, "ওঁর কথা আলাদা। রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে জগদ্বিখ্যাত ফরাসী লেখকের প্রথম আগ্রহ হলো ইন্ডিয়ান রাইটার ধনগোপাল মুখার্জির ইংরিজি বই পড়ে। জানো তো ধনগোপালের কথা? বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখার্জির পরিবারের লোক, পরে অজ্ঞাত কারণে মার্কিন দেশে আত্মহত্যা করলেন। স্ত্রী ছিলেন আমেরিকান। রোলাঁ আবার একসময় মিস জোসেফিন ম্যাকলাউডের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলেন।"

"তিনি আবার কে?" হরিময়বাবু বিদেশিনী সম্বন্ধে তেমন খোঁজখবর রাখেন না।

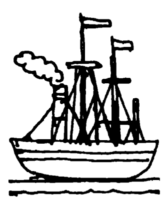
ভবনাথ টেলিফোনে বললেন, "রামকৃষ্ণ মিশনের ট্যানটিন! ওঁর সম্পর্কে সম্প্রতি দুর্দান্ত ইংরিজি বই বেরিয়েছে, লিখেছেন অ্যামেরিকান সন্ন্যাসিনী — প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণা। জিজ্ঞেস করো পিকলুকে, বইটার বিদুঘুটে নামটা দেখে সেদিন বইটা উল্টেছিল।"

উৎসাহী হরিময়বাবু টেলিফোনে বললেন, "বুঝেছি, শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যা

ছিলেন এই ম্যাকলিওড।''

পিকলু বললো, ''না হরিময়দাদা, মিস ম্যাকলাউড কোনোদিন ঠাকুরকে দেখেননি। দেখেছিলেন বিদেশে স্বামী বিবেকানন্দকে। কিন্তু নিজেকে বিবেকানন্দ শিষ্যা বলতে রাজি ছিলেন না, বলতেন আমি বিবেকানন্দের বান্ধবী। আর একটা কথা নামের বানানটা ম্যাকলিয়ড হলেও উচ্চারণটা ম্যাকলাউড। এঁরই ডাকনাম ট্যানটিন। এই মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে পরিচয় ছিল রমাঁ রোঁলার। তিনিই লেখককে উৎসাহ দিলেন একজন অজানা ভারতবাসী সম্বন্ধে বই লিখতে।''

হরিময়বাবু এবার পিকলুকে বললেন, ''রাখো ভাই বিবেকানন্দজীর কথা। ওসব কথা চমচমে ছাপিয়ে বিপদে পড়ে যাই আর কি ! আমার ধারণা ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষদের কখনও বান্ধবী হয় না, বড় জোর ভক্ত হয়!''



বংশগোপাল বিশ্বাসের প্রাচীন দিনিলিপির একটা জেরক্স কপি করিয়ে নিয়ে মুল দলিলটা ওপরে বংশগোলাপকে ফেরত দিতে গেলেন হরিময়। কিন্তু তিনি তখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন — বেচারা! দৈনিক সংবাদপত্র আপিসে এমন লোকের খুব কদর হতো, যারা সারা জন্ম রাতে জেগে, দিনের আলোয় ঘুমোতে অরাজি নয় তাদের কাছে পেলে কাগজের মালিক

আর কিছু চাইবে না।

পিকলু এবার বললো, "একটা জিনিস স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, সো-কলড বংশগোপাল বিশ্বাসের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের ভালই যোগাযোগ ছিল।"

উৎসাহিত হয়ে হরিময়বাবু কপালে হাত ঠেকালেন। "বংশগোপাল বিশ্বাসই হলেন চমচম পত্রিকার প্রকৃত মালিক। স্বয়ং প্রতিষ্ঠাতার যখন ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তখন চমচম অবশ্যই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশীর্বাদধন্য।"

কিন্তু প্রশ্নটা হলো, জীবিতকালে বংশগোপাল কেন হরিময়ের কাছে রামকৃষ্ণের উল্লেখ করলেন না? এই নীরবতা কি রহস্যময়? কোথাও কি কিছু ঘটেছিল? ঠাকুরের দেহাবসানের পরেও কি বংশগোপালের সঙ্গে ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের কি যোগাযোগ ছিল? না এমন কিছু ঘটেছিল যা আমরা জানি না?"

পিকলু সোজাসুজি সন্দেহ করলো, "বংশগোপাল কোনো কারণে কি বিশ্বাস বিতাড়িত হয়েছিলেন?"

হরিময়বাবু উত্তর দিলেন, "মতভেদ হলে কোনও কোনও সন্ন্যাসী এই সঙ্ঘ থেকে দূরে সরে যান, কিন্তু তাঁরা তো ঠাকুরের প্রতি ভক্তি কমান না। বরং তাঁরাও নিজেদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে ঠাকুরের প্রচারে নেমে যান। আমি তো দেখেছি এমন কিছু সন্ন্যসী, যাঁরা দূরে সরে গিয়েছেন স্বেচ্ছায়। সব সময় তাঁদের বিতাড়িত বলা যায় না। বিশ্বব্যাপী বড় সঙ্ঘ চালাতে গেলে ঐসব এক-আধটা ঘটনা তো ঘটবেই। কিন্তু যাঁরা দূরে চলে গেলেন তাঁদেরও একমাত্র ভরসা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।"

পিকলু এখন বংশগোপাল বিশ্বাস পরিবার রহস্য নিয়ে বিশেষভাবে মাথা ঘামাচ্ছে।

প্রয়োজন বোধ করায় সে হুটকো হালদারকেও ফোন করল। এ-অঞ্চলে হুটকো হালদার হলেন কিনা একটি চলমান রামকৃষ্ণ অভিধান। সেই আট

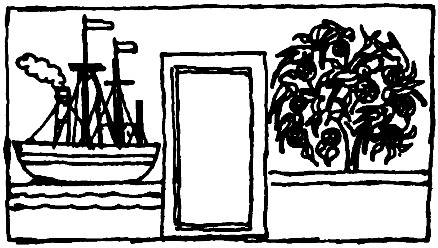
বছর বয়স থেকে সুযোগ পেলেই তিনি বেলুড় মঠে যাচ্ছেন এবং দীর্ঘদিন ধরে পরশ নৈপুর্ণে শতসহস্র ঠাকুর-গপ্পো সংগ্রহ করেছেন।

"লেট ললিত বলে কারও নাম শুনেছেন এ হুটকোকাকু?" সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলো পিকলু।

হুটকো হালদার উত্তর দিলেন, "ঠাকুরের কাছে কত যে পিকুলিয়র লোক আসতেন। কত সব অদ্ভুত নাম। এক জনের নামও তো ছিল হুটকো। তবে শুনুন, যদি চমচমে ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু লেখেন, তা হলে জানিয়ে দেবেন ঠাকুরের সরকারি ডেথ সার্টিফিকেটে তারিখের গোলমাল আছে। সরকারি রেজিস্টারিতে বুড়ো গোপালবাবু লিখিয়েছিলেন — ১৫ই আগস্ট ১৮৮৬, অথচ মৃত্যু ১৬ই আগস্ট। নামটাও ভুল করেছিলেন — পুলিশের খাতা অনুযায়ী — রাম কিষ্টো প্রেমোহংস! ঠিকানা ৪৯ কাশীপুর রোড, বয়স বাহান্ন। মৃত্যুর কারণ : গলায় আলসার। পেশা : প্রচারক। সংবাদদাতার নাম : গোপালচন্দ্র ঘোষ। খাতায় কলমে উনিও কিন্তু ভক্ত নন — বন্ধু। আরও একটা মস্ত ভুল আছে ডেথ রেজিস্টারে, মিস্টার পিকলু। লেখা আছে জাতি : হুগলি। ওটা জেলা হবে।"

পিকলুর প্রশ্ন পেয়ে খুব খুশি হয়েছেন হুটকো হালদার। অনেকদিন পরে কলকাতায় ফিরে এসে ওঁর ধারণা হয়েছিল ঠাকুর-স্বামীজি সম্পর্কে কিছু মহলে উত্তাপ কমে যাচ্ছে। ব্যাপারটা তাহলে ঠিক নয়। অন্ধ অনুরাগীর দল যেমন সঙ্ঘের পক্ষে ভাল নয়, তেমন প্রচণ্ড সামাজিক অনীহাও সঙ্ঘের পক্ষে মঙ্গলদায়ক নয়।

উৎস্যাহিত হয়ে হরিময়বাবু এবার বললেন, "ভবনাথ সেনকে অনুরোধ করতে হবে, ধারাবাহিকের জব্বর একটা নাম দিতে। পরমপুরুষ-ফুরুষ আজকাল বাজারে খাবে না। নতুন নামটা হতে পারে— প্রোমাহংস রহস্যাবৃত, তাহলে সাউথ ক্যালকাটায় আধাসাহেবী বাঙালি পরিবারে চমচমের কিছু বেশি বিক্রি পাবো। প্রমোহংস কথাটা মডার্ন মহলে সুড়সুড়ি দেবে।'



দুপুর একটার সময় বংশগোলাপবাবুকে মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ জানিয়ে ভুল করে ফেলেছেন হরিময়বাবু। অতিথির জন্যে বসে বসে তিনি ও পিকলু ধৈর্যচ্যুত হচ্ছেন। হরিময়বাবুর পেটে আবার অনাহারে গ্যাসট্রিক ঢেকুর ওঠে। তাই একটু আলুভাতে পিকুলর সঙ্গে ভাগ করে আলতো ভাবে মুখে পুরে দিলেন। এই আলুভাতে মাখার ফর্মুলা ও পদ্ধতিটা খোদ টিপু সুলতানের ফ্যামিলি থেকে নিজে শিখে এসেছেন হরিময়বাবু।

সেবার টিপু সুলতান বিশেষ সংখ্যা হরিময়বাবু বার করেছিলেন বহু খেটে। খুশি হয়ে, টিপুর বংশধররা ওই গোপন পারিবারিক রেসিপিটা তাঁকে দিয়েছিলেন অন কন্ডিশন যে ফর্মুলাটা কখনও কাগজে প্রকাশ করবেন না। বহু কষ্টে, পরের পর পাঁচজন কাজের লোককে এই সুলতানি রিসিপটা হরিময়বাবু শিখিয়ে এসেছেন।

অবশেষে তিনটে বাজলো, বংশগোলাপবাবুর দেখা নেই। নিরাশ হয়ে ওঁরা দুজনে এবার খেতে বসলেন।

পিকলু কিন্তু বিরক্ত হয়নি, তার দৃঢ় বিশ্বাস দাদু এবার একটা গল্প পেয়ে যাবেন। হরিময়বাবু এখনও ভরসা পাচ্ছেন না। বড্ড মুডি লেখক ভবনাথ— প্রচুর গল্পের শাঁস না থাকলে কিছুতেই লেখা শুরু করবেন না।

পিকলুর ধারণা, এই ৪২/৩ হিদারাম হালদার সম্পত্তিটা দেখলেই মনে

হয়, একখানা উপন্যাস এখানে আইসক্রিমের মতন জমাট হয়ে রয়েছে। কতদিন যে বাড়িটা রঙচঙ হয়নি তার হিসেব নেই। কেমন একটা ভুতুড়ে ভাব ছড়িয়ে রয়েছে বিশ্বাসলোকের সর্বত্র।

পরিস্থিতির পক্ষে হরিময়বাবু বললেন, "কে রঙ করাবে, মিস্টার পিকলু? দামি সম্পত্তি, কিন্তু তেমন কিছু রোজগার তো নেই। তাছাড়া মিস্টার কারনানির কারবারটাই অন্য রকম— যত সেকেলে বাড়ি হবে তত উনি স্যাটিসফ্যাসশন পান, আর আমি চমচম কার্যালয়ের ভিতরটা কিছুতেই রঙ করাতে পারি না ফর অবভিয়াস রিজনস।"

"অবভিয়াস কারণগুলি কি?" জানতে চাইছে পিকলু।

"একালের অমূল্য সংগ্রহ— চমচমের পুরনো সংখ্যাগুলো। প্রথম সংখ্যা থেকে শুরু করে একে একে ছ'শ ইস্যু হয়েছে, প্রত্যেকটির বাড়তি সংখ্যা মার্কামারা অবস্থায় থরে-থরে সাজানো রয়েছে — রঙ করার সময় সেখানে চুন পড়লে কী অবস্থা হতো পিকলু? পুরনো কালে রাজাদের স্বর্ণভাণ্ডার কখনও হোয়াইট ওয়াশ হত না।"

"হরিময়দাদা, একশ বছর ধরে টানা চলছে এমন কাগজ কলকাতাতেই রয়েছে, তাঁদের সাজানো-গোছানো কিন্তু এরকম নয়।" বললো পিকলু।

"একশ বছর? হরিময়বাবু বিশ্বাসই করতে পারছেন না। টানা কাগজ বার হচ্ছে মাসে মাসে?"

এই সময় হুটকো হালদার সাইকেল রিকশ চড়ে উপস্থিত হলেন। হরিময়বাবু খুব খুশি। জোর করলেন, "ভাত না খাও, এক প্লেট সুলতানী আলুয়া খেতেই হবে।"

হুটকোবাবু ভুল শুনলেন, হালুয়া। মুখে দিয়ে বললেন, "এ তো হালুয়া নয়, আলুভাতের মতন আস্বাদ!"

হরিময়বাবু বললেন, "নামটা আমার নিজস্ব দেওয়া— আলু থেকে আলুয়া। কেউ হালুয়া শুনলে তার জন্যে তো আমি দায়ী নই!"

হুটকো হালদার খুব উৎসাহ বোধ করছেন। " যে করেই হোক ভবনাথ সেনমশাইকে রামকৃষ্ণ ময়দানে নামিয়ে দিন। যত লোক এ-লাইনে চলে

আসেন তত আমাদের ভাল। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রচার হবে। এই যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত! কীরকম রেকলেস ঝড়ো হাওয়া ছিলেন, কেউ কি ভেবেছিল, এই জগাই অমন পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লিখে বসবেন?"

এরপরের মন্তব্যে চাপা হাসি দেখা গেলো হরিময়বাবুর মুখে। হুটকো হালদার বললেন, "রহস্য উপন্যাস ছাড়া আর সব লেখা যায় আমাদের ঠাকুরকে নিয়ে। তাঁর দয়ার শরীর, প্রেমের শরীর। সেখানে হিংসা এবং হানাহানির বিন্দুমাত্র স্কোপ ছিল না। সেই প্রেমময় শরীরও তিনি বিলিয়ে দিলেন বহুজনের মুক্তিকামনায়।"

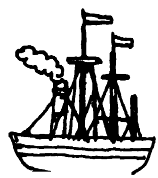
"কেন? ডিটেকটিভ গল্প লেখা যায় না আমাদের ঠাকুরকে কেন্দ্র করে?" জিজ্ঞেস করলেন হরিময়। একটু ক্ষুণ্ণ এবং একটু হতাশ হয়ে।

"ঠাকুর তো ডিটেকটিভ ছিলেন না, তিনি তো চোর ধরতেন না। তিনি যে রসের ভাণ্ডারী। লোককে হাসাতে, তাদের নিয়ে মজা করতে করতে ভগবদ বিশ্বাসের দিকে টেনে নিয়ে যেতে ওস্তাদ ছিলেন। এই ধরুন যখন গলার রোগের চিকিৎসার জন্যে দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে দুর্গাচরণ মুখুজ্যে স্ট্রিটে ভাড়া বাড়িতে ঢুকলেন, তখন কে যেন জিজ্ঞেস করলেন, দক্ষিণেশ্বর ছাড়লেন কেন? তিনি সোজা উত্তর দিলেন, 'বড় স্যাঁতসেঁতে এবং বাহ্যে যাবার বড় অসুবিধে!' নরদেবতা কখনও নিজেকে দেবতা ভাবেন না হরিময়বাবু। আপনি কৃষ্ণের দিকে দেখুন, রামচন্দ্রের দিকে দেখুন। এই সহজ ভাবটাই পাবলিক পছন্দ করে— মনিব যখন মনিবিয়ানা করে তখন তাঁর গ্ল্যামার নষ্ট হয়ে যায়।"

হরিময় আবিষ্কৃত আলুয়া খেয়ে বেশ সন্তুষ্ট হয়ে হুটকো হালদার বললেন, "আমাদের হাওড়ায় রামকৃষ্ণের প্রতাপ চিরকালই প্রবল। দুনিয়ার ঘুম ভাঙবার আগে কবে কোন্‌কালে হাওড়ায় রামকৃষ্ণপুর স্থাপিত হয়েছে। সেখানে এসেছেন স্বয়ং বিবেকানন্দ। ভক্ত-গৃহে বসে রচনা করেছেন জপমন্ত্র। হাওড়ার লোকরা দিল্লির লোকের মতন অবুঝ নয়— শর্টে সারবার জন্য রামকৃষ্ণপুরম্‌কে আর-কে-পুরম্ করেনি। চলো পিকলু, তোমায় রামকেষ্টপুরে নবগোপাল ঘোষদের বাড়িটা দেখিয়ে আনি যেখানে

সবান্ধব বিবেকানন্দর পদধূলি পড়েছিল। নবগোপাল আদিতে ছিলেন বাদুরবাগানের অধিবাসী। ঠাকুরের কাছে সস্ত্রীক প্রায় আসতেন, কাজ করতেন এবং সওদাগরী অফিসে। কাশীপুরে এঁর স্ত্রীকেই ঠাকুর এক বেড়াল ও তার বাচ্চা পালনের ভার দিয়ে খুব নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। ভক্তের পরিবার, পরে নবগোপাল বাবুর মেজ ছেলে সন্ন্যাসী হন হুগলী অম্বিকানন্দ নামে।"

বুলেট বাইকটা হাওড়ার রাস্তার পক্ষে ঈশ্বরের দূতের মতন। এখানকার রাস্তা এতো সরু যে চারচাকার গাড়ির এখানে প্রবেশ প্রায় নিষেধ।"



অনেক সময় অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু এখনও পিকলুর ফেরার লক্ষণ নেই। হুটকোবাবুর কাণ্ড তো। হয়তো শঙ্করীপ্রসাদ বসুর কাছেও পিকলুকে নিয়ে গিয়েছে, রামকৃষ্ণ সংবাদের হোলসেল আড়ত দেখাতে। কিংবা হয়তো ওর সঙ্গে চলে গিয়েছেন বেলুড়মঠে। গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড ধরে এগিয়ে, বাঙালবাবু ব্রিজ পেরিয়ে, লিলুয়ার ওপর দিয়ে ছুটলে বেলুড় মঠ আর কতখানি? ওদিকে রামকৃষ্ণ মন্দির, এদিকে শ্রীরাম ঢ্যাং রোড, শালকিয়া। দুটোর মধ্যে কী সম্পর্ক কে জানে? হুটকোবাবু আবার বলেন, "ওটা ঢ্যাং নয় ঢং।" অতসব হিসট্রি-জিওগ্রাফি জেনে লাভ নেই। চমচমের তরুণ পাঠকরা আজকাল তাজা গল্প চাইছে। যে গল্প চোখের সামনে ঘটছে।

তালমিছিরির মতন তালগন্ধ চায় তারা।

হরিময়বাবু পিকলুর অপেক্ষা করছেন, সেই সময় বিশ্বাস লজের দোতলা থেকে চিরকুট এলো পাঠিয়েছেন স্বয়ং বংশগোলাপ বিশ্বাস। স্থানীয় সংবাদের রয়টার বিজয়। সে ফিসফিস করে হরিময়বাবুকে জিজ্ঞেস করলো, "এই সম্পত্তি কি গোলাপবাবু বিক্রি করে দিচ্ছেন?" খবরটা টায়ার সিং এবং ম্যানেজার সিং চুপিচুপি জানিয়েছে বিজয়কে। একজন সিন্ধি ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে, এই যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছেন ওয়ান মিস্টার কারনানি।

হরিময়বাবুর মতে, সবই সম্ভব। এ-বিষয়ে বেশি মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। যাঁদের বাড়ি তাঁরা যা ইচ্ছে তাই করবেন। এতোদিন যে বিক্রির কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি এটাই আশ্চর্য।

বংশগোপালবাবু এই বাড়ি বিক্রি কথা অবশ্যই ভাবেননি। তাঁর সন্তান হয়তো সুযোগ পেলে ভাবতো, কিন্তু কয়েকটা অকালমৃত্যু অভিশাপের মতন নেমে এসেছে।

বংশগোপাল প্রথম শোক পেয়েছিলেন জ্যেষ্ঠপুত্রের অকালমৃত্যুতে। দ্বিতীয় মৃত্যু ছিনিয়ে নিয়েছিল দ্বিতীয় পুত্রের একমাত্র সন্তান বংশবিজয়কে।

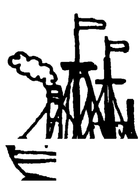
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় ছেচল্লিশ সালের সেই শোকাবহ ঘটনার কথা হরিময় ভোলেননি। এরপরেই সহজবোধ্য কারণে শোকাহত বংশগোপালপুত্র তাঁর একমাত্র নাতিকে নিয়েই এই শিবপুর ছেড়ে প্রবাসী হয়েছিলেন। সেই নাতি বংশগোলাপ এত বছর পরে ফিরেছেন পারিবারিক সম্পদের খোঁজখবর করতে। তাঁর মাথায় বিক্রির পরিকল্পনা থাকা অবশ্যই আশ্চর্য নয়।

বংশবাটির দোতলায় উঠে হরিময় দেখলেন, একটা লাল বিদ্যাসাগরী চটি পরে বংশগোলাপ বিশ্বাস পা-টা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে আরাম কেদারায় বসে আছেন। একেবারে যেন পঞ্চাশ বছর আগেকার দৃশ্য! এখানেই স্বয়ং বংশগোপাল বিশ্বাস এই ভাবে চলে গড়গড়ায় তামাক খেতেন।

বংশগোলাপ প্রথমেই ক্ষমা চাইলেন। বললেন "ঘুমিয়ে পড়েছিলাম,

আপনার সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন হলো না। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে আজ স্বপ্ন দেখলাম স্বয়ং বংশগোপালকে। প্রপিতামহ আমাকে হঠাৎ বললেন, 'ভিটেতে এসেছিস, খুব ভাল করেছিস,' তারপর যখন ঘুম ভাঙলো, তখন এতো দেরি হয়ে গেছে যে আপনার কাছে আর যাওয়া যায় না। আমার জন্যে অপেক্ষা না করে করে ততক্ষণে আপনারা নিশ্চয় খেয়ে নিয়েছেন।''

একটু থেমে নতুন খবর দিতে শুরু করলেন বংশগোলাপ বিশ্বাস। এই দেখুন পারিবারিক কাগজপত্তর এবং পারিবারিক প্রতীক সব উদ্ধার করছি। কে এম দাসের এই বিদ্যাসাগরী চটি জোড়া বংশগোপালের ট্রাংকে তোলা ছিল— একেবারে পায়ে ফিট করে গেল।'' হরিময় বাবুর সঙ্গে পড়লো, বংশগোপালের পায়েও লাল রঙের কে এম দাসের বিদ্যাসাগরী চটি দেখা যেতো। প্রপিতামহ বংশগোপাল বিশ্বাস তাহলে মৃত্যুর অর্ধশতাব্দী পরেও একের পর এক বিস্ময় সৃষ্টি করছেন। চাইনিজ ইংকে লেখা নতুন এক দিনলিপিও উদ্ধার করেছেন প্রপৌত্র বংশগোলাপ।

শরীরে শিহরন অনুভব করছেন হরিময়বাবু। বংশগোলাপের দিনলিপি থেকে পড়ে শোনাচ্ছেন তাঁরই প্রপৌত্র বংশগোলাপ।

পুরনো দিনের ইতিহাসটা এবার আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বংশগোপাল লিখেছেন :

'আমি মদ্যপান করেছি একবারই। আমার প্রথম সন্তান বংশমহিমার আকস্মিক মৃত্যুর পরে। মাত্র দশ বছর বয়সে এইভাবে ফুলের মতো নিষ্পাপ কোনও ছেলের মরা উচিত? আপনারা বলুন।

প্রবাসে এই বিপত্তি ঘটার পর আমি বার্মার বিজনেসের পাট চুকিয়ে দিয়ে ফিরে এসেছি হাওড়ায়। অনেক খুঁজে খুঁজে সম্পত্তি কিনেছি হিদারাম হালদার লেনে।

বুঝেছি, শ্রীশ্রীঠাকুর এখনও আমার কাছ থেকে পুজো চান— আদর-যত্ন না হলে ওঁর মন কিছুতেই ভরে না। শশী তা জানতো। আমাকেও তিনি দেখালেন কত ক্ষমতা তিনি রাখেন। সব বুঝিয়ে দিলেন এই অধম ভাণ্ডারিকে।

স্টোরকিপারমশায়ের চোখ এবার খুললো, সে বুঝলো মদ-টদ চলবে না। ঠাকুর মাতালদের সঙ্গে মেশেন, তাদের পরামর্শও দেন যেন পা না টলে, কথা না জড়ায়, কিন্তু নিজে ফোঁকেন তামুক। দেশে ফিরে এসে দেখি ত্যাগী শিষ্যদের অনেকে তামাক খাওয়ার এক্সপার্ট। এক নম্বর থেকে শুরু করে হুঁকো টানতে প্রায় কেউ বাদ যায় না। আর বড় চেলার তো হুঁকো, গড়গড়া, চুরুট, সিগ্রেট, টেবাকো, বিড়ি কিছু বাদ যায় না। অবশ্য কোথাও কিছু ঢাকঢাক গুড়গুড় নেই, নরেন্দ্র লিখিত অনুমতি দিয়েছে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে ধূমপান করার, কিন্তু অন্য কোনও মাদকতা নয়। অন্য নেশা বলতে এখানে ঈশ্বরের নেশা। ঠাকুরের হুকোকেও ভোলা হয়নি— বেলুড়ের মন্দিরে রাতের ভোগের পরে ঠাকুরকে হুঁকো দেওয়ার সিস্টেম চালু রয়েছে। তাঁকে এই হুঁকোকল্কে নিবেদন করে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। বড় চেলা তো অল্প বয়সে নস্যিও নিতেন— তাঁর ভাইরা নস্যের গন্ধে কাছে শুতে চাইতো না।"

বংশগোপালবাবু এর পরেও লিখেছেন : "মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড রসিক মহিলা। বেলুড়ে নরেন্দ্রকে দেওয়া ভোগ দেখে তিনি মজা পেয়েছিলেন, সেখানে তাঁর প্রিয় হট চকোলেট আইসক্রিমও ছিল। মিস ম্যাকলাউড জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি মনে করো এতে তিনি আনন্দ

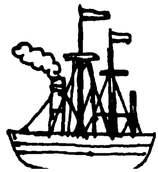
পাচ্ছেন? উত্তরটি এলো মোক্ষম— অন্তত আমরা তো ওঁকে নিবেদন করে আনন্দ পাচ্ছি।"

বংশগোপালবাবু তাঁর দিনলিপিতে আরও অনেক কথা নিজের খেয়ালে লিখেছেন, বংশগোলাপ পড়তে লাগলেন : "কাশীপুরের উদ্যানবাটিটি দেখেতে ওপাড়ায় গিয়েছিলাম অনেক বছর পরে। বাড়ির ভিতরে ঢুকিনি। মনে মনে বললাম, যে যাই বলুক, বিত্তবাসনা ও অর্থলাভে আমি কিন্তু নির্বংশ হইনি। আমার সংসার থেকে প্রিয়পুত্র 'বংশমহিমা' হয়তো বিদায় নিয়েছে, কিন্তু বটগাছে নবকিশলয়ের উদ্ভব হয়েছে। আমার বংশে নতুন অতিথি এসেছে।

আমি তার নামকরণ করেছি বংশবিনয়। ক্ষমা করো, দয়া করো, অধীনের এই বংশ রক্ষা করো, হে ঈশ্বর। সংসারী মানুষের পক্ষে কাঞ্চনের জন্য কাতর হওয়া তো অযথা নয়, অন্যায়ও নয়। একথা তাঁর থেকে স্পষ্টভাবে কেউ বুঝতো না, অথচ কোথায় এক চাপা অতৃপ্তি থেকে যাচ্ছে, কে যেন বোঝাতে চাইছ, তাঁর কাছে এসে পরমার্থ না চেয়ে যে অর্থ চায় সে ভুল করে, ভীষণ ভুল করে। এই ভুলের দুঃখ এ সংসারে কেউ ঘুচোতে পারবে না।

কিন্তু আমার প্রশ্ন এই কঠিন শাস্তি ঠাকুর স্বয়ং কবে দিলেন? আমরা যাঁরা তাঁকে দেখেছি দিনের পর দিন তারা তো তেমন ইঙ্গিত কখনও পাইনি। উপেন মুখুজ্যে অর্থ চেয়ে অর্থ পেয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে অনিবার্য ভাবে বংশনাশের বজ্রপাত হয়েছে উপেন্দ্রনাথের মন্দিরে। কিন্তু দুটির মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে বলে আমার মনে হয় না।

এই মুহূর্তে আমি অপরের কথা ভাবতে সক্ষম নই, আমি বারবার বলছি, হে ভৈরব আমাকে শক্তি দাও, ভক্ত পানে চাহ।"



. যে বংশবিনয়ের উল্লেখ রয়েছে বহুদিন আগের বংশগোপালের দিনলিপিতে তাঁরই নাতি স্বয়ং বংশগোলাপ বিশ্বাস এই মুহূর্তে হরিময়বাবুর সামনে আরামকেদারায় আধশোয়া অবস্থায় কথা বলছেন।

বংশমহিমা বলে এই বংশে কেউ ছিল তা আগে ঠিক স্পষ্ট শোনেননি হরিময়বাবু। কিন্তু তিনি নিজের চোখে দেখেছেন দ্বিতীয়পুত্র বংশবিনয়কে, তিনি হাওড়াতেই কনট্রাকটরি করতেন। কলকাতায় কাগজের দোকানও ছিল হরিময়বাবু শুনেছিলেন যুদ্ধের সময় এঁদের সাপ্লায়ের ব্যবসাটা বেশ জমে উঠেছিল। ইস্পাহানি কোম্পানিতে তখন অনেক হিন্দু সাপ্লায়ার ছিল। বংশবিনয় অবশ্য সাপ্লাই করতেন সোজা সরকারকে।

বংশগোপালের স্নেহময় আশ্রয়ে যখন হরিময়বাবু এলেন, তার কিছু পরেই অবশ্য পরিস্থিতির বিপর্যয় ঘটতে শুরু করলো। ছেচল্লিশের ১৬ই আগস্ট সোনার বাংলাকে চিরকালের জন্যে ছিন্নভিন্ন করে গেলো। শত শত বছরের প্রীতির ইতিহাস এবং ঐতিহ্য ক্ষণভঙ্গুর চিনামাটির বাসনের মতন সময়ের শিথিল হাত থেকে পড়ে ঝনঝন করে ভেঙে গেলো। সে এক উন্মত্ত সময়। তখন আর মানুষকে বুঝিয়ে কোনও লাভ নেই। ধর্মের নাম করে মানুষ হঠাৎ পাগল হয়ে উঠলো। আসলে ধর্মটা হলো একটা আবরণ, একটা ছুতো। সমস্যাটা হল জীবনযাত্রার, অনিশ্চয়তার এবং প্রতিকূল

পরিবেশের জন্য বেঁচে থাকবার উৎকণ্ঠা।"

বংশগোলাপ এরপর হরিময়বাবুর কাছে স্বীকার করলেন, "আমার কিন্তু বাবার কথা একটুকু মনে নেই।"

"থাকবে কী করে? তখন তো আপনি বেবি! শিশুরা তো কিছু মনে রাখে না। এইটাই আমাদের পরম সৌভাগ্য। তাই নতুন প্রজন্ম নতুন ভাবে ইতিহাস শুরু করতে পারে।"

বংশগোপাল শান্তভাবে হরিময়কে বললেন, "শুনেছি আমার বাবা বংশবিজয় ছিলেন খুবই উদারহৃদয় মানুষ। বিপুল উৎসাহে তিনি সমাজসেবা করতেন।

শিবপুর চড়ার বস্তিতে মসজিদের সামনে বসে অনেক গরিব মুসলমান পরিবারের উপকার করতেন। আর বংশগোপাল তাঁকে উপদেশ দিতেন, ইয়ংম্যান বিজনেসে মন দাও। এই বংশে একদিন অনেক টাকা আসবে, বোধহয় তুমিই সেই বিত্তের নিমিত্ত হবে।

কিন্তু টাকা তো দূরের কথা, সেই নিরপরাধ রায়টে মার্ডার হলো, ভাবা যায় না।

দাদু বংশবিনয় এই বজ্রাঘাত সহ্য করতে পারলেন না। শোকে বিপর্যস্ত হয়ে হাওড়া ছেড়ে চলে গেলেন বেনারস। "আমাকে আর আমার বিধবা মাকে সঙ্গে নিয়ে। আমার ঠাকুমাও স্বামীর সঙ্গে যাবার অনুমতি চাইলেন শ্বশুর বংশগোপালের কাছে। তিনি সজল চোখে বললেন, যাবার হলে যেতে হবে সবই তো তাঁর ইচ্ছে। কিন্তু আমার হিসেবে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে বউমা।"

তারপর হিদারাম হালদার লেনের এই বিশাল বাড়িতে নিঃসঙ্গ, নিঃশব্দ এবং অভিশপ্ত দিনাতিপাত করলেন পুত্র এবং পৌত্রশোকাতুর বংশগোপাল বিশ্বাস। সেই পর্বেই হরিময়বাবুর সঙ্গে তাঁর ভালবাসা নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়েছে।

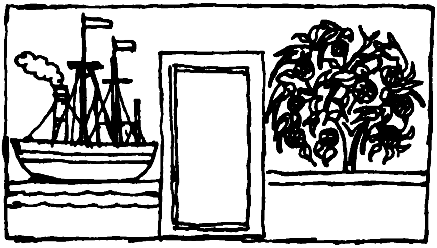
হরিময়বাবুর দুঃখ অবশ্য আজও যায়নি। এই পরিবারের ভাগ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ জড়িয়ে গিয়েছেন তিনি।

হরিময় বললেন, "সামান্য চব্বিশ বছর বয়সে চলে গেলেন বংশবিজয় বিশ্বাস। বংশগোপালবাবুর টেবিলে নাতির ছবিটা আমি অনেকবার দেখেছি- - হাসি হাসি মুখ, কোথাও আসন্ন মৃত্যুর কোনো আগাম ছায়া নেই। অথচ ছবিটা আনন্দ করে তোলা হয়েছিল হাওড়া ময়দানে বঙ্গবাসী ইলেকট্রিক স্টুডিও থেকে মৃত্যুর ঠিক তিন মাস আগে।"

"দাদু বলতেন, একটা সৌভাগ্য, ছেলের বিয়ে দিয়েছিলাম বাইশ বছর বয়সে। না হলে বিশ্বাসবংশ লোপ হয়ে যেতো।"

একটু থামলেন বংশগোলাপ। তারপর বললেন, "এই বংশের মানুষগুলোর এক একটা অকারণ এবং আজব খেয়াল থাকে। দাদু বংশবিনয় আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন, আমার ছেলের বিয়ে অবশ্যই দিতে হবে চব্বিশে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে। বংশধরদের নাম তো প্রপিতামহ বংশগোপাল অনেক আগেই নির্ধারণ করে গিয়েছেন —আমার পরের প্রজন্মের নাম বংশগৌরব।"

বংশগৌরব বিশ্বাস এয়ারফোর্সে কাজ করেন শুনে হরিময়বাবুর গলাটা হঠাৎ শুকিয়ে গেলো। "বিমানবাহিনী!" একটু ঢোক গিললেন তিনি। ভাগ্যে হরিময়বাবুর রিঅ্যাকশন নজরে পড়লো না বংশগোলাপবাবুর।



একে একে বংশগোলাপবাবু নানাকথা বললেন। "বহুদিন পর হাওড়ায় ফিরেছি। চেনাজানা লোকেরা সব কোথায় ছড়িয়ে পড়েছেন। রাস্তায় বেরিয়ে খুঁজেপেতে তাদের বার করতেও ইচ্ছে করে না। এই মুহূর্তে এখানে, আপনিই আমার প্রধান বন্ধু, হরিময়বাবু।"

হরিময়বাবু আশ্বাস দিলেন, "আমরা তো আপনার ঘরের লোক বংশগোলাপবাবু। আপনার প্রপিতামহ বংশগোপালবাবু যা করেছেন চমচমের জন্যে তা তো কখনও ভোলা যায় না। আপনি যখন বেনারস থেকে ফিরে এসেছেন তখন হিদারাম হালদার লেনের এই সম্পত্তিতে জাঁকিয়ে বসুন, পারিবারিক সম্পদ ভোগ করুন। মিসেস বিশ্বাসকেও এবার এখানে আনিয়ে নিন। কোনো অসুবিধে হবে না, হিদারাম হালদার লেন জায়গাটা তো খারাপ নয়, দেখছেন তো এই মন্দিরতলা এরিয়ায় জমির দাম কীরকম বেড়ে গিয়েছে। তা ছাড়া বিদ্যাসাগর ব্রিজ হওয়ার কল্যাণে হাওড়ার এই দক্ষিণাঞ্চল অ্যাজ গুড এখন অ্যাজ ক্যালকাটা। বলতে পারেন, প্রায় কলিকাতায় বসবাস করছি আমরা।"

বেনারসের পাট চুকিয়ে হাওড়ায় ফিরে আসাটা বংশগোলাপবাবুর পক্ষে সোজা নয়। তাঁর স্ত্রী কী এক গোপন মানত করে বসে আছেন বেনারসে। ওখান থেকে কিছুতেই বেরুনো যাবে না আরও দু'বছর— বংশগৌরব

চবিবশে পড়লে তার বিয়ে হবে, ব্রত উদযাপন হবে, তারপর। এর উনিশ-বিশ হবার কোনো উপায় নেই, স্বয়ং বংশবিনয় এই নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। বাবা বিশ্বনাথের নিরাপদ আশ্রয় ছাড়া বংশবিশ্বাসদের কিছুতেই চলবে না।

ব্রত ইত্যাদির ব্যাপার যদি থাকে, তা হলে বংশগোলাপের একার এখন হাওড়ায় ফেরার কি অর্থ?

প্রশ্নের ইঙ্গিতেই বংশোগোলাপের মুখ লাল হয়ে উঠলো। "হরিময়বাবু, অনেক দুঃখের কথা। ধীরে ধীরে বলে বুক হালকা করবো, তাই তো আপনাকে ডেকেছি। আপনার কাছে অস্বীকার করে লাভ নেই, আমাদের এই বিশ্বাস বংশ কারও এক বিচিত্র রসিকতায় এক পিকুলিয়র বংশে পরিণত হয়েছে। কারণে অকারণে ভবিষ্যৎ বংশধরদের উদ্দেশে লম্বালম্বা লিখিত নির্দেশ রেখে যাওয়ার রেওয়াজ এই পরিবারে রয়েছে। এ সব কখনও করবেন না হরিময়বাবু, ভবিষ্যতে যারা পৃথিবীতে আসবে তাদের সব বিষয়ে স্বাধীনতা দিয়ে রাখা আমাদের উচিত। কখনও পিতৃপুরুষের নির্দেশের বেড়ি তাদের পায়ে পরিয়ে দেবেন না।"

"এই অধমের ক্ষেত্রে সে গুড়ে বালি," সলজ্জভাবে জানালেন হরিময়বাবু। "ওই সব হাঙ্গামায় আদৌ যাতে না যেতে হয় তার জন্যেই তো অবিবাহিত থাকা! আমার সৃষ্টি বলতে, সন্তান বলতে, বংশধর বলতে, এই সাধের চমচম। এর মধ্যেই শিয়াখালার চৌধুরী বংশ কয়েকশ বছর টিকে থাকবে, তবে ভবিষ্যৎ চমচম সম্পাদককে আমি সব রকম স্বাধীনতা দিয়ে যাবো।"

কথাগুলো খুব ভাল লাগলো বংশগোলাপের। তিনি বললেন, " আমার অবস্থা বুঝুন। পিতামহ বংশবিনয় বারাণসীতে মৃত্যুশয্যায় আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন, গোলাপ তুমি কথা দাও, ১৯১৭ সালের শুরুতেই যে করে হোক হাওড়ার হিদারাম হালদার লেনে ফিরে যাবে। তা মশাই, মৃত্যুশয্যায় শুয়ে থাকা মানুষের সঙ্গে কেউ তক্কো করে না। আমি চুপ করে বসেছিলাম।"

দাদু মারা গেলেন এইট্টি এইটে, আর নাইনটিসিক্সের গোড়া থেকে

আমার ওয়াইফ ছিনে জোঁকের মতন আমার পিছনে লাগলেন, এই ফেরার ব্যাপারে। যেন এই নির্দেশ অমান্য করলে বিশ্বাস বংশের মহা অপরাধ হয়ে যাবে। শেষে তর্ক না বাড়িয়ে, গত মাসে আমি বংশ-আজ্ঞা পালন করেছি। কিন্তু আমি এখনও জানি না, হৃদারাম হালদার লেনে ফিরে এসে আমাকে কী করতে হবে? এ-বিষয়ে কোনো পথনির্দেশ আমার হাতে নেই, অথচ অন্ধের মতন আমাকে পিতামহের ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করতে হলো।"

একটু থামলেন বংশগোলাপ। বেশ বোঝা যাচ্ছে, তিনি এসব সেন্টিমেন্টে আর বিশ্বাস করতে চান না।

এবার হরিময়কে তিনি বললেন, "কিন্তু বুঝুন আমার অবস্থা! আমি যখন শিশু ছিলাম তখন থেকে পিতার মতন তিনি সস্নেহে পালন করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন, কিছু বিষয়সম্পত্তি করে দিয়েছেন বেনারসে। বেশি না হলেও সংসার চালানোর মতন ভাড়া সংগ্রহ হয়। তাঁর স্মৃতিকে আমি বংশধর হয়ে অপমান করি কী করে? ঠিক সেই সময় যে-কোম্পানিতে কাজ করতাম তারা স্বেচ্ছা-অবসর প্রকল্প চালু করলো। কিছু টাকা নিয়ে কয়েক বছর আগেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমি এই হাওড়ায় চলে এলাম। আমার গৃহিণী বললেন, এও ভবিতব্যের লিখন, না-হলে তোমার দাদু যখন কলকাতা যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন ঠিক সেই সময় স্বেচ্ছা অবসর নেবার সুযোগ আসবে কেন?"

"বেনারাস থেকে হাওড়ায় এই বিশ্বাস বংশের ডেরায় চলে এসেও আমি কিন্তু শান্তি পাইনি, হরিময়বাবু। এই দোতলায় দু'খানা ঘরে টাঙানো প্রপিতামহ বংশগোপালবাবুর ছবি দেখি, আর ভাবি ভদ্রলোক বোধহয় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসার না করলেই ভাল করতেন। নিচের প্রজন্মের সন্তানদের ওপর তোমার নির্দেশের অধিকার আছে স্বীকার করলাম, কিন্তু তোমার বংশধর বলে নিজের খেয়ালে তুমি তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলবে কেন?"

"নির্দেশ থাকলেই মানতে হবে কেন?" প্রশ্ন তুললেন হরিময়বাবু। "কোথাও তো কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।"

হাসলেন বংশগোলাপ। ''সেইটাই তো মুশকিল। প্রপিতামহ চেয়েছেন আমরা ধনী হই, কিন্তু তেমন ধনবান হবার কোনো লক্ষণ তো কোথাও নেই। তবু বাধ্যবাধকতা নেই বলেই, বংশের ঊর্ধ্বতন পুরুষের ইচ্ছের কাছে নতি স্বীকার না করে উপায় নেই। সবচেয়ে মুশকিল বাধায় বংশের গৃহবধূরা। তাদের আশঙ্কা পিতৃপুরুষের ইচ্ছার সঙ্গে ঈশ্বরের নির্দেশও মিশে আছে। অমান্য করলেই বংশের ওপর আবার অকালমৃত্যুর অভিশাপ আসবে। ওই যে পরপর দু'পুরুষে দুটো অঘটন ঘটে গেলো। পিতামহের বিশ্বাস ছিল, স্বয়ং বিশ্বনাথ দেবের আশ্রয়ে থাকার জন্যেই আমার জীবন রক্ষা হয়েছে। মানুষের যে কতরকম বিশ্বাস! কিন্তু কে তাদের বিরুদ্ধে মুখ খুলবে? কে তাদের নিবৃত্ত করবে খামখেয়ালি থেকে? আমি সোজাসুজি বলছি, একমাত্র ছেলের মঙ্গল কামনায় আমি এই বাড়িতে ফিরে এসেছি এতোদিন পরে।''

''ব্যাপারটা সত্যিই ড্রামাটিক, বেশ রহস্যময়। একটা খেয়ালি ব্যাপারও বলতে পারেন,'' মন্তব্য করলেন হরিময়বাবু।

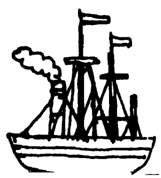
হরিময়ের মনে পড়লো, বংশগোপাল বিশ্বাসকে কিন্তু বার্ধক্যেও কখনও অলৌকিকে বিশ্বাসী অথবা অতিরিক্ত খেয়ালি মন হতো না। ''তিনি যেসব কথা বলতেন তার মধ্যে বেশ যুক্তি থাকতো।''

''তা হলে আপনিও বলছেন? স্রোতে গা ভাসিয়ে, প্রপিতামহ যেসব খেয়ালখুশির নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলো মেনে চলো, তাতে তোমার যা হবার হোক।''

হরিময়বাবু উত্তর দিলেন, '' আপনি বংশগোপালবাবুর দিনলিপির যে অংশটা আমাকে পড়তে দিলেন তার দ্বিতীয় পাতায় একটা ফুট নোট রয়েছে। বংশগোপাল লিখছেন— ''এই শরীর, এই জীবন কি একান্তই আমার নিজস্ব? বংশের কি কোনও ভূমিকা নেই? বংশধারা তো নদীর মতো প্রবহমান। এই বংশধারার মাধ্যমেই সে মহাকালের সঙ্গে মহাদ্বন্দ্বে নিয়োজিত রয়েছে সংসারী মানুষের সমস্ত অহংকার, মৃত্যুঞ্জয়ী হবার মহাসাধ যে তার মনে।''

লেখক এখানে খুব দার্শনিক হয়ে উঠছেন। দিনলিপির এই অংশের সোজা কোনও মানে করতে পারছেন না হরিময়বাবু। কিন্তু পড়তে বেশ ভাল লাগছে।

বংশগোলাপ বললেন, "হরিময়বাবু এ-বাড়িতে ঢুকে আমি বুঝতে পারছি এতোদিন ধরে নিজের বংশের কিছুই জানা হয়নি। আপনার সঙ্গে মাঝেমাঝে বসতে চাই হরিময়বাবু, কিন্তু আজ একটু আপসেট হয়ে আছি। মনটা একটু চঞ্চল।"



ভোরবেলা ভ্রমণ সেরে চমচম সদর দপ্তরে ফিরে এসে পিকলু দেখলো হরিময়বাবু সংসদ অ্যাংলো-বেঙ্গলি অভিধান খুব মন দিয়ে দেখছেন।

"আপসেট কথাটার মানে কি? না ওটা বাংলা হয়ে গিয়েছে?" জানতে চাইছেন হরিময়বাবু।

বই বন্ধ করে হরিময় বললেন, "মন বা হজম বিগড়ে যাওয়া। তাই হয়েছে। ৪২/৩ হিদারাম হালদার লেনের মালিকের—মানসিক আপসেট।"

পিকলু বললো, "রেসের যে ঘোড়া আচমকা বাজি জেতে তাকেও

আপসেট হর্স বলে, হরিময়দাদা।''

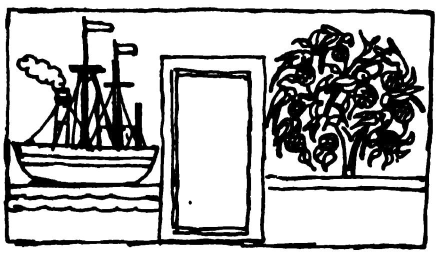
''তাহলে তুমি বলতে চাইছো মানুষের পক্ষে যেটা প্রযোজ্য রেসের ঘোড়ার পক্ষে তা প্রযোজ্য নাও হতে পারে? এ-বিষয়েই তা হলে এবারের চমচমে সম্পাদকীয় লিখবো— ঘোটকলোক ও মনুষ্যলোক!''

এবার পিকুলকে হরিময় বললেন, ''ঘোড়াদের অনেক সুবিধে আছে, সিনিয়র ঘোটকরা অনাগত বংশধরদের জন্যে কোনও নির্দেশ লিখিতভাবে রেখে যায় না। পুওর বংশগোলাপ, একেবার বংশউত্তাল অবস্থায় চলে এসেছেন পত্নী এবং একমাত্র পুত্রসন্তানকে ফেলে রেখে! পিতামহের মৃত্যুকালীন ইচ্ছা অনুযায়ী হাওড়া শিবপুরে বংশবাটিতে ফিরে এসেছেন বংশগোলাপ বিশ্বাস। ওঁর সঙ্গে আবার একটা গোপন সিলকরা খাম ছিল! সমস্ত ব্যাপারটাই রহস্যময়! খামটা টু বি ওপেনড ইন জানুয়ারি নাইনটিন নাইনটি সেভেন ওনলি অ্যাট ৪২/৩ হিদারাম হালদার লেন হাওড়া।

''সেই খাম ১৯১৭ সালের ১লা জানুয়ারিতেই খোলা হয়েছে। এবারেও রহস্যময় নির্দেশ : 'প্রিয় বংশধর, তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, জীবনে যাহাই ঘুটুক, তুমি অবশ্যই আমাদের ভিটা (৪২/৩ হিদারাম হালদার লেন) কোনো অবস্থাতেই কখনও পরিত্যাগ করিবে না। আমার পিতৃদেব বংশগোপাল বিশ্বাস আমাকে লিখিত নির্দেশ দিয়া গিয়াছিলেন যে প্রয়োজনবোধে আমিও পরবর্তী বংশধরদের একই নির্দেশ দিব। আমার অকালপ্রয়াত পুত্র শ্রীমান বংশবিজয়কে এই নির্দেশ দিবার সুযোগ হইতে করুণাময় ঈশ্বর আমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। কিন্তু বহুকষ্টে বুকে বহু আশা লইয়া তোমাকে পুত্রসম লালন করিয়াছি। তাই তোমাকেই বংশের গোপন নির্দেশ পাঠাইতেছি। নির্দেশ বুঝিয়া লইয়া, পত্রপাঠ এই নির্দেশ নষ্ট করিয়া তুমিও একই ভাষায় একই নির্দেশ পত্র লিখিবে এবং এক দশক পরে পরবর্তী বংশধরকে পত্রপাঠের নির্দেশ সিলকরা খামের ভিতর রাখিবে। মনে রাখিবে, নির্দেশ অমান্য করিলে বংশবিলোপের আশঙ্কা। আরও মনে রাখিবে, একদিন আমাদের এই পরিবার পূর্বপুরুষ পূজ্যপাদ বংশগোপাল বিশ্বাসের ইচ্ছাপূরণ করিয়া প্রভূত ধনৈশ্বর্যশালী হইবে।''

চিঠিটা নিজের হাতে নকল করে, আর একটা খামে পুরে, বংশগোপাল হরিময়ের সামনেই আবার ক্যাশবক্সে সযত্নে রেখেছেন, তারপর পিতামহের নির্দেশ মতন তাঁর লেখা চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলেছেন টুকরোটুকরো করে।

হরিময়বাবু ভাবলেন, বহু প্রজন্ম ধরে এই নির্দেশ চলে আসছে হয়তো। বড় বড় ফ্যামিলিতে কত গোপন রহস্যের ধারা এইভাবে প্রবাহিত হচ্ছে তা বাইরের মানুষ জানতে পারে না। জানা উচিতও নয়।



হিদারাম হালদার লেনের রহস্যময় বংশগোলাপ বিশ্বাস ও তাঁর পূর্বপুরুষদের আচরণ নিয়ে শ্রীমান পিকলু অনেক মাথা ঘামিয়েছে। রহস্যটা ক্রমশ যেন ঘনীভূত হচ্ছে।

হরিময়বাবুর সামনে বসে, পিকলু তার পকেট নোটবুকটা বার করে চমচম সম্পাদককে বললো, " পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান, বিশ্বাসদের পরিবারিক রহস্য কিন্তু খুব পুরনো রহস্য নয়। বংশগোপালবাবু হাওড়ার এই সম্পত্তি কেনার পর থেকে কিছু ঘটেছিল অথবা এখনও ঘটে চলেছে। তার মানে, রহস্য সৃষ্টির সম্ভাবিত সময় ১৮৯৭ সাল। কারণ ওই বছর বংশগোপাল বিশ্বাস আচমকা বার্মা থেকে ফিরে এলেন, অকালে প্রথম সন্তান হারানোর পরে।"

"কী যেন নাম ছিল? সব বংশ আর বংশ— নামগুলো একেবারে তালগোল পাকিয়ে যায়," একথা স্বীকার করলেন চমচম সম্পাদক।

তারপর নিজেই বললেন, "অথচ আমরা অসহায়। বাড়িওয়ালার নাম পরিবর্তন করার অধিকার তো আমাদের দেওয়া হয়নি। অম্বুজাক্ষ্য পতিতুণ্ড নাম হলেও চমচমকে তা মেনে নিতে হতো।

"বংশগোপালবাবুর অকালপ্রয়াত জ্যেষ্ঠসন্তানের নাম ছিল বংশমহিমা", মনে করিয়ে দিল পিকলু।

তারপর সম্পাদকের দিকে একটা কার্ড এগিয়ে দিল পিকলু। প্রধান প্রধান চরিত্রগুলির নাম সুন্দর করে পিকলু লিখে ফেলেছে, শেষে একটা নামটা হরিময় ঢুকিয়ে নিতে বললেন —"শ্রীবংশগৌরব বিশ্বাস।"

শ্রীবংশগীত বিশ্বাস

শ্রীবংশগোপাল বিশ্বাস (গল্পের আদিপুরুষ)

শ্রীবংশমহিমা বিশ্বাস (অকাল প্রয়াত)

শ্রীবংশবিনয় বিশ্বাস (বারাণসীতে বাস)

শ্রীবংশবিজয় বিশ্বাস (দাঙ্গার সময় অকাল প্রয়াত)

শ্রীবংশগোলাপ বিশ্বাস (আমাদের নায়ক)

শ্রীবংশগৌরব বিশ্বাস (বিমানবাহিনীতে কর্মরত)

এই কার্ডখানা ভবনাথ সেনকে উপহার দেবে পিকলু। অবশ্যই এমন তালিকা থেকে একখানা জমাটি গল্পের উপাদান পেয়ে যাবেন তিনি।

"নিজেদের নিয়ে কখনই গল্প লেখা যায় না, পিকলু" সাবধান করে দিলেন হরিময়বাবু।

"কেন যাবে না? আজকাল সবই তো হয়," তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলো পিকলু।

পিকলু বললো, "বংশগোলাপবাবুর আপসেট হবার কারণ, তিনি হাওড়ার হিদারাম হালদার লেনের সম্পত্তি বেচবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। একজন পুরনো লোহার ডিলার এবং এ-বাড়ির এক অংশের প্রাচীন ভাড়াটে কারনানির সঙ্গে কথাও বলছিলেন। অথচ বংশগোপাল

বারবার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, এই বংশের হাতে একদিন অনেক টাকা আসবেই। হাওড়া শহরের যত বদনামই হোক সম্পত্তির দাম ক্রমশই চড়ছে, হিদারাম হালদার লেনের জমির পরিমাণ তো কম নয়। আজকে ফিরবার সময় আবার 'পুরাতনী'র মিস্টার ভাবনানির সহকারী সান্যালের সঙ্গেও দেখা হয়ে গেলো। ওঁরও একটা মোটরসাইকেল আছে— বিদ্যাসাগর ব্রিজে নামবার সময় সান্যালের গাড়ি ট্রাবল্ দিচ্ছিল, একটু হেল্প করলাম।"

ওই ভদ্রলোকই পিকলুকে জিজ্ঞেস করলেন, "চমচম আপিস কতদিন এই ৪২/৩ হিদারাম হালদার লেনের ঠিকানায় আছে? সান্যাল জানতে চাইছিলেন, চমচম পত্রিকার সঙ্গে লিজটা কীভাবে হয়েছিল? এ ব্যাপারে আমি কতটা জানি? আমি বলে দিলাম, এ-সব নিখুঁতভাবে একমাত্র জানেন চমচম সম্পাদক। তখন লোকটা জিজ্ঞেস করলো— ইন্দারলুফট্ চৌধুরীটা কে? আমি বললাম, হরিময় এবং ইন্দ্রলুপ্ত একই লোক। টাক পড়ে যাওয়ায় হরিময়বাবু এই সম্পাদকীয় ছদ্মনাম নিয়েছেন। আসল শব্দটা হল ইন্দ্রলুপ্ত— মোদিলুফট অথবা লুফটহানসার সঙ্গে ওঁর কোনও আত্মীয়তা নেই।"

নজর আলী লেনে যখন প্রথম দেখেছিলেন তখনই লোকটাকে ভাল লাগেনি। কোনও কারণ নেই, কিন্তু হরিময়বাবুর কেমন একটা বিপদ-আঘ্রাণশক্তি আছে।

ভবনাথ সেন তো কাউকে সন্দেহ হলেই সোজা হরিময়বাবুর কাছে পাঠিয়ে দেন খুঁটিয়ে দেখে একটা দ্বিতীয় মতামত দেবার জন্যে। সেবার চলচ্চিত্র প্রজোযোক ফল্গু গুহ এলেন, ভবনাথকে অনেক টাকার লোভ দেখালেন ধারাবহিক টিভি প্রোগ্রামের জন্য। কিন্তু হরিময়বাবু লোকটাকে দেখেই অস্বস্তিবোধ করলেন। হরিময়বাবুর হাবভাব দেখে ভবনাথবাবুও যথাসময়ে ফল্গু গুহকে বিদায় দিলেন। তারপর লোক ঠকানোর দায়ে লালবাজারে ধরা পড়ে গেলেন এই ফল্গু গুহ। ভবনাথ ওঁর সঙ্গে চুক্তিপত্র সই করলে উপন্যাসটির সর্বনাশ হতো।

সান্যাল লোকটা হিদারাম হালদার লেনে এতো সময় কাটাচ্ছে কেন? ভদ্রলোক শুধু ম্যানেজার সিং-এর সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করেছেন তা নয়, দোতলায় খবর পাঠিয়ে বোধহয় বংশগোলাপের সঙ্গেও দীর্ঘ সময় ধরে কথা বলেছেন। ফেরার মুখে হরিময়বাবুর সঙ্গে সান্যালের প্রায় হেড্-অন সঙ্ঘর্ষ!

"এই যে সান্যালবাবু, এখানে কী ব্যাপার?" একটু অবাক হয়ে সরল মনে জিজ্ঞেস করেছেন হরিময়বাবু।

সুশীতল সান্যাল প্রথমে হরিময়কে দেখে একটু ঘাবড়ে গেলেন। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে একবার ঢোক গিললেন। অবশেষে বললেন, " এসেছিলাম, যদি কোথাও কোনও পুরনো জিনিস সংগ্রহ করার থাকে।"

"আপনি অ্যান্টিক জিনিস কেনেন? না বেচেন?" সোজাসুজি জিজ্ঞেস করেছেন হরিময়বাবু।

"আমাদের লাইনে কেনাও যা, বেচাও তা মিস্টার চৌধুরী। স্রেফ কমিশনে কাজ আমাদের। আজকাল, কলকাতায় শুধু পুরাতন সামগ্রী কেনার চেষ্টা করি, কারণ আমাদের অনাবাসী মালিক মিস্টার ভাবনানি বলেন, গরিবের দেশ ইন্ডিয়া, এখানে গাঁটের কড়ি ফেলে ন্যায্য মূল্যে অ্যান্টিক কেনবার লোক কোথায়? জানেন, রবিঠাকুরের একটা আংটি উনি ক্যালিফোর্নিয়ায় এক রবীন্দ্রভক্তকে দশ হাজার ডলারে বিক্রি করেছেন! এখানে কিনতে তো একশ ডলারও লাগেনি, যদিও চোরাই জিনিস। এক সুন্দরী মহিলার বিবাহে কবিগুরু নিজের হাতে স্নেহের পাত্রীকে উপহার দিয়েছিলেন।"

হরিময়বাবু হৈ হৈ করে উঠলেন। "লেডি নগেনের একটা আংটি কিছুদিন আগে চুরি হয়ে গেলো, কাগজে দেখেছি।"

"ওই একই হলো," বলে ফিক করে হাসলেন সুশীতল সান্যাল।

এমন লোককে আদর করে ডেকে অফিসের ভিতের বসানোতে পিকলু মোটেই খুশি হলো না। কিন্তু হরিময়বাবু কড়া হওয়ার লোক নন।

সান্যালকে আপ্যায়ন করে হরিময় জিজ্ঞেস করলেন, "বিপ্লবীদের

স্মৃতিবিজড়িত জিনিসপত্রের বাজার ইদানিং কী রকম?"

"ভাল নয়, মোটেই ভাল নয়। দাম হুড়মুড় করে পড়ে যাচ্ছে। সূর্য সেন, রাসবিহারী বসুর ব্যবহার করা জিনিসপত্তর আপনি জলের দামে পেয়ে যাবেন। তবে ইদানিং দাম বাড়ছে নেতাজির— গতমাসে চুপিচুপি একটা ফাউনটেন পেন সরিয়ে দিলাম হংকং-এ দেড় লাখ টাকায়। একটু ধরে রাখতে পারলে দাম দশ লাখে উঠবে। কিন্তু সব কিছু চুপি চুপি করতে হয় এখানে। যদি খবর পায় নেতাজীর পেন বিদেশে চলে যাচ্ছে অমনি একদল লোক হৈচৈ বাধিয়ে দেবে, গভরমেন্টও অর্ডার ইসু করে দেবে, অথচ কেউ গাঁটের কড়ি ফেলে নেতাজীর পেন কিনে ভক্তি দেখাবে না। সায়েবরা কিন্তু অন্যরকম — ওদেশে যত ভক্তি, যত শ্রদ্ধা, তত দাম। এবার ফিস ফিস করে বললেন স্যান্যাল, ভাববেন না শুধু মাল পাচার হচ্ছে, কিছু কিছু মাল বাইরে থেকে আসছেও। নেতাজীর ব্যবহৃত চশমা। ভাবছেন নেতাজীর চশমা তার প্রমাণ কী? আছে প্রমাণ। মিচিকো টাকানাকি বলে এক মহিলার বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে নেতাজী এই চশমা ফেলে এসেছিলেন। পরের দিন নেতাজী চিঠি লিখে লোক পাঠালেন। মিচিকো শ্রদ্ধার সঙ্গে লিখলেন, চশমাটা তিনি স্মৃতি হিসেবে রাখতে চান, তার বদলে তিনি একটা নতুন চশমা গড়িয়ে দিতে চাঁন। নেতাজী লিখে পাঠালেন, রেখে দাও। ভারত যেদিন স্বাধীন হবে সেদিন মিচিকো যেন দিল্লি গিয়ে ওটা জমা রেখে আসে। এই পত্রাবলীও চশমার সঙ্গে থাকছে, অকাট্য যুক্তি হিসেবে। তাছাড়া নেতাজীর চোখের পাওয়ার কত ছিল তার হিসেব টৌকিওর এক ডাক্তারখানায় পাওয়া যাচ্ছে —দুটো হিসেব চমৎকার মিলে যাচ্ছে! ওঁর ব্যবহৃত স্পেশাল চশমা জাপান থেকে লুকিয়ে এখানে চলে এসেছে।"

"তার মানে আপনার কাছে নেতাজীর মহামূল্যবান চশমাটি রয়েছে?" পিকলু সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলো।

"সে কথা সোজাসুজি বলতে পারবো না," এই বলে ফিক করে হাসলো সুশীতল সান্যাল। "আমরা তো নিমিত্তমাত্র, কিছু কমিশন পেয়েই আমরা

সন্তুষ্ট। আমরা কিন্তু নিজের কাছে কোনো অ্যান্টিক রাখতে চাই না।"

সান্যাল এবার বললো, "ভাল জিনিস যদি ধরতে চান এবং ভাল দাম যদি পেতে চান তা-হলে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের, শ্রীশ্রীসারদামণির এবং স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত জিনিসপত্তর সংগ্রহ করুন। বেলুড় মঠের ওঁরা তো আবার সংগ্রহশালা গড়ছেন। কিন্তু কোথায় পবেন মাল? সব তো এধার-ওধার হয়ে গিয়েছে। ওঁরা এখনো তো আমাদের সাহায্য চাইলেন না। ঈশ্বরবুদ্ধি হলেও অনেক সময় সংসারবুদ্ধি হয় না, মিস্টার চাউড্রি।"

সান্যাল বললেন, " হাওড়া তো পুরনো জায়গা। বেলুড়ের এতো কাছে। কিছু যদি ঠাকুরের পুরনো জিনিস কারও সংগ্রহে পাওয়া যায়, ভাল প্রাইস পাবেন।"

হরিময়বাবু বললেন, "আমি মশাই উটকো লোক, তারপর তো ইংরেজ তাড়াতে গিয়ে ছন্নছাড়া জীবন অতিবাহিত করেছি। প্রাণ বাঁচাতে আজ এখানে কাল ওখানে। অ্যান্টিক সংগ্রহ করবো কোথা থেকে? অগ্নিযুগের লোকদের চোখে দেখেছি, তাঁদের গল্পও শুনেছি। ওঁদের পেন, ওঁদের চশমা নিয়ে তখন কে মাথা ঘামায়? ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে বসবাস করছেন তখন তো আমার পূর্বপুরুষ কলকাতা দেখেননি, বিবেকানন্দ যখন বেলুড় মঠ তৈরি করলেন তখনও আমার দাদামশাই শিয়াখালায় কমপাউন্ডারি করেন।"

সান্যাল বললেন, "সত্যি কথাই বলবো আপনাকে। ভাবছেন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণর এবং বিবেকানন্দর জিনিসপত্তর কী করে আমাদের হাতে আসবে! মনে রাখবেন, খোদ বেলুড় মঠে একবার বড় চুরি হয়েছিল, নৌকো করে নদীর ওপার থেকে চোর এসেছিল— সে-সব জিনিস সাবধানে ভেবেচিন্তে হাত ঘোরাতে পারলে অনেক টাকা পাওয়া যায় মশাই। ভক্তরা যথাসর্বস্ব বেচে ওইসব জিনিস কিনে নিজের আত্মার এবং বংশের সদগতি করবেন।"

সান্যালের ভিজিটিং কার্ডখানা রেখে দিলেন হরিময়বাবু। টেলিফোন নম্বর পাল্টেছে কোম্পানির, নতুন নম্বরটা সান্যাল নিজেই লিখে দিলেন।

ভদ্রলোক চলে যেতেই পিকলু কার্ডটা নিয়ে নিজের মানি ব্যাগে পুরলো। বললো, "থাক সঙ্গে, কাজে লাগতে পারে।"

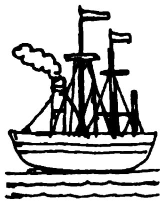
পিকুল যেন রহস্যসন্ধানী ডিটেকটিভের মতন ক্রমশই একটু রহস্যময় কথা বলছে। হরিময়বাবু কিন্তু তাকে ঘাঁটালেন না।

পিকলু বলল, "শেষ পর্যন্ত খারাপ লোকের পাল্লায় না পড়ে যান বংশগোলাপবাবু।"

"কেন?' হরিময়বাবু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।

"না, আমার আশঙ্কা, আর কিছু নয়।" পিকলু শান্ত করতে চাইলো হরিময়বাবুকে।

হরিময় জানালেন, " অনেকখানি সম্পত্তি, পড়ে রয়েছে, অথচ তার থেকে তেমন আয় নেই, মাথায় নতুন আর্থিক মতলব আসতেই পারে। তবে আমি কোনও বাধা দেব না। চমচমকে পঞ্চাশ বছর আশ্রয় দিয়েছেন এঁরা এই যথেষ্ট। শুধু আমার মুশকিল, বংশগোপালবাবু গভীর রাতে একদিন ব্যাক্তিগতভাবে প্রতিশ্রিতি আদায় করে নিয়েছিলেন, কোনও পরিস্থিতিতেই, কোনওদিন চমচম এই ৪২/৩ হিদারাম হালদার লেন ছাড়বে না। প্রতিষ্ঠাতার নির্দেশ এবং প্রতিষ্ঠাতার বংশধরদের অনুরোধ এর মধ্যে সমন্বয় করতে হবে। কিন্তু বংশগোপাল যখন চেয়েছেন এবং স্বপ্ন দেখেছেন তাঁর উত্তরপুরুষরা বিশেষ বিত্তবান হয়েছেন, তখন আমি ওই পথে বাধা হবো না।"



ভবনাথ সেন গত রাত্রে পাক্ষিক সুদর্শনাতে তাঁর ধারাবহিক উপন্যাসের শেষ কিস্তি রচনা করে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন।

শেষ পরিচ্ছদে ভবনাথের মন্তব্য: "পৃথিবীতে যত কাজ আছে তার মধ্যে মেয়েদের মন জোগানো সব চেয়ে শক্ত।"

উপন্যাসের পরিণতিটা দু'রকমভাবে লিখে দশজন পাঠিকার ওপর গোপনে টেস্ট করা হয়েছে, তারপর দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে নায়ক-নায়িকার মধুমিলনটাই মেনে নিয়েছেন ভবনাথ সেন। আজকালকার সুদর্শনারা নগদবিদায় চায়। আগেকার মতন দুঃখময় পরিণতি অকারণে সহ্য করতে রাজি নয় কেউ। তাঁদের মতে, পয়সা দিয়ে দুঃখ কেনার কোনও মানে হয় না।

আজ ঠিক সময়ে সন্ট লেকে দাদুর বাড়িতে পিকলু ও হরিময়বাবু একই সঙ্গে হাজির। শিবপুরের বিশ্বাস পরিবারের ব্যাপারটা কেমন রহস্যময় হয়ে উঠছে। অথচ হরিময়বাবু ব্যাপারটার ওপর ঠিক গুরুত্ব দিতে চাইছেন না।

হৃদারাম হালদার লেনে রাতদুপুরে এবং সাত সকালে যা ঘটছে তার বিবরণ অনেকক্ষণ ধরে ধৈর্য নিয়ে শুনেছেন ভবনাথ সেন। একটা ছোট্ট কার্ডে তিনি কয়েকটা পয়েন্টও লিখে নিয়েছেন পিকলুর স্টাইলে। নোট করবার এই কার্ডগুলো পিকলুই উপহার দিয়েছে।

ভবনাথ মন্তব্য করলেন, "এই প্রপিতামহ বংশগোপাল বিশ্বাসকে এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারা যাচ্ছে না। একদিকে তিনি পয়সা-পয়সা করছেন, অন্যদিকে স্থির বিশ্বাস করে বসে আছেন বংশে একদিন অনেক টাকা হবে। অথচ সেই একই ভদ্রলোক আমাদের চমচম পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে বসতবাটিতে নিত্য সন্ধ্যাবাতি দেবার জন্যে মাসিক পাঁচসিকে ভাড়ায় অনন্তকাল রেখে যেতে চেয়েছেন। ব্যাপারটা রহস্যময়। চমচমের প্রতি ভালবাসা রয়েছে, কিন্তু তার বাইরেও কিছু পরিকল্পনা আছে কী? আবার ভদ্রলোক জেদ ধরলেন, চমচমকে অনন্তকাল এই বাড়িতে প্রায় বিনাভাড়ায় থাকতে হবে, অথচ চমচমকে বাড়িটা দান করেও গেলেন না।"

একটু ভেবে ভবনাথ বললেন, "ভদ্রলোক মরে গিয়েও নানাভাবে তাঁর বংশধরদের ভুতুড়ে নির্দেশ পাঠাচ্ছেন। বলছেন, কিছুতেই শিবপুরের এই ভিটে ছাড়া চলবে না। অথচ লোকটার মনের মধ্যে মস্ত দুঃখ ঘুমিয়ে রয়েছে — মাঝ রাতে ঘুমোতে পারতেন না। বংশগোপাল বিশ্বাসের দিনলিপি পড়ে তো নিশ্চিত মনে হচ্ছে, ঠাকুরের অন্তলীলায় বংশগোপাল উপস্থিত ছিলেন। ব্যাপারটা শঙ্করীপ্রসাদ বসু এবং স্বামী প্রভানন্দ কারও নজরে এখনও পড়েনি। দিনলিপি প্রকাশ হলে হইহই কাণ্ড হবে। তবে বেলুড় মঠ এই দিনলিপির ঐতিহাসিকতা স্বীকার করে নেবে কি না তা এখনও কেউ বলতে পারে না। এঁরা তো ঠাকুরের জীবনকাহিনী প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গের বাইরে যেতে তেমন উৎসাহী নন, এই ব্যাপারটা শঙ্করীবাবুও বুঝে গিয়েছেন। দুর্ধর্ষ ঐতিহাসিক তিনি, কিন্তু ভক্ত হিসেবে শিশুর মতন দুর্বল, অসহায় এবং নির্ভরশীল।"

ভবনাথ বলে যাচ্ছেন: " আরও একটা কৌতূহলের দিক রয়েছে। বংশগোপালের ডাকনাম ললিত— এবং সর্বত্র একটু দেরিতে পৌঁছনোর জন্য ঠাকুরের মহলে কেউ কেউ তাঁকে লেট ললিত বলে ডাকতেন। লেট ললিতের ধারণা হয়েছিল, তাঁর জীবনে অথবা তাঁর বংশে যা ঘটবে তা সর্বদাই একটু লেটে ঘটবে— এবং তার জন্যে প্রয়োজন হবে অশেষ ধৈর্যের।"

ভবনাথবাবু বললেন,"এর মধ্যে যেমন একটু হালকা দিক রয়েছে, তেমন কিছুটা বেদনাও রয়েছে। বিশ্বাস বংশে একের পর এক অকালমৃত্যু। আমার কেন যেন মনে হয়, এই বংশগোলাপবাবু নিজের ইচ্ছেয় বেনারস থেকে কিছুতেই ফিরতেন না। বংশে কোনও বিপদ হতে পারে এই আশঙ্কায় একমাত্র বংশধর শ্রীমান বংশগৌরবের মঙ্গলকামনায় পূর্বপুরুষদের ইচ্ছার কাছে নতিস্বীকার করে তিনি ৪২/৩ হিদারাম হালদার লেনে ফিরেছেন।"

"সাধে কি আর ভবনাথ সেন আমাদের ভবনাথ সেন হয়েছেন। হাতে কলম এবং সেই সঙ্গে কপালে ত্রিনয়ন! আপনি কী করে বুঝলেন, বংশগোলাপ নিজের ইচ্ছেয় বেনারস থেকে হিদারাম হালদার লেনে আসেননি?"

ভবনাথ হাসলেন, "অঙ্ক, হরিময় স্রেফ, থ্রি মাইনাস ওয়ান ইজিকলটু টু।"

পিকলু এবার দাদুর মতামত চাইছে। "ওই যে বংশগোলাপের পিতামহ বংশবিনয় লিখিত নির্দেশ দিয়েছিলেন, ওই যে ওঁর দাদু বলেছিলেন, নাইনটিন নাইটি সেভেনে হিদারাম হালদার লেনে অবশ্যই ফিরতে হবে। এর তাৎপর্য কী হতে পারে?"

"আমি তো ভায়া ডিটেকটিভ নই, যে তড়াং করে অ্যানসার দেব। পরে একদিন তোমার মায়ের বাবার সঙ্গে এবিষয়ে কথা বলতে হবে, তিনি পুলিশের লোক, ওঁর মাথায় কোনও আইডিয়া খেলে যেতে পারে। হাজার হোক সিনিয়র আই পি এস অফিসার— পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এত বড় পোস্টে রয়েছেন।"

হরিময়বাবু বললেন, "নাইনটিন নাইনটি সেভেনের তাহলে তাৎপর্য রয়েছে— সাতচল্লিশ সালের পনেরোই আগস্ট, স্বাধীনতার অর্ধ শতাব্দী উৎসব বলে কথা।"

পিকলু বললো, " আমাদের মনে রাখতে হবে প্রপিতামহ বংশগোপাল বিশ্বাস ছেচল্লিশে দেহ রেখেছেন। তিনি নিশ্চয় স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী উৎসব সঙ্গে নিজের বংশকে জড়াবেন না। এবং তারপরে...."

"কোনও বড় ব্যাপার ঘটেনি, এই তো? পিকলু, তোমার সঙ্গে আমি একমত," বললেন ভবনাথ সেন।

"উ-উ-প! এ যে দেখছি রহস্যরোমাঞ্চ কাহিনীর বাড়া, ভবনাথবাবু। কোথায় যে এর শেষ তাও তো বুঝছি না।" হরিময়বাবু এবার সত্যিই চিন্তিত হয়ে উঠছেন।

ওই যে ঠাকুরের কোনও এক ভক্ত বলতেন, "শুরু যখন হয়েছে তখন শেষও হবে! সুতরাং এখন আর ভেবে কোনও লাভ নেই। আমাদের দেখতে হবে, চমচম কার্যালয়ের যেন কোনও ক্ষতি না হয়।"

হরিময় বিড়বিড় করলেন, "আমার লাইফেও মনে হচ্ছে সব কিছু ঘটে বিলম্বে। বাড়িওয়ালা মারা গেলেন ফর্টি সিক্সে আর লেট করে ফল ধরছে পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে।"

আমাকেও লোকে না লেট হরি নাম দেয়, যদিও চমচমের প্রায় কোনও সংখ্যা লেটে বেরোয়নি।"

ভবনাথবাবুর মাথা আজ ভাল খেলছে— "হরির আগে লেট কথাটা ঠিক মানায় না— তোমার নাম হওয়া উচিত বিলম্ব হরি, অথবা আরও ভাল দেরি হরি!"

"তা বলা যায় স্যার! আমি মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়েছি বাহাত্তর ঘণ্টা দেরি করে। তাও যখন ডাক্তাররা ছুরি, কাঁচি এবং সাঁড়াশি টেবিলে সাজিয়ে ফেলেছেন তখন অনন্যোপায় হয়ে আমি ভূমিষ্ঠ হলাম।"

অকপটে অতীত কথা স্বীকার করছেন হরিময়বাবু।

ভবনাথ সেনের একটা ফাইলের মধ্যে কিছু জেরক্স করা পাতা রেখে গেলেন হরিময়বাবু। লেট ললিত রহস্যটা সমাধান হলেও হতে পারে। আমি নিজে এখন বিকেলে বংশগোলাপবাবুর সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করি। তারপর দেখা যাক কী হয়।

"বিকেলে ব্রেকফাস্ট হয় না, হরিময়দাদা," প্রতিবাদ করলো পিকলু।

"হয় হয়, বিকেল তিনটেয় বিছানা থেকে উঠলে ব্রেকফাস্ট কখন হওয়া

সম্ভব ভাই? এই বিলম্বিত ব্রেকফাস্টের পরে আমি হিদারাম হালদার লেনে বংশবাটির দোতলার পারিবারিক স্টোররুমে কাগজপত্র ঘাঁটি।

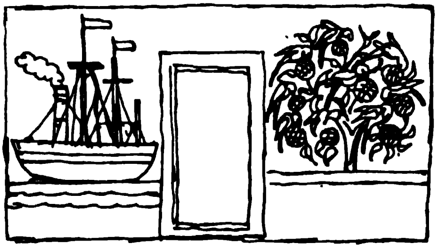
গোড়ার দিকে এ ব্যাপারে বংশগোলাপবাবুর বেশ ব্যক্তিগত আগ্রহ ছিল, এখন দেখছি তেমন আগ্রহ নেই।

পুরনো কাগজ কিন্তু আমাকে ভীষণ টানে। বংশগোপাল বিশ্বাসের বার্মার বিজনেস সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানতে পারছি— ওঁর পার্টনার ছিলেন এক বরকত আলি — সিলেটের লোক। জাহাজ থেকে ঝাঁপিয়ে পেনাং-এ নেমে পড়েছিলেন তিনি।সেখানে সুবিধে করতে না পেরে বার্মায় চলে আসেন ছোট জাহাজে। জ্যেষ্ঠ সন্তানের আকস্মিক অকালমৃত্যুর পরে এঁর কাছেই বংশগোলাপ তাঁর বার্মার বিজনেস বিক্রি করে দেন, যদিও ভদ্রলোক প্রায়ই বংশগোপালকে লিখতেন, দাদা আপনি ফিরে আসুন। দু'ভাই মিলে আবার ব্যবসা করি। কিন্তু প্রথম সন্তানকে অকালে হারিয়ে বংশগোপালের মাথার তখন ঠিক ছিল না।"

বার্মা পেপারস-এর মধ্যে অদ্ভুত কয়েকটা কাগজ পাওয়া গিয়েছে খুব সম্ভত বংশগোপালের প্রথম সন্তানের অকালমৃত্যুর পরে কোনও সময়ে লেখা।

এই কাগজটাই সযত্নে জেরক্স করেছেন হরিময়বাবু। অদ্ভুত এই সৃষ্টি । জওহরলাল নেহরু একবার মার্কিন রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক গলব্রেথকে বলেছিলেন, বিজ্ঞানের সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী দান কোনটা? তারপর নিজেই বলেছিলেন— বাইসাইকেল এবং ইলেকট্রিক বাল্‌বের মতন অন্য কোনো আবিষ্কারই মানুষের এতো কাজে লাগেনি। হরিময়বাবু তার সঙ্গে যোগ করলেন, টেলিফোন আর জেরক্স।

"নকলনবিশি ব্যাপারটা একেবারে হায়েস্ট লেভেলে উঠে গেলো। পাণ্ডিত্যের অন্য মানে হয়ে গেলো।" সাধে কী আর চমচম আপিসে ক্যানন কপিয়ার বসিয়েছেন হরিময়বাবু।



নিজের পড়ার টেবিলে অনেকক্ষণ বসে আছেন ভবনাথ সেন। বংশগোপাল বিশ্বাস চরিত্রটা ক্রমশ তাঁর ঘাড়ে চেপে বসেছে।

বংশগোপালের লেখার হাত ভালই ছিল, কিন্তু নিয়মিত দিনলিপি লেখেননি। মাঝে-মাঝে কলম ধরেছেন। কখনও লেটার প্যাড, কখনও হিসেব খাতায়, কখনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডায়রিতে। কোথাও বেশ স্বচ্ছতা, আবার কোথাও রহস্যময় দৃষ্টিপাত।

সবচেয়ে যা আশ্চর্য কোথাও শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম স্পষ্টভাবে লেখা নেই— অথচ শেষদিনের যে ইতিবৃত্ত ভবনাথ আগে পড়েছেন তা যে রামকৃষ্ণদেব ছাড়া আর কারুর হতে পারে না, এ বিষয়ে শঙ্করীপ্রসাদ বসু এবং হুটকো হালদারের মনেও কোনও সন্দেহ নেই।

হুটকো তো আনন্দে আটখানা। সম্প্রতি একটি অকালপক্ক মার্কিনী ছোঁড়া বহু নোংরা ঘেঁটে ঠাকুরের মানসিকতা সম্বন্ধে বহু কাদা ছড়িয়েছে। এই ছোঁড়াটি নতুন পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার সম্বন্ধে কী বলে তা জানতে পারলে মন্দ হতো না। স্বার্থপরতা ও ভোগসুখের চশমা পরে ভোগে ডুবে আছে পশ্চিমি সভ্যতা। শরীরের দাবির বাইরে তারা অন্য কিছুর উপস্থিতি স্বীকার করতে চায় না।

স্বামী বিবেকানন্দ আর একবার সুস্থ শরীরে ফিরে এলে হয়তো এর কিছু

গতি করা যেতো। ইতিমধ্যে সায়েবরা এবং আধাসায়েবরা এদেশে চেলাচমুণ্ডা জোটাচ্ছে নন্দীভৃঙ্গী নৃত্যের জন্য। এঁরাও বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা এঁটে ঠাকুরের গায়ে, স্বমীজির গায়ে নর্দমার পাঁক ছেটাতে কম উৎসাহী নন। এদেশের সন্ন্যাসী সঙ্ঘের অশেষ ধৈর্য। তাঁরা এসব মুখ বুজে সহ্য করতেই যেন অভ্যস্ত। সে কথা অবশ্য এইসব নিন্দুকরা ভালভাবেই জানেন এবং তার পুরো সুযোগ নিয়ে নন্দীভৃঙ্গীরা মাঝে মাঝে তাণ্ডবনৃত্য চালাচ্ছেন। যোলো আনায় এঁরা সন্তুষ্ট নন, এঁরা চান আঠারো আনা।

আঠারো আনা কথাটা কি আজকাল লোকে বুঝবে? ভাবলেন ভবনাথ। টাকা আনা পাই উঠে গিয়ে বাংলা ভাষা বেশ কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছে— কত কি মজার জিনিস ছিল আমাদের শব্দভাণ্ডারে — কড়া ক্রান্তি, এখন স্রেফ পয়সা। আঠারো আনার জায়গায় একশ বারো ভাগ বললে ব্যাপারটা জমে না। জয় হোক আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ী টাকা আনা পাইয়ের।

রাতের গভীরে বিছানায় আধশোওয়া অবস্থায় ভবনাথ একমনে পড়তে লাগলেন বংশগোপাল বিশ্বাসের আত্মকথা।

কবে কোন্ তারিখে বার্মার কোন শহরের কোন বাড়িতে বসে শতাব্দীরও আগে এই বাংলা লেখা রচিত হয়েছে তা ভবনাথ বুঝতে পারলেন না। তবু পুরনো দিনের হস্তলিপি পড়তে এই বয়সেও রোমাঞ্চ হয় ভবনাথের। কোন্ মানুষের কোন্ কথা কার জন্যে কালের ইশারা অগ্রাহ্য করে আজও বেঁচে রয়েছে লিপির আড়ালে?

ভবনাথ পড়া শুরু করলেন বংশগোপালের রচনা :

"এখন মধ্যরাত। আমার স্ত্রী মনোরমা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। স্বভাবতই আমার চোখে অনিদ্রা— এই রাতের ঘুম আমি নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজেই বিসর্জন দিয়েছি, যিনি কেড়ে নিয়েছেন তাঁকে দোষ দিয়ে কোনও লাভ নেই।

আজ একটু বিলম্বে বিছানায় আশ্রয় নিয়েছিলাম, ফলে প্রথম রাত্রে নিদ্রার পরিমাণও বেশ কম। আসলে বিলম্ব আমার অস্তিত্বে, আমার সমস্ত সত্তায়, না হলে নরেন্দ্র কেন আমাকে লেট ললিত নামকরণ করবে?

প্রলম্বিত, বিলম্বিত জীবনের দুঃখ অনেক। আমি এই বিলম্বের মাশুল ও জরিমানা গুনতে অভ্যস্ত, কিন্তু তার বোঝা যে এখন বিপুল, সুদ যে এমন অবাস্তব তা তো জানা ছিল না যেদিন শ্যামপুকুর স্ট্রিটে আমাদের বাড়ির সামনে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে কয়েকজন বিচিত্র মানুষকে চলমান দেখতে পেলাম। তখন আইন অনুযায়ী আমি সাবালক হয়েছি, কিন্তু নাবালকত্বের মানসিকতা মোটেই ঘোচেনি। এনট্রান্স পাস করে আমি মতিশীল কলেজের ছাত্র বংশগোপাল, পিতা বংশগীত বিশ্বাস, রেলের কেরানি, জননী সৌদামিনী।

৫৫ নম্বর শ্যামপুকুর স্ট্রিটে গোকুল ভট্টাচার্য মশায়ের বাড়ির দোতলায় নতুন ভাড়াটিয়া এসেছে। লোকটি বেশ অসুস্থ— কোনও জবর অসুখ নিশ্চয়, না হলে এতো লোকের উদ্বেগ কেন? একদিন অক্টোবরের সকালে বাড়ির দোতলায় উঠে গিয়ে তাঁকে দেখলাম। ধুতিটি পরা, অবারিত দেহ, দেওয়ালে একটা ছবি কেমন করে টাঙাতে হবে দেখিয়ে দিচ্ছেন কাউকে।

বেশ মনে আছে এক ভক্ত জিজ্ঞেস করলো, "আপনার জন্য মাখন-মারা ঘি আনবো?"

তিনি বললেন, "তা এনো।"

লোকটি জিজ্ঞেস করলো, "স্নানপিঁড়ি আনবো?"

তিনি বললেন, "না না।"

কিছু পরে ওষুধ খাওয়ানোর সময়। এক হিন্দুস্থানি সেবক ওষুধ দেওয়ার আয়োজন করায় তিনি বললেন, "রোগ সারবে কি-না সে খোঁজ নেই শুধু বলে ওষুধ খাও। ও ওষুধ আমি খাব না।"

আমি নিজেও শ্যামপুকুরের বাড়িতে ওষুধ খাবার সময় অমন করি। বুঝলাম, মানুষ ও মহামানুষ এক।

আরও একদিন শ্যামপুকুরের দোতলায় অনধিকার প্রবেশ করেছি।

পাসকরা কোনও বড় ডাক্তার এসেছেন, তিনি রোগী পরীক্ষা করে কাগজে ওষুধ লিখছেন। তিনি এই ডাক্তারকে বললেন, "আরক ওষুধে বাহ্যে হওয়াতে দুর্গাচরণ বলেছিল, ঐ আপনার ধাত।" বিকেলে কিছু ভিড়। ধীরুবাবু বলে গৌরকান্তি একটু মোটা ভদ্রলোক তাঁকে কারও সম্বন্ধে কিছু বলছেন : "মহিন্দরবাবু এত ভক্ত, তবু তাঁর দশ বছরের ছেলে মারা গেল, তাঁর স্ত্রীর মাথায় গণ্ডগোল।" তিনি শুনলেন, কিন্তু কিছু বললেন না, শুধু নীরবে মহিন্দরবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

পরে আরেকদিন এই লোকটিকে তিনি বলেছিলেন, "নাপতে কাল চাই, কাল শুক্রবার।" নিজের অসুখের কথা বললেন, 'টন্‌টন্‌— দুধে কি বেশি বাড়ে বলে?"

আর একদিন সন্ধ্যায় বড় ডাক্তার এসেছেন। আমি দোতলায় উঁকি মেরেছিলাম। দেখলাম রোগী পরম উৎসাহে ডাক্তারদেরই চিকিৎসা করছে। বলছে, "কামিনীকাঞ্চনের উপর ভালবাসা যদি একেবারে চলে যায়, তাহলে ঠিক বুঝতে পারা যায় যে দেহ আলাদা আর আত্মা আলাদা। নারকেলের জল সব শুকিয়ে গেলে মালা আলাদা, শাঁস আলাদা হয়ে যায়।"

আরও চিকিৎসা চললো, তবে রোগীর নয়, ডাক্তারের। তিনি সোজাসুজি ডাক্তারকে বললেন, "কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ আপনাদের পক্ষে নয়।... সন্ন্যাসীর পক্ষে ত্যাগ। ...টাকাও সন্ন্যসীর পক্ষে বিষ...কিন্তু তোমরা জানবে যে টাকাতে ডাল ভাত হয়, পরবার কাপড়, থাকবার একটি স্থান হয়, ঠাকুর সেবা — সাধু ভক্তের সেবা হয়।"

এরপর তিনি স্পষ্ট কথায় বললেন, "জমাবার চেষ্টা মিথ্যা। অনেক কষ্টে মৌমাছি চাক তৈয়ার করে— আরেকজন এসে ভেঙে নিয়ে যায়।"

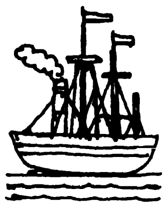
টাকা কিন্তু আমার ভীষণ ভাল লাগে। টাকা থাকলে ভীষণ সুখ, ভীষণ স্বস্তি। সব মৌচাকই বা ভাঙা পড়বে কেন? এ-প্রশ্ন অবশ্য তাঁকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করবার সুযোগ পাইনি। তিনি যা বলেছেন তা যদি সত্য হতো, তা-হলে কলকাতা শহরে এতো ধনী পরিবার থাকতো না। তিনি কি রামদুলাল সরকারের পরিবার, মতি শীলের ট্রাস্টের কথা শোনেননি? যারা

বুদ্ধিমান তারা ধনী হবার পর বিচক্ষণও হয়। আমিও তাই হবো। তখন তিনি বুঝতে পারবেন। আমাকে অবশ্যই তখন ভালবাসবেন, আশীর্বাদ করবেন।

আরও একদিন সকাল এগারোটা নাগাদ এক অদ্ভুতবেশী খ্রিস্টান পাদ্রিকে দেখেছিলাম শ্যামপুকুরে। যদিও সাহেবের পোশাক, ভিতরে গেরুয়া। পরে শুনেছি, ভাইয়ের বিয়ের দিনে সামিয়ানা চাপা পড়ে দু'ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছিল। সেদিন থেকে এই মিশ্রজি সংসার ত্যাগ করেন। তিনি এই ভক্তকে বললেন, "এক রাম, তাঁর হাজার নাম। খ্রিস্টানরা যাঁকে গড বলে, হিন্দুরা তাঁকেই রাম, কৃষ্ণ, ঈশ্বর— এই সব বলে।"

আরও একদিন, কৃষ্ণাদ্বাদশীর সন্ধ্যা। ডাক্তার পরিবর্তনের আশঙ্কা অনুমান করে তিনি বেশ আপত্তি জানালেন। "রাজবৈদ্যর পর হাতুড়ে!" তাতেও মন ভরলো না বোধ হয়, আরও বললেন, "এযেন মুণ্ডী পায়েসের পর ডাঁটা চচ্চড়ি!"

কিন্তু তাঁর রোগ বাড়তির দিকে। শুনলাম, কাশীপুরে আরও খোলামেলা একটা বাড়ির ব্যবস্থা হয়েছে। শ্যামপুকুরে শায়িত অবস্থায় তিনি শুনলেন, ঐ বাগানবাড়ির ভাড়া মাসিক আশি টাকা। এই শুনে ডিসেম্বরের সেই সন্ধ্যায় তিনি আঁতকে উঠলেন। "আমার জন্যে আশি টাকার বাড়িতে কাজ নেই বাপু— যা থাকে কপালে, বরঞ্চ দক্ষিণেশ্বরেই চলে যাই।" পরের দিন বোধ হয় শুক্রবার, ঘোড়ার গাড়িতে চেপে আমার সামনে দিয়ে তাঁর চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু আমি লেট ললিত। যখন মতি শীলের কাজ সেরে নিজের বাড়ি ফিরলাম তখন তিনি আর আমার শ্যামপুকুরের পড়শি নেই।"



দিনলিপির এই পর্যন্ত পড়ে ভবনাথ সেন বিস্ময়ে আবিষ্ট। দিনলিপিটি পাশে রেখে তিনি ভাবলেন, অন্ত্যলীলার অন্য বিবরণগুলি কোনও বই থেকে বার করে মিলিয়ে নেবেন। পরে মনে হলো, প্রয়োজন নেই। একটা কপি করে বরুণ মহারাজের কাছে বেলুড় মঠে পাঠিয়ে দিলেই চলবে। তিনি তো অতি যত্নে, অশেষ ধৈর্যের সঙ্গে ঠাকুরের শেষ কদিনের সমস্ত বিবরণ একত্রিত করেছেন। বরুণ মহারাজের মতামত পেলেই মনটা শান্ত হবে ভবনাথের।

ভবনাথ সেনের মশারি টাঙাতে এসে পিকলুর ঠাকুমাকে ফিরে যেতে হলো। লেখার মধ্যে মজে রয়েছেন তিনি।

স্ত্রীকে ভবনাথ বললেন, "মশা দু-একটা আসে আসুক, কিন্তু ইতিহাসের কী রসিকতা দেখো। দু-একটা ঐতিহাসিক চরিত্রকে বেমালুম গাপ করে দিয়ে আবার যথাসময়ে উগরে দিতে পারে। লেট ললিতের নাম ভক্তদের মুখে মুখে ফিরতে পারতো, কিন্তু আমরা কেউ তাঁর নামই শুনিনি।"

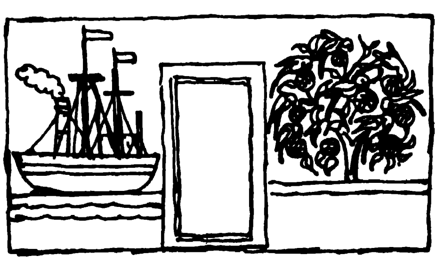
লেখাটা আরও একটু পড়ে নিয়ে ভবনাথবাবু বললেন, "লেট ললিত ইতিহাসের খুব কাছাকাছি রয়েছেন, কিন্তু এটা স্পষ্ট যে মহা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়বার সাহস তাঁর নেই। একটু নজরে পড়লে ঠাকুর হয়তো এই ললিতকে সন্ন্যাস দিতেন, দেখিয়ে দিতেন মোহমুক্তির সহজ পথ।"

এরপর গিন্নিকে ভবনাথ বললেন, "খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে বংশগোপাল বিশ্বাসের পাণ্ডুলিপিটা পড়তে হবে; একটু সময় লাগতে পারে। মশারি থাক, ওডোমস আনো, একটু পায়ে মেখে নিই মহিলা মশাদের খপ্পরে না পড়বার জন্যে। পুরুষ মশা কামড়ালে যন্ত্রণা হয়, কিন্তু ম্যালেরিয়া ধরে না!"

ভবনাথ লক্ষ্য করলেন, বংশগোপালের হাতের লেখা বেশ পরিণত। বাংলা তো বেশ ঝরঝরে। সেই যুগেও চলতি বাংলাটা ভালই আয়ত্ত করেছিলেন ভদ্রলোক।

এইসব দিনলিপি প্রকাশের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা লেখকের ছিল না, থাকলে দিনলিপিটি সাধু ভাষায় রচনা করতেন। মনে রাখতে হবে রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বেঁচে রয়েছেন, বিদ্যাসাগরও তখনও বহাল তবিয়ত। তাঁর মৃত্যু বোধহয় ১৮৯১ সালে।

ভবনাথ আবার বংশগোপালের শতাব্দীপ্রাচীন দিনলিপি রসিয়ে রসিয়ে পাঠ করতে লাগলেন।



"সর্ব বিষয়েই আমি লেট। আমার লেট ললিত নাম মিথ্যা নয়, কারণ শ্যামপুকুর থেকে বিদায়কালে আমি উপস্থিত থাকলাম না, আমি এবারও লেট।

ঘুরতে ঘুরতে পুরনো রাস্তার ওপরে আর তাঁর এক ভক্তর সঙ্গে দেখা হলো। শুনলাম, ডাক্তারের পরামর্শেই এই স্থান পরিবর্তন। তাঁর দক্ষিণেশ্বরেই ফিরে যাওয়ার বিশেষ ইচ্ছে ছিল। কিন্তু মথুরবাবুর পুত্র ত্রৈলোক্যনাথ উৎসাহ দেখানো তো দূরের কথা, অসহযোগিতা করেছেন। অনুমতি আসেনি।

মাস মাস আশি টাকা ভাড়া কাশীপুরে গোপাল ঘোষের বাগানবাড়ির। ভক্তদের মধ্যে চাঁদা তোলার কথা উঠছিল। আমি সামান্য লোক, রোজগার নেই। কোথা থেকে চাঁদা দেবো? তিনি নাকি শেষ পর্যন্ত ধনী ভক্ত সুরেন্দ্রকে ডেকে বলেছেন, "দেখ সুরেন্দর, এরা সব কেরানি-মেরানি ছাপাষো লোক, এরা এতো টাকা চাঁদা তুলতে পারবে কেন... বাড়ি ভাড়ার টাকাটা তুমিই দিও।"

একদিন খুঁজে খুঁজে কাশীপুরের উদ্যান বাড়িটা দেখে এসেছি। ৯০ নম্বর কাশীপুর রোডে প্রাসাদোপম অট্টালিকা। দোতালায় রোগজীর্ণ শরীর নিয়ে তিনি শায়িত। কাশীপুরে প্রচুর মশা। একটা মশারি টাঙানো।

আমি যখন তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম তখন একজনকে তিনি বলছেন, "কাশি, কফ, বুকের টান এসব নেই। তবে পেট গরম। ঘরেই পায়খানার ব্যবস্থা করতে হবে। বাইরে যেতে পারবো বলে মনে হয় না।"

এখানে তাঁর সেবকের অভাব নেই। একজন আধাবাংলা আধা হিন্দিতে বলে উঠলো: "যে আজ্ঞে মশাই, হামি তো আপনার মেথর হাজির আছি।" শুনলাম, আমাশয়ের পুরনো রোগ তাঁর, পেটের এ রোগ সারে না।

"সেদিন শ্যামপুকুরে বাড়ি ফেরার জরুরি টান ছিল। ভাবী শ্বশুরমশায় খোঁজ-খবর করতে আসবেন শ্যামপুকুরে। রোজগার নেই, পাতি নেই, কিন্তু প্রবল বিবাহ সম্ভাবনা! জন্মমৃত্যুবিবাহের সঙ্গে কর্মের বা উপাজর্নের কোনও সম্পর্ক এদেশে নেই। তবু গৃহী মানুষের সুখের সংসারের জন্যে টাকা তো চাই— ধনী হওয়া ছাড়া কলিকালের মানবজন্ম বৃথা। এই নির্মম সত্যটুকু অসুস্থ মানুষটি কেন বোঝেন না?

কয়েক সপ্তাহ কাশীপুরের কোনও খোঁজখবর নেওয়া হয়নি। সোমবার, ১৪ পৌষ হঠাৎ আমার টনক নড়লো। তাঁর খবরাখবর নেওয়ার ইচ্ছে প্রবল হলো। ওখানে ভক্তজনের অভাব নেই। কিন্তু আমি চাঁদা দিই না, সংসারত্যাগের চিন্তা করি না, আমাকে কেউ তেমন পাত্তা দেয় না, নরেন্দ্র ছাড়া। তাকে আমার ভীষণ ভাল লাগে। সে আমার মনের মানুষ। কিন্তু তারও হাজার রকম দুঃখ।

শীতের পড়ন্ত অপরাহ্ণে কয়েকজন ভক্ত কাশীপুর উদ্যানবাটির প্রাঙ্গণে গল্পগুজবে ব্যস্ত। আলোচনার মধ্যমণিকে যেন থিয়েটারে একবার দেখেছি। স্টেজে গিরিশ দর্শনে টাকা লাগে, এখানে ফ্রি। এঁরা প্রতাপ হাজরাকে নিয়ে রসরসিকতা করছেন। হাজরা নাকি ঠাকুরের দেশের লোক, নিজের সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা— নরেন্দ্রর ষোল আনা সত্ত্বগুণের তুলনায় হাজরার নাকি আঠারো আনা এবং তাঁর মাত্র বার আনা— 'এই হচ্ছে লালচে মারছে।' এই হাজরা আবার নরেন্দ্রের 'ফেরেন্ড'!

কে যেন ফাঁস করলো, তিনি নাকি হাজরার সম্পর্কে নিজেই মন্তব্য করেছেন। "দক্ষিণেশ্বরে বসে হাজরা জপ করতো, আবার ওরই ভিতর থেকে দালালির চেষ্টা করতো, বাড়িতে কয়েক হাজার টাকা দেনা আছে সেই দেনা শুধতে হবে।"

প্রতাপ হাজরার চরিত্রটি আমার মোটেই খারাপ লাগছে না। মানুষকে তো টাকা রোজগার করতে হবেই। সবাই তো বলরাম বসুর মতন টাকার বিছানায় জন্মগ্রহণ করে না। সবাই তো রাম দত্তের মতন মেডিক্যাল কলেজে বসে বিদ্যে ভাঙাতে পারে না।

আমি এরপর চুপি চুপি ওপরে উঠে গিয়েছিলাম। বুড়োগোপাল তাঁকে ওষুধ দিচ্ছেন। কবিরাজি ওষুধের নাম নাকি হরিতালভস্ম। তাঁকে গয়ার ফেলতে বারণ করলেন সেবক বুড়োগোপাল। তিনি বললেন, "একটা জানলা খুলে দাও।"

ওষুধ খেয়ে তিনি এবার কথা বলতে লাগলেন। রুজিরোজগারের কথা। আমি জানতাম না এসব। তিনি বলছেন, "কম বয়সে দেশে ছোট ঠাকুর

গড়তাম, আবার পাঁচ আনা ছয় আনা দামে বিক্রি করতাম।" হিন্দুস্থানী লোকটি বললো, "চৈতন্য মহাপ্রভুও বাজার করতেন, থোড় কিনতেন।" তিনি বললেন, "আবার ছবি আঁকতুম, পুতুল গড়তুম। কলসুদ্ধ হাত পা নড়ছে এইসব।" তিনি আমাকে অবাক করে দিলেন, গোপালকে বললেন, "আবার ইটের কাজও জানতুম।"

ফেরার পথে সেদিন নরেন্দ্রর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। অতি উৎসাহে তিনি বলেছিলেন, "কাল ইংরিজি নববর্ষ, সকাল-সকাল এসো। সকালের দিকেই ওঁর শরীরটা একটু ভাল থাকে।"

"সকাল সকাল এসো। কিন্তু আমি তো লেট ললিত! ১লা জানুয়ারি শুক্রবার কী অঘটন ঘটে গেলো কাশীপুরে, আমি আগাম খবর পেয়েও কিছু করলাম না। আমি তখনও নিজের খেয়ালে চলেছি। অর্থ উপার্জনের আশায় কিছু তালপাতার টুপি এবং বাঁশি বিক্রি করেছি কাশীপুরেই এক চার্চের সামনে দাঁড়িয়ে। মনে পড়লো, তাঁর নতুন বাসস্থানের কাছে একটা মদের দোকানও আছে। সেখানেও আজ নববর্ষে তালপাতার টুপি পরে বাঁশি বাজাবার খরিদ্দার পাওয়া যেতে পারে! আমি সেদিকে এগোলাম।

আমার বিক্রি এবং লাভ আজ ভালই হচ্ছে— আমায় তখন অর্থের পুরোপুরি নেশা চেপে ধরেছে।

যে ক'টা বাঁশি ও টুপি এনেছিলাম সব শেষ। আমি তাড়াতাড়ি ছুটেছি শ্যামবাজারে, দ্বিতীয়বার পাইকিরি হারে টুপি এবং বাঁশি কেনবার জন্যে। কলকাতার রাস্তায় সত্যিই টাকা উড়ছে, ধরতে জানলেই হলো।

আমার কাউকেই দোষ দেওয়ার নেই। কাশীপুরের বাড়ির পাচক গাঙ্গুলি মশাইকে মদের দোকানের সামনে দিয়ে যেতে দেখলাম। তিনিই খবরটা দিলেন। "এখানে কী করছেন? ও বাড়িতে যান। ভীষণ কাণ্ড চলেছে। হরির লুট বলতে পারেন— যে যা চাইছে কর্তা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকেই তা দিয়ে দিচ্ছেন। আমি চলেছি আমরা ছোট ছেলেটার খোঁজে। ওকে পাকড়াও করে এনে ওঁর সামনে বসিয়ে দিতে পারলে একটা হিল্লে হয়ে

যাবে।"

কল্পতরু কথাটা সেই প্রথম শুনলাম। ভালমন্দ যে যা প্রার্থনা করে কল্পতরু তাকেই নির্দ্বিধায় তা দেয়। কী চাইতে হবে তা কিন্তু কেউ বলে দেবে না, সে দায়িত্ব তোমার নিজের।

পাচক গাঙ্গুলিমশাই তাঁর ছোটছেলেকে নিয়ে উদ্যানবাটিতে ফেরবার পথে বললেন, "এখনও লেট করছেন!" গাঙ্গুলি জানে না, আমার ডাকনাম লেট ললিত।

আমি বললুম, "টুপি ও বাঁশি বিক্রির স্টক প্রায় শেষ। আর দুটো মাতাল ধরে কিছু গছিয়ে দিতে পারলেই টুপির স্টক থাকবে না।" আমার মাথায় আসলো না, উদ্যানবাটিতে যাঁরা আজ তাঁকে দেখতে আসবেন তাঁদের মধ্যে গিরিশবাবু এবং তাঁর ভাই অতুলবাবু থাকবেন। এঁদের খেয়াল চাপলে সমস্ত টুপি কিনে নিয়ে হয়তো তাঁকেও পরানো যেতো। আমার আনা টুপি পরে তাঁর আনন্দমেলা! ভাবা যায় না।

গাঙ্গুলি পাচক সবটা জানেন না। তিনি বললেন, "তিনি আজ বেশ সুস্থ বোধ করায় বাগানে বেড়াবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। পতিতপাবন হয়ে আজ যে যা চাইবে তাকে তাই দেবেন তিনি।" গাঙ্গুলি পরম উৎসাহে আজও জানালো, দোতলায় দেবেন মজুমদারের মামা হরিশ মুস্তাফি উঠেছিলেন দর্শনের জন্য। তিনি কাছে ডেকে শ্রীচরণ দিয়ে হরিশের বক্ষ স্পর্শ করলেন। দিব্যস্পর্শে সে এক অদ্ভুত কাণ্ড! বিকেল তিনটের সময় তিনি নীচে নেমেছেন এবং দোকানে আসবার পথে গাঙ্গুলি পাচক দেখেছেন, জন তিরিশেক ভক্ত বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপ করছে।

তাঁকে আজ বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছে। গায়ে সবুজ বনাতের জামা, লালপেড়ে ধুতি, সবুজ কাপড়ের টুপিতে কান পর্যন্ত ঢাকা। পায়ে মোজা পরেছেন, আর লতাপাতা আঁকা চটিজুতো। তাঁর জুতোর শখ অনেক দিনের।

বোঝা গেলো, তাঁর সঙ্গে গিরিশের বিরাট কিছু একটা হয়ে গিয়েছে।

কারণ বাংলার সেক্সপীয়র গিরিশ শিশুর মতন কাঁদছেন অভাবনীয় আশীর্বাদ পেয়ে।

তারপর হুড়োহুড়ি লেগে গিয়েছে। রামবাবু তার প্রিয়জনদের ডাকাডাকি শুরু করেছেন।

ভিড়ের মধ্যে উপেনকেও দেখা গিয়েছে, সেই উপেন মুখুজ্যে যে ধনী হতে চাইছে অনেকদিন থেকে, বটতলায় একটা বইয়ের দোকান করেছে। কোনওক্রমে চলে। তার আগে শিশিবোতল ধুয়ে জীবিকানির্বাহ করতো। উপীন পরে বসুমতী প্রকাশ করে মহাধনী হয়েছে।

গাঙ্গুলি এবার ছুটলো তার রান্নাঘরের দিকে। আর আমি বোকার মতন আরও লেট করলাম। উদ্যানের প্রাঙ্গণে শেষ টুপিটা যেন বিক্রি হতেই চায় না। মাতালেরা বোধহয় তিনটের পরে কেনাকাটা কমিয়ে দেয়!

মূর্খ আমি, যখন দায়মুক্ত হলাম তখন ভাঙা হাট। বেশ দেরি হয়ে গিয়েছে।

বেলেঘাটার হারাণচন্দ্র দাস ফিনলে কোম্পানিতে কাজ করেন। চাকরির উমেদারির সূত্রে আমার মুখ চেনা। তিনি বললেন, "আজ মহাদিনে আমার মহাভাগ্য। তিনি আমার মাথায় পা রেখেছেন!" তাঁর ভাইপো রামলালও প্রভুর স্পর্শ পেয়ে আনন্দে অধীর। যা পাওয়ার তা সে পেয়ে গিয়েছে।

লেট ললিত আজ সত্যিই লেট! ভক্তরা এখন অদৃশ্য। ত্যাগী সন্তানরা যাঁরা পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা বোধ হয় ওই মহাসময়ে কেউ উপস্থিত ছিলেন না।

থাকবে কী করে? সারারাত প্রভুর সেবা ও সাধনভজন করে নরেন্দ্র তখন ঘুমুচ্ছে সারা দুপুর ধরে। যখন ঘুম ভাঙলো, তখন শুনলেন তিনি আজ কাউকে বঞ্চিত করেননি।

শুধু হরমোহনকে রামদত্ত মশাই যখন প্রভুর সামনে আনলেন, তখন তাঁর বুকে হাত দিয়ে হঠাৎ তিনি 'আজ থাক', এই বলে ছেড়ে দিলেন। মনে হয় ঠাকুরের কোনও আপত্তি ছিল। এই হরমোহন মিত্রকেই নরেন্দ্র সাদরে

হারমোনিয়াম বলে ডাকতেন। একসময় ঠাকুর তাঁকে খুব স্নেহ করতেন, কিন্তু পরে বিয়ে করে সংসারী হওয়ায় তাঁর বোধ হয় ভাল লাগেনি।

এর পরে প্রতাপ হাজরা মশায় ছুটতে ছুটতে উপস্থিত। মহাসময়ে তিনি উপস্থিত ছিলেন না। এই হাজরাকেই যুবকরা ঠাট্টা করতো, নরেন্দ্রর ফেরেন্ড।

শুনেছি একসময় হাজরার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি তাঁকে দিয়ে পদসেবা করাতেন। জাতিতে সদ্‌গোপ এই প্রতাপ হাজরার মনে প্রবল ধন-কামনা ছিল। আজ কিন্তু হায় হায় করছেন হাজরা। অগত্যা নরেন্দ্র দোতলায় উঠে গিয়ে তাঁর জন্য প্রভুর কৃপাস্পর্শ ভিক্ষা করলেন। কিন্তু হতাশ হয়ে ফিরতে হল তাঁকেও। হাজরাকে কৃপাবিতরণে তিনি এখন রাজি নন।

"সময়সাপেক্ষ কাজ, শেষে পাবে!" এই বলেছেন তিনি। এই হাজরাকেই নরেন্দ্র প্রায়ই 'থাউজেন্ডা' বলে ডাকতেন। কৃপা না পেলেও প্রতিশ্রুতি থেকে বঞ্চিত হলেন না হাজরা। হাজরার শেষ সময়ে ইষ্টদর্শন হবে এই প্রতিশ্রুতি দেন তিনি, নরেন্দ্র জোর করায়।

আমাকে নতমস্তকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নরেন্দ্র দুঃখ পেলেন। আমি সময়মতন এখানে আসিনি শুনে বকুনি দিলেন। দুঃখ করলেন, "প্রভু আর রাজি নন, তাঁর শরীর মোটেই ভাল নয়।"

ভবনাথবাবু এবার বিছানা থেকে উঠে পড়ে র‍্যাক থেকে একখানা ছাপানো বই নামালেন। তারপর নিজের মনেই বললেন, "একসাইটিং! কল্পতরুর দিনে অকাতরে করুণা বিলোতে গিয়ে ঠাকুরের কী হয়েছিল তা দেখা যাক আদিগ্রন্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি থেকে : লেখক ঠাকুরের গৃহীভক্ত অক্ষয়কুমার সেন, জোড়াসাঁকোয় ঠাকুর বাড়িতে পড়াতেন বলে যাঁকে সবাই অক্ষয় মাষ্টার বলতেন। কল্পতরু দিবসে এই অক্ষয়কুমারের কানে মন্ত্রোচ্চারণ করেন। তাঁর মহাসমাধির দিনেও তিনি কাশীপুরে উপস্থিত ছিলেন। দেখতে কালো বলে বিবেকানন্দ এঁকে বোধ হয় 'শাঁকচুন্নী' বলে

ডাকতেন, আর গিরিশচন্দ্র বলতেন, 'সাঁওতাল'। এই অক্ষয়কুমার বসুমতী সাহিত্যমন্দিরে উপেন মুখার্জির কাছেও কাজ করতেন।

বই তুলে ভবনাথ পড়তে লাগলেন :

"পাকশালে গিয়া দেখে রাঁধুনী ব্রাহ্মণ।
রুটি বেলিবার তরে করে উপক্রম।।
উপাধি গাঙ্গুলী তাঁর নাম নাহি জানি
গিরিশ ভগনিতে তাঁরে করে টানাটানি।।
ভাগ্যবান শ্রীগোচরে হইল আগত
পাইল প্রভুর কৃপা আশার অতীত।।
রাশি রাশি কৃপা ঢালি প্রভু ভগবান।
উপরে দ্বিতল ভাগে করিলা পয়ান।।
নিম্নতলে ভক্তদের আনন্দের মেলা।
এখানে শ্রীঅঙ্গে ওঠে নিদারুণ জ্বালা।।"

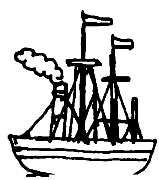
ভবনাথ সেন আশ্চর্য হয়ে বললেন, "অদ্ভুতভাবে মিলে যাচ্ছে। হরিময়বাবু ব্যাপারটা শুনলে হয়তো কাঁদতে শুরু করতেন!"

আরও একটু অংশ নিজের মনেই পড়ে ফেললেন ভবনাথ :

"শ্রীঅঙ্গেতে জ্বালা কেন শুন বিবরণ।
যে সে পাত্রদের আজি করিলা মোচন।।
তে সবার জীবনের যত পাপভার।
সফল হইলা প্রভু অঙ্গে আপনার।।
সন্নিকটে রামলাল কন প্রভুরায়।
শালাদের পায় হয়ে অঙ্গ আপনার।।
করেছে কতই পাপ কিছু নাহি বাকি।
দেরে এনে গঙ্গাজল সব অঙ্গে মাখি।।"

"অতি মূল্যবান ডকুমেন্ট এই বংশগোপাল বিশ্বাসের দিনলিপি। শঙ্করীপ্রসাদবাবুর হাতে গেলে তিনি খুবই খুশি হবেন— বৈকুণ্ঠ সান্যাল মশায়ের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবেন। এই সান্যাল মশাই চিৎকার করে কল্পতরুর দিনে ডেকেছিলেন, "কে কোথায় আছিস, এই বেলা চলে আয়।"

ভবনাথ লক্ষ্য করলেন, বংশগোপালের শেষ লাইনটা খুবই দুঃখের। "ডাক পেলাম সময়ে, অথচ হাজির হলাম দেরিতে। এই আমার ভাগ্য। কিন্তু তিনি তো অনন্ত প্রেমময়, তিনি নিশ্চয় আমাকে দেবেন, বড়জোর একটু বিলম্বে। এই বিলম্ববিহারী কী চায় তা তো তাঁর অজানা থাকার কথা নয়।"



পিকলু পরের দিনই ৪২/৩ হিদারাম হালদার লেনে চমচম অফিসে হাজির হয়েছে। এখানে এসে সে বেশ আনন্দ পায়। মুম্বাইতে সব কিছুই মডার্ন, পুরনো কিছুর গন্ধই খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রাচীনের আস্বাদ পেতে হলে মুম্বাই থেকে ছুটতে হবে পুনায়।

কিন্তু হরিময়বাবু মুম্বাই বলতে অজ্ঞান। সুযোগ পেলে তিনি চমচমের বম্বে আপিস খুলবেন। "ওখানে অফিস নিয়ে কী করবেন?"

"অতশত জানি না, বিভিন্ন জায়গায় অফিস না হলে একটা কাগজ ঠিক জমে না।" এটাই হরিময়বাবুর সুচিন্তিত অভিমত।

পিকলু বললো, "বংশগোপাল বিশ্বাসের দিনলিপি পড়ে দাদু খুব অনুপ্রেরণা পাচ্ছেন। আজ বললেন, "ভেরি ইন্টারেস্টিং চরিত্র এই বংশগোপাল এলিয়াস লেট ললিত। লেট হওয়াটাই এঁর জীবনে প্রধান বাধা— কিন্তু এখনও সবটা বুঝতে পারছি না। বংশধরদের ওপর বংশগোপাল অমন খেয়ালি নির্দেশ দিয়ে গেলেন কেন তা এখনও পরিষ্কার হচ্ছে না। বংশধরদের কারও ওপর তো কোনও রাগ নেই— বরং বড় ছেলে এবং একমাত্র নাতিকে অকালে হারিয়ে প্রবল মনোকষ্ট পেয়েছেন, যদিও নিজে তিনি দীর্ঘজীবী হয়েছেন।"

হরিময়বাবু বললেন, "আরও একটা পয়েন্ট বোধহয় প্রপৌত্র বংশগোলাপকে জিজ্ঞেস করা উচিত। যে মানুষটি ঠাকুরের এতো কাছাকাছি এলেন তিনি প্রকাশ্যে কেন রামকৃষ্ণ অনুরাগীদের সঙ্গে মেশামিশি করলেন না? হাওড়ায় খবরটা রটলে তখনই শঙ্করী বোসের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমে ঠাকুর সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করতে ভক্তরা অবশ্যই তাঁকে টেনে নিয়ে যেতো। ঠাকুরের ভক্তরা একটু অদ্ভুত শ্রেণীর— যতো তাঁর কথা মুখ বুজে শোনেন ততো তাঁদের তৃষ্ণা বেড়ে যায়। রামকৃষ্ণতৃষ্ণার নিবৃত্তি নেই। থার্টি ফর্টি ইয়ার্স ধরে প্রতি শনিবার ঠাকুরের কথা স্বামীজীর কথা এক নাগাড়ে শুনে যাচ্ছেন, কিন্তু অরুচি নেই। প্রশ্ন করলেই ওঁদের মুখে হাসি— ভাতে কখনও অরুচি হয়? অন্ন যে ব্রহ্ম!"

পিকলু বললো, "আপনি ও বিষয়ে রিসার্চ করুন হরিময়দাদা। দাদু আমাকে পাঠাচ্ছেন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। ঠাকুরের জীবনের শেষদিন সম্বন্ধে কয়েকটা খবরাখবর দ্রুত জোগাড় করতে হবে।"

পিকলু বেরিয়ে যেতেই বংশগোলাপবাবুর সঙ্গে হরিময়ের যোগাযোগ হলো।

হরিময়বাবু আশ্বস্ত করলেন, "এটর্নি অমল সেনের সঙ্গে দেখা হলো। ওঁর বেয়াইবাড়ি থেকে মঠ মিশনের আদি দলিল ড্রাফট হয়েছিল। উনি

বললেন, একটা কাগজে কেউ কিছু লিখে গেলেই সে নির্দেশ বাইন্ডিং হয় না। আপনি যা খুশি করতে পারেন এই হিদারাম হালদার লেনের সম্পত্তি নিয়ে।"

বংশগোলাপবাবু কিন্তু পরামর্শ পেয়ে সন্তুষ্ট হলেন না। বললেন, "মশাই, আপনি কিছুই বোঝনে না। আদালতের ভয়ের শতগুণ ভয় বংশবিনাশের। একবার নয় দু'বার আচমকা ভয়ঙ্কর ট্রাজেডি হয়ে গিয়েছে এই পরিবারে।"

বংশগোলাপবাবু নিজেই এবার একটা প্রাইভেট ট্যাক্সি ভাড়া করে বেরিয়ে পড়লেন বিকেলে।

"ভাল গ্রন্থাগার অনেক রাত্রি পর্যন্ত কোথায় খোলা থাকে?" জানতে চাইলেন।

যাবার আগে তিনি দুঃখ করলেন, "লাইব্রেরি খুলে রাখার দরকার এই শহরের কর্তারা অনুভব করেন না, ফলে গ্রন্থাগার বেশি সময় খোলা থাকে না। আপনারা চাইছেন দেশটা বোস্টন হয়ে যাক, সব গ্রন্থাগার সারারাত খোলা থাকুক।" "আপনি বরং ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে যোগাযোগ করুন।"

সন্ধ্যের দিকে কোথা থেকে বংশগোলাপবাবু শিবপুরের চমচম অফিসে ফোন করলেন। "একজন ভাল ডেন্টিস্টের খবর দিতে পারেন?"

হরিময়বাবু ফোনে বললেন, " অবশ্যই পারি। এতো বড় এমার্জেন্সি আর নেই— হাড়ে হাড়ে বুঝেছি বিভিন্ন সময়ে দন্তহর্ষ, দন্তশর্করা, দন্তোভেদ এবং দন্তশূল থেকে। প্রতিবারই প্রাণ রক্ষে করেছেন ডাক্তার বারীন রায়।"

"টেলিফোন নম্বরটা একটু খাতা থেকে দেখে দেবেন?"

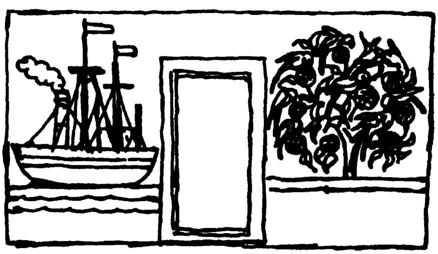
"খাতার দরকার নেই— নম্বরটা সারাক্ষণ মনের মধ্যে গাঁথা রয়েছে। খুবই ব্যস্ত লোক, তার ওপর দয়ার এবং দায়িত্বের শরীর।"

ডাক্তার রায়ের আপিসে একটা স্পেশাল ফোন করে দিলেন হরিময়বাবু। ওইখানেই উনি শিখেছেন, দন্তহর্ষের অর্থ দাঁত সিরসির করা,

দন্তশর্করার অর্থ দাঁতের পাথুরি; দন্তোচ্ছেদ মানে মাড়িতে দাঁত ওঠা। তিনি শুনেছেন, প্রাচীন ভারতে দন্তলেখক বলে একটি জীবিকাও ছিল। দাঁতের ব্যথাওয়ালা কোনো লেখক নয়। যে-লেখক জীবিকা হিসেবে দন্তরঞ্জন করেন। অর্থাৎ দাঁত রঙ করা সেকালে সুন্দরীদের অঙ্গসজ্জার অঙ্গ ছিল।

পরের দিন সকালে। বংশগোলাপ তখনও ঘুমোচ্ছেন। চিন্তিত হরিময়বাবু ফোন করলেন স্বয়ং ডাক্তার রায়কে, "আমার পাঠানো পেশেন্ট কেমন আছেন?"

"পেশেন্ট কোথায় মশাই?" ওঁর দাঁতের কোনও সমস্যা নেই, প্রবল কৌতূহল দাঁতের হিস্ট্রি নিয়ে। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে দাঁতের বই তেমন খুঁজে পাননি। বাংলাতেও তেমন কিছু প্রকাশনা নেই। শেষে ভদ্রলোককে ডেন্টাল কলেজে পাঠিয়েছি একটা স্পেশাল চিঠি দিয়ে। হাজার হোক আপনার বিশিষ্ট বন্ধু।"



হরিময়বাবু একমনে চমচমের জন্য সম্পাদকীয় লিখছেন, সেইসময় বিকেলের পড়ন্ত রৌদ্রে তিনি দেখলেন বংগোলাপবাবু ভাড়ার মোটরগাড়িতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন, যাবার আগে জিজ্ঞেস করলেন, "রবি ঠাকুরের ডেন্টিস্ট ছিলেন আর আমেদ, তাঁর ডেন্টাল কলেজটা কোথায় জানেন?"

পিকলু যথাসময়ে চমচম কার্যালয়ে ফিরলো। হরিময়কে সে বললো, "আপনার বাড়িওয়ালার উপকার করতে গিয়ে অনেক সময় লেগে গেলো। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে মুখ চুন করে ঘুরছিলেন। আমাকে দেখে হালে পানি পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "দেশটা দাঁত সম্বন্ধে সজাগ নয় কেন বলুন তো?" আমি প্রতিবাদ করলাম, "বড় বড় মহাপুরুষের পাদনখকণা, দাঁত এসব নিয়ে আমরা হাজার হাজার বছর ধরে মাতামাতি করেছি, মিস্টার বিশ্বাস।"

বংশগোলাপবাবু বললেন, "বড় বড় লোকদের দাঁতের ইতিহাসের ব্যাপারটা আমাকে একটু জোগাড় করে দিন না। আমি ভাবলাম, ভদ্রলোক বাড়িতে চুপচাপ বসে আছেন, হয়তো কোথাও কোনো আর্টিকেল লেখার ঝোঁক হয়েছে। বললাম, বাংলায় লিখলে আপনি চমচমে লিখুন।"

"বংশগোলাপবাবু আমাকে ক্যান্টিনে নিয়ে গিয়ে চা ও টোস্ট খাওয়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন আমি কী পড়তে গ্রন্থাগারে এসেছি? বললাম, আমার সাবজেক্ট বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, কিন্তু পড়ছি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শেষ ক'দিন সম্পর্কে। আমার কথা শুনে ভদ্রলোক একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, ওই পুরনো সাবজেক্টে কত আর লেবু কচলাবেন?"

ভবনাথ সেনকে একটা ফোন করা দরকার। " দিয়ে দাও রিপোর্ট— ঠাকুরের কখন যে কি ইচ্ছে তা বোঝা দায়। তোমাকেও জড়িয়ে দিয়েছেন এই প্রোজেক্টে। মনে হচ্চে, দাদু এবার আমার অনুরোধ ফিরিয়ে দেবেন না। কিছু একটা লিখবেন।"

রাত অনেক। ঘরে আলো জ্বালিয়ে বংশগোলাপবাবু চাপা গলায় কথা বলছেন হরিময়বাবুর সঙ্গে।

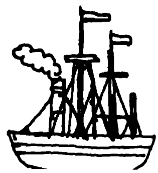
"মধ্য রাতে ঘুম না-থাকা, বিশ্বাস বংশের অভিশাপ। ১৮৮৬ সালের ১৫ আগস্টের মাসুল— এটা মেনে নিয়েছেন হরিময়বাবু। বংশোগোপালের দিনলিপি পড়ে আমি বুঝে নিয়েছি ব্যাপারটা। বিবেকানন্দ যদি কল্পতরুর

দিনে দুপুরে ভোঁসভোঁস করে ঘুমোতে পারেন তা হলে হোয়াই নট বংশগোপাল? কিন্তু এই ভাঙা বাড়িতে নিজের বংশধরদের এইভাবে আটকে দেওয়া, এটা আমার বুদ্ধির অগম্য।''

''যাই হোক, থ্যাংক্স টু আপনার ইয়ং ফ্রেন্ড পিংকলু,আমি এখন লাইন পাল্টে দাঁতের ইতিহাস চলে যেতে চাইছি! ভেরি ব্রাইট ইয়ং ম্যান এই পিকলু সেন।''

''পরিবারটা তো দেখতে হবে! আমাদের সাহিত্যের উজ্জল জ্যোতিষ্ক ভবনাথ সেনের একমাত্র নাতি। একটাই মুশকিল, ভীষণ মডার্ন, কোনও অলৌকিকে বিশ্বাস করতে চায় না। সব ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ চায়।''

বংশগোলাপবাবু বললেন, '' আমার ছেলে বংশগৌরব— সেও এই সব পুরনো ব্যাপারে এতটুকু ইন্টারেস্টেড নয়। বংশের নির্দেশ মেনে সে এই হিদারাম হালদার লেনে কখনও বসবাস করবে বলেও মনে হয় না। সে ক্ষেত্রে পিকলুবাবুকে বিশ্বাস বংশের সব কাগজপত্র আমি দিয়ে যাবো ফর গবেষণা। অন্য কোনও পথ নেই। এই বাড়ি বিক্রি করার জন্যে অনেক মোটা টাকার প্রস্তাব পাচ্ছি। কিন্তু গোঁয়ারগোবিন্দ পূর্বপুরুষ, নিজেদের খেয়ালখুশি মতন অদ্ভুত সব নির্দেশ রেখে গিয়েছেন।''



বংশগোলাপবাবুর কী হলো? একটা নতুন নোটবুক করেছেন দাঁত সম্বন্ধে বিভিন্ন সংবাদ সংগ্রহের জন্য।

তিনি বললেন, "এতো বছর কেন যে দাঁত সম্বন্ধে কোনো ইন্টারেস্ট নিইনি! হাজার হাজার বছর আগে প্রাচীন গ্রীসে ডেন্টিস্টের সাঁড়াশির কী নাম ছিল জানেন? 'ওদন্তাগ্রা', ভাবতে পারেন! এতো পণ্ডিত জাত, আধুনিক সভ্যতার লীলাক্ষেত্র, কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়ার কাছে দাঁতের ব্যাপারে শিশু। অমন যে অমন মহাপণ্ডিত অ্যারিস্টটল তিনি ৩৪৮ বিসিতে লিখলেন, পুরুষদের দাঁতের সংখ্যা মেয়েদের দাঁতের থেকে বেশি, ভাবতে পারেন?

"পৃথিবীকে দাঁতের বুরুশ দিয়ে দাঁত মাজতে শেখালো কে?" প্রশ্ন করলেন বংশগোলাপ বিশ্বাস।

নিজেই উত্তর দিলেন, "চায়না! অমন যে অমন সুসভ্য রোমান, তারাও টুথ ব্রাশের ব্যবহার জানতো না। প্রাচীন রোমে ডিনারের অতিথিদের চামচ এবং ছুরির সঙ্গে দেওয়া হতো সোনার দাঁতখড়কে। দুটো পদের মধ্যে একটু দাঁতে কাঠি ঢুকিয়ে খোঁটাটাই ছিল রোমকদের সামাজিক রেওয়াজ। গৃহস্বামীর গৃহ থেকে বিদায় নেবার সময় সোনার দাঁতখড়কে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কোনো আপত্তি ছিল না।"

"বলেন কি মশাই, রোমান সায়েবরা তাহলে দাঁতের মর্যাদা বুঝতো না?" বিস্ময় প্রকাশ করলেন হরিময়বাবু।

"বুঝবে কী করে? যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ছ'শ বছর পরেও চার্চের ধারণা ছিল, মেয়েদের তিরিশটা এবং পুরুষদের বত্রিশটা দাঁত!" বললেন বংশগোলাপ।

"কী ভয়ঙ্কর কথা, বলুন তো।" হরিময়বাবু অবাক হয়ে যাচ্ছেন।

বংশগোলাপ আবার মুখ খুললেন, "আপনার ডাক্তার রায়কে বলবেন, এই কিছুদিন আগেও বিলেতে সার্জেনদের মেরে ফেলা হতো যদি তাঁরা কোনও লর্ডের দন্তোৎপাটনে ভুল করতেন।"

হরিময়বাবু প্রস্তাব করলেন, " ছাড়ুন না একটা গরম ডেন্টাল আইটেম চমচমের পরবর্তী সংখ্যায়। তবে ইন্ডিয়ানরা দাঁত নিয়ে কী করেছে তা একটু লিখবেন। টুথ ব্রাশটা তো চাইনিজদের কাছে একটুর জন্যে আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেলো।"

"হতাশ হবেন না। পিকলু যা লিখে নিয়ে এসেছে, জিভছোলাটা ইন্ডিয়ানদের একান্ত নিজস্ব আবিষ্কার! হাজার হাজার বছর আগে ইন্ডিয়ানরাই প্রথম দাঁত তোলার যন্ত্র তৈরি করেছেন, নাম ছিল — দন্তশঙ্ক। জানেন মশাই, দু হাজার বছর আগে গ্রিসে ইন্ডিয়ান মাউথ ওয়াশ এক্সপোর্ট হতো এবং ঘরে ঘরে বিক্রি হতো, আর এখন সায়েবী মাউথওয়াশ ছাড়া আমাদের পছন্দ হয় না!"

হরিময় বললেন, "দেবেন আপনার দন্তসংগ্রহের একটা জেরক্স কপি?"

বংশগোলাপ বললেন, "পিকলুবাবু লিখে এনেছেন, এই যাকে আমরা ঠোঁটকাটা বলি, ক্লেফট্ লিপ তার শল্যচিকিৎসা চিনেরা করেছে যীশু জন্মাবার আড়াইশ বছর আগে।"

"গুড গুড। সাধে কি আর হাওড়ার বেশির ভাগ লোক মঙ্গলাহাটে পুরনো চাইনিজ ডেন্টিস্টের কাছে লাইন দেয়!"

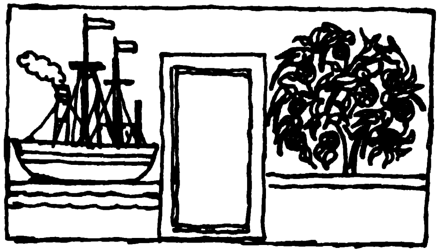
বংশগোলাপ, এবার তাঁর তৈরি নোটটা সোজা হরিময়ের হাতে দিলেন। হরিময়ও তৎক্ষণাৎ পড়ে ফেললেন।

হরিময়বাবুর উচ্ছ্বাস : "এ তো দেখছি, দাঁতের স্বর্ণভাণ্ডার, বংশগোলাপবাবু! রবি ঠাকুরের দাঁতের ট্রাবল ছিল, জর্জ ওয়াশিংটনের সিরিয়াস ধারাবাহিক দন্ত সমস্যা ছিল, যা তাঁর শেষ জীবনের ছবি দেখলেই ডেন্টিস্টরা ধরে ফেলেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট অবস্থায় বেশ কয়েক বার তিনি ডেন্টিস্ট পাল্টেছেন। চার জোড়া নকল দাঁত ছিল তাঁর। আর ইংলন্ডের রানি প্রথম এলিজাবেথ তো দাঁতের যন্ত্রণায় চিরকাল পাগল! অথচ দাঁত তোলবার সাহস তাঁর নেই। মশাই এই দাঁতের সমস্যার ফলে রানী এলিজাবেথের মুখে হতো প্রচণ্ড দুর্গন্ধ। সেই জন্যে বিবাহের হাঙ্গামায় গেলেন না, চিরকুমারী রয়ে গেলেন। আর দাঁত তোলার ভয় কমানোর জন্যে ইংলন্ডের এক রানীভক্ত পাদ্রি তো রানী এলিজাবেথের সামনে নিজের কাঁচা দাঁত তুলিয়ে ফেললেন। আরও আগে দাঁত নিয়ে যে সব কাণ্ড হয়েছে তা না-বলাই ভাল।"

সবাই কিন্তু শুনতে চাইছে। ফলে হরিময়বাবু আবার দন্তসংবাদ প্রচার শুরু করলেন। "মিশরের ফারাওরা প্রায়ই দাঁতের যন্ত্রণায় ভুগতেন। পরলোকে যাতে কষ্ট না হয় তার জন্য সমাধির ভিতর নিজের মমির পাশেই দাঁতের ডাক্তারকে মমি করে গিয়েছেন।"

বংশগোলাপ বললেন, "আমার ধারণা ছিল, দাঁতের ডাক্তারদের স্ট্যাটাস অস্ত্রচিকিৎসকদের মধ্যে তেমন উঁচু নয়। কিন্তু এখন শুনলাম, আমেরিকান ডেন্টিস্টরা গত একশবছর এমন সব বড় বড় আবিষ্কার করেছেন, যা জেনারেল সার্জেনরাও কাজে লাগিয়েছেন। যেমন অজ্ঞান করবার ওষুধ, এই অ্যানেসথেসিয়া ছাড়া আজকের কোনও সার্জারি সম্ভব হতো না।"

নিজের অফিস ফেরার পথে হরিময়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, "দন্তশূল না থাকলে দাঁতের কথা আলোচনা করতে মন্দ লাগে না, পিকলু। কিন্তু হঠাৎ এই দন্তাগ্রহ কেন?" হরিময়বাবু ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছেন না।



পরের দিন চমচম অফিসে কাজ করতে করতে পিকলু একটু চিন্তিত হয়ে উঠলো। স্বয়ং বংশগোলাপবাবু নিভৃতে তাঁকে ফোন করেছিলেন। বললেন, "আমি ডেন্টিস্টদের ইতিহাস এবং স্ক্যান্ডাল অতো জানতে চাইনি, মিস্টার পিকলু। আমি কেবল দাঁতের কথা শুনতে চেয়েছি। পৃথিবীর সব চেয়ে বিখ্যাত এবং দামি দাঁত এখন কোথায় আছে?"

পিকলুর খাতায় কিছু নোট ছিল, সবটা বংশগোপালের হাতে সে এখনও দেয়নি। সে বললো, "রবীন্দ্রনাথের চুল দাড়ি কেউ কেউ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি এবং নিমতলা শ্মশানঘাট থেকে ১৯৪১ সালে সংগ্রহ করেছে তাঁর মৃত্যুর পর। কেউ দাঁত সংগ্রহ করে রেখেছে বলে খবর পাইনি। সবচেয়ে ফেমাস দাঁত তো ভগবান বুদ্ধের। শ্রীলঙ্কায় জগদ্বিখ্যাত দন্তমন্দির রয়েছে। হাজার হাজার তীর্থযাত্রীর সমাবেশ হয় সেখানে, স্রেফ দন্ত দর্শনের জন্য।"

হরিময়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এই বুদ্ধ-দাঁত নাকি আগে পুরীতে জগন্নাথ মন্দিরের সংগ্রহে ছিল?"

পিকলু বললো, "স্বামী বিবেকানন্দ তো তাই মনে করতেন। উনি অনেক ব্যাপারে খবরাখবর রাখতেন।"

বংশগোলাপ ফোনে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। ব্যাপারটা ওঁর জানা ছিল না। খুবই কৌতূহলী বোধ করছেন। তাঁর প্রশ্নটি কিন্তু বিদঘুটে। "বুদ্ধের দাঁতের এখন বাজারদর কত হতে পারে?"

"দাম দেওয়াটা ভক্তদের ব্যাপার তো। জাপানিরা যদি ভ্যান গগের একখানা ছবির জন্যে একশো কোটি টাকা দিতে পারে, তা হলে বুদ্ধের দাঁতের জন্যে দুশো কোটি তো তেমন বেশি নয়।"

প্রবল উৎসাহের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে বংশগোলাপের মধ্যে। "যীশুখ্রিস্টের দাঁত কোথাও কি রক্ষিত আছে?"

"শুনিনি। দু'হাজার বছর আগে লোকগুলো ঠিক বুঝতে পারেনি, ক্রুশ থেকে নামিয়ে তা হলে এক-আধটা দাঁত সরিয়ে রাখতো। খুব লংলাস্টিং জিনিস— এই দাঁত, চুল এবং পাদনখকণা। বুদ্ধ বিতরণ করে গিয়েছেন কিছু কিছু।"

"আপনি বুদ্ধের দাঁতের ঠিকমতো একটা ভ্যালুয়েশন করুন, মিস্টার পিকলু। এবং তারপর আর একটা অঙ্ক আপনাকে কষতে হবে। বুদ্ধের দাঁত যদি একশ হয়, তা হলে আর একজন জগদ্বিখ্যাত মহাপুরুষের দাঁতের দাম অন্তত দশ তো হবে? সোজা অঙ্কে তাই তো বলে, তাই না মিস্টার পিকলু?"

পিকলু একটু থেমে বললো, "বংশগোলাপবাবু, আপনাকে দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, শ্রীলঙ্কায় বুদ্ধের দাঁতের মন্দির আছে, কিন্তু হায় সেখানে বুদ্ধের আদি দাঁত বোধ হয় নেই।"

"বলেন কী? চুরি গিয়েছে! যেমন কাশ্মীরে হজরত মহম্মদের চুল হজরতবাল উধাও হয়েছিল, পরে ফিরে পাওয়া গেল অনেক কষ্টে। শুধু শুধু উত্তেজিত মানুষেরা দাঙ্গা বাধালো হজরতবাল হারিয়ে যাওয়ায়।"

"না, বংশগোলাপবাবু। বুদ্ধের দাঁত চুরি যায়নি। কিন্তু শত শত বছর ধরে নানা ভোগান্তি সহ্য করছেন ভগবান বুদ্ধ তাঁর পরিনির্বাণের পরেও। বুদ্ধের দাঁত লুঠ হয়েছিল। শুনুন ব্যাপারটা— খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৩ অব্দে বুদ্ধের দেহরক্ষার পরে তাঁর শিষ্য কেমো যোরো এই পরম পবিত্র দাঁত সংগ্রহ

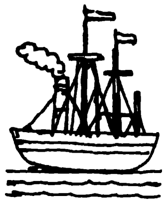
করেন। যোরো পরম যত্নে এই দাঁত কলিঙ্গ শহরে নিয়ে যান। ৪১১ খ্রিস্টাব্দে এই দাঁত নানা পথ নানা বিপর্যয় পেরিয়ে শ্রীলঙ্কায় পৌঁছয়। আরও ন'শ বছর পরে মালাবারীরা এই দাঁত জোর করে শ্রীলঙ্কা থেকে ভারতে ফিরিয়ে আনে। কিন্তু গ্রহরমা নামে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আবার পবিত্র দন্তকে সিংহলে ফিরিয়ে নিয়ে যান। ১৫৬০ সালে বোম্বেটে পর্তুগিজরা খবর পেয়ে শ্রীলঙ্কা থেকে এই দাঁত গায়ের জোরে লুঠ করে। গোয়াতে যে বোম্বেটে এই দাঁতটি নিয়ে যায় তার নাম ডি ব্রাগনজা! এইখানে ইংরেজ গভর্নরকে সাক্ষী রেখে ভগবান বুদ্ধের দাঁত পুড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলা হয়। এরপর বিক্রমবাহু বলে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হতাশায় না ভুগে হাতির দাঁত থেকে কেটে একটি নকল বুদ্ধ দাঁত তৈরি করেন। সেইটাই এখন শ্রীলঙ্কায় রয়েছে। সাইজ দেখলেই বুঝবেন এটা মানুষের দাঁত হওয়া সম্ভব নয়।"

উল্লসিত হয়ে উঠলেন বংশগোলাপ। টেলিফোনে বললেন, "আপনি তো মশাই আচার্য স্যর যদুনাথ সরকার হয়ে উঠবেন।"

"যে কোনও বইতে ব্যাপারটা পেয়ে যাবেন, বংশগোলাপবাবু, ইনক্লুডিং চমচমের পুরনো সংখ্যায়।" নিবেদন করলো পিকলু সেন।

"তা হলে তো অন্য মহাপুরুষদের দাঁতের ভ্যালুয়েশন আরও বাড়বে।"

"লঙ্কায় সোনার দাম বাড়লে আমাদের কী? আমাদের দেশে মহাপুরুষদের দন্তসংগ্রহ কোথায়? ছোটছোট ছেলেদের বলে দিতে হবে, এ বার থেকে দুধে দাঁত ইঁদুরের গর্তে না ফেলে কৌটোয় রেখে দাও। ঠাকুর ইচ্ছে করলে হুড়হুড় করে দাম বাড়িয়ে দেবেন।"



সমস্ত ব্যাপারটা কিন্তু সহজ পথে যাচ্ছে না। সমস্যাটা মোটেই সহজ নয়। বংশগোলাপ বিশ্বাসের পারিবারিক রহস্য কীর্তি আরও কিছুটা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন এবার।

বংশগোলাপের স্বভাবেরও কোনো পরিবর্তন নেই। সমস্ত দিন তাঁকে কর্মব্যস্ত দেখা যায় না। তাঁর তৎপরতা শুরু হয় মধ্যরাতে। গভীর রাতে পিকলুকে একবার ডেকে পাঠালেন স্বয়ং বংশগোলাপ। মুখে তেমন হাসি নেই। ঘুমোতে চেষ্টা করছেন অথচ ঘুম আসছে না, ফলে তিনি বিষণ্ণ হয়ে ওঠেন।

বংশগোলাপ এবার পিকলুকে বললেন "বংশের অভিশাপ বয়ে বেড়াচ্ছি ভাই, এই রাত জেগে। এসব আর আমার ভাল লাগে না। নিশ্চয় কোনো মহা অপরাধ করেছিলেন পূর্বপুরুষ, না হলে কেন এমন হবে? অথচ আমি শুনেছিলাম, এক জনের অন্যায়ের জন্য অপর কারুর ওপর শাস্তি কখনও ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। আমাদের কর্মফলও একথা বলে না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, বংশের ব্যাধির মতন, বংশের পাপও একেবারে মিথ্যে নয়। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, জন্মের পর জন্ম পরিবারকে এই অভিশাপের বোঝা বইতে হতে পারে।"

এবার ঝরঝর করে কাঁদছেন বংশগোলাপ বিশ্বাস। হঠাৎ বললেন,

বংশধরদের বড়লোক করার জন্যে প্রপিতামহ বংশগোপাল যে কী কাণ্ড করে গেলেন ১৮৮৬ সালের ১৬ ই আগস্ট।

মূল রহস্যটা এবার যেন কিছুটা বেরিয়ে আসছে। বংশগোপালের একটা গোপন লেফাফার সন্ধান পেয়ে সেটা খুলেছেন স্বয়ং বংশগোলাপ। খামের ওপরে বংশগোপালের নিজের হাতে লেখা ছিল, ১৯১৭ সালের আগে যে সিল খুলবে সে নির্বংশ হবে।

এই খামই একবার লুকিয়ে খুলবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বংশবিনয় ১৯৪৬ সালে এবং তারপরেই ১৬ই আগস্টের রায়টে খুন হয়েছিলেন তাঁর একমাত্র সন্তান বংশবিজয়। বংশবিনয় আর খাম খোলেননি, খামের ওপরে আর একটা খাম চড়িয়ে লিখিতভাবে নিজের অপরাধ স্বীকার করে গিয়েছেন পরবর্তী বংশধরের কাছে।

বংশগোলাপ বললেন, 'টাকা। বংশধরদের জন্য প্রচুর টাকা চেয়েছিলেন আমার পূর্বপুরষ বংশগোপাল বিশ্বাস। অথচ যার কাছ থেকে বিত্ত চেয়েছিলেন তাঁর কাছে টাকা মাটি, মাটি টাকা। টাকার কোনো মূল্য নেই তাঁর কাছে। অর্থই যে অনর্থের মূল তা তিনি বলে গিয়েছেন আপনজনদের কাছে।"

বড়লোক হতে চেষ্টা করার মধ্যে অন্যায় কী থাকতে পারে? পিকলু একটু পাকাভাবেই বললো। "দোষ দিতে পারেন না বংশগোলাপবাবু। নিজের বংশধরদের কে সুখী করতে চায় না? পৃথিবীর কোথায় না বিত্তের জন্যে প্রার্থনা এবং সাধনা হচ্ছে?"

"কিন্তু এই কল্পতরু বড়ই বিপজ্জনক বৃক্ষ, মিস্টার পিকলু। আজ ভাল বা মন্দ যা চাইবে তা-ই পেয়ে যাবে, কিন্তু কাল তার জন্য ভোগান্তি। যেখানে এতো লোক কেবল মুক্তি এবং ভক্তি চাইছে সেখানে লোভী হয়ে বিত্ত চাওয়ার কোনও মানে হয় না, মিস্টার পিকলু।"

পিকলু বললো, "কিন্তু বংশোগোপালবাবু তো কল্পতরু দিবসে লেটে হাজির হয়েছিলেন, ঠাকুরের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ পর্যন্ত পাননি।"

বংশগোলাপ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "সেইটাই তো কাল হলো

মনে হচ্ছে। আমার পূর্বপুরুষ রামকৃষ্ণভক্ত বংশগোপাল বিশ্বাস তখনই বুঝে নিয়েছেন, কাশীপুরের এই মানুষটিকে নিয়ে সারা দুনিয়ায় একদিন বিপুল আলোড়ন হবে। যাবার আগেই তিনি যে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।"

এই ব্যাপারটা কী, পিকলুকে তা ভালভাবে জানতে হবে। বংশগোলাপ বললেন, "আমার জ্ঞান সামান্য— মনে হয়, হাটে হাঁড়ি ভাঙার অর্থ তিনি যে নররূপীদেবতা এটা মানুষের কাছে প্রকাশ করে যাবেন। আমার পূর্বপুরুষ তখনও কিন্তু স্রেফ বিত্তবাসনায় মশগুল।"

পুরনো একটা কাগজের টুকরো পিকলুর দিকে এগিয়ে দিলেন বংশগোলাপ। "বহু বছর আগে আমার প্রপিতামহ বংশগোপাল বিশ্বাস কী করেছিলেন দেখুন।"

পিকলু ঝট করে লেখাটা পড়ে নিলো, তার চোখ দুটো এবার বিস্ফারিত হয়ে উঠলো।

বংশগোপালের সুন্দর হাতের লেখা : "আজি হতে শতবর্ষ পরে, কে তুমি পড়ছো আমার এই লিপি?"

"এ তো রবীন্দ্রনাথের লাইন মিস্টার বিশ্বাস! কিন্তু আশ্চর্য নয়, রবীন্দ্রনাথ তো বঙ্গাব্দ ১৩০০ সালে এই লাইন লিখে ফেলেছেন। বংশেগোপালবাবু সারাজীবন রবীন্দ্রনাথ পড়তেন।"

পড়া শুরু হল পিকলুর :

সেদিন সোমবার, ভাদ্র মাসের শুরু। কাশীপুরে ভোর হয়েছে কিন্তু সমস্ত বাড়িতে যেন চাপা উত্তেজনা। শেষ রাতে বেশ কিছু ছোটাছুটি করেছি। আর বাকি সময় অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছি। কিন্তু এখনও আশার আলো সম্পূর্ণ নিভে যায়নি।

এবাড়িতে উপস্থিত গৃহী এবং ত্যাগী সমস্ত ভক্ত চাপা গলায় বলেছে, ঠাকুর এখনও শরীর ত্যাগ করেননি, তিনি কেবল সামাধিস্থ হয়ে আছেন। পার্ষদরাও সেই কথায় বিশ্বাস করছেন। সকাল আটটার সময় নেপালি ভক্ত ক্যাপ্টেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায় কাশীপুরে উপস্থিত হলেন। সমাধি সম্বন্ধে তাঁর

বিপুল জ্ঞান।

ক্যাপ্টেন সাবধানে সব লক্ষ্য করে বললেন, ওঁর মেরুদণ্ড এখনও উষ্ণ রয়েছে। শিরদাঁড়ায় গরম গাওয়া ঘি মালিশ করলে অনেক সময় সমাধিভঙ্গ হয়। সেবকভক্ত সেইমতন প্রভুর শরীর মালিশ আরম্ভ করলো, কিন্তু কোনও প্রাণলক্ষণ দেখা গেলো না।

একটু পরেই তাঁর স্ত্রী এলেন। স্বামীর দেহের সামনে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন, "মা কালী গো! তুমি কি দোষে আমায় ছেড়ে গেলে গো।"

আমি ঠিক বুঝলাম না, স্বামীকে তিনি কি মাতৃরূপে পূজা করতেন? স্বামীকে কেন তিনি মা কালী বলে সম্বোধন করলেন? শোকের সময় অবশ্য সবই সম্ভব।

দুপুর একটা নাগাদ একজন ডাক্তার এলেন। এঁকে কে না চেনে? কলকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসক ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। অনেক দিন ধরে শিবের অসাধ্য রোগের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করছেন। ডাক্তার সরকার সযত্নে তাঁর দেহ পরীক্ষা করলেন। দূর থেকে দেখলাম, দেহটা বাঁদিকে কাত হয়ে রয়েছে, পা দু'টি ওপরের দিকে সামান্য তোলা, চোখ ফোলা, মুখ কিন্তু পুরো বন্ধ নয়।

"সমাধি নয়, মৃত্যু"— গভীর দুঃখের সঙ্গে জানিয়ে দিলেন ডাক্তার সরকার। এক জন ভক্তকে বললেন, "এই নাও দশ টাকা, একটা ফটো তোলার ব্যবস্থা রেখো।"

আজ কাশীপুরে অন্তিমলীলার অন্তিমপর্বে এখানে বহু মানুষের বিরামহীন আগমন। বিকাল পাঁচটায় প্রাণহীন শরীর দোতলা থেকে নীচে নামিয়ে আনা হলো। মহাযাত্রার মহাপ্রস্তুতি চলেছে। এখন তাঁর পরিধানে পীতাম্বর, সমস্ত শরীর শ্বেতচন্দনে আবৃত। গলায় ফুলের মালা, মাথায় ফুলের চূড়া, পায়ে ফুলের নূপুর।

এক ভক্ত কেঁদে উঠলেন, "গুরুদেব, আজ আপনাকে এইঅবস্থায় দেখতে হল। এ পাপিষ্ঠের পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করুন।"

আমি নীরবে দূরে দাঁড়িয়ে আছি। অকস্মাৎ ভাদ্রের মেঘ থেকে বড় বড়

দানার বৃষ্টি শুরু হলো। কেউ কেউ সবিস্ময়ে বললো, স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে।

খাট এবার শ্মশানযাত্রীদের কাঁধে উঠলো। সেই সঙ্গে বারে বারে হরিধ্বনি। একদল বোষ্টম সঙ্কীর্তন শুরু করে আগে আগে চলল শশ্মানের দিকে। এ এক অদ্ভুত শোকযাত্রা। কারণ অপরাহ্নে এখানে সর্বধর্মের পতাকা ওড়ানো হয়েছে— হিন্দুর ত্রিশূল ওঁকার, বৌদ্ধের খুস্তি, মুসলমানের অর্ধচন্দ্র ও খ্রিস্টানদের ক্রুশ সব শোভা পাচ্ছে।

শ্মশানে পৌছে খাট ঘিরে অনেকক্ষণ সঙ্কীর্তন চলল। ঠাকুরের প্রিয় গায়ক ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় শোকাহত অবস্থায় কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। এঁর রচিত নববৃন্দাবন নাটকে নরেন্দ্র কয়েকবার অভিনয় করেছেন। প্রভু নিজেও এই নাটক দেখতে যান। এঁর রচিত কয়েকটি গান তাঁর খুবই প্রিয় ছিল — 'আমায়ে দে মা পাগল করে', 'গভীর সমাধি সিন্ধু অনন্ত অপার', 'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি', 'চিদানন্দ সিন্ধুপারে প্রেমানন্দের লহরী।' শ্মশান সঙ্কীর্তনের পরে সান্যাল মহাশয় কয়েকটি গান গাইলেন, যেসব গান প্রভুর প্রিয় ছিল। এবার যথাবিহিতভাবে গঙ্গায় তাঁর শরীর ধৌত করে, পুষ্পমাল্যে সজ্জিত অবস্থায় চিতায় স্থাপন করা হলো।

কী আশ্চর্য! এই সময়ে আবার ভাদ্রের গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হলো। আমি কাছে দাঁড়িয়ে আছি, ভক্তদের দেখছি একমনে। বিশেষ করে উপেন মুখার্জিকে। এই শ্মশানে একটু পরেই যে তার সর্পদংশন হবে এবং তা সত্ত্বেও তার প্রাণ যে রক্ষা পাবে তা জানা ছিল না।

তাঁর শীর্ণ শরীরকে অগ্নি সম্পূর্ণ পরিবেষ্টন করেছে, সেই সময় হঠাৎ আমার ভগবান বুদ্ধের কথা স্মরণ হলো। কোথায় যেন পড়েছিলাম চিতাগ্নিতে প্রবেশ করার পূর্বে বুদ্ধ-দেহ থেকে একটি দাঁত সংগ্রহ করে নেওয়া হয়েছিল। আড়াই হাজার বছর পরেও সেই দাঁত নিয়ে পৃথিবীর মানুষের কি বিপুল আগ্রহ। সামান্য একটি দাঁত নিয়ে পৃথিবীতে কত কি ঘটলো।

ঘটলো।

মাত্র এক ঘণ্টায় সব শেষ। বৃষ্টি বেশ বাধা দিয়েছে। কেন জানি না এই সময় আমি একটু এগিয়ে গিয়েছিলাম।

শশী একটা কলসে চিতাভস্ম সংগ্রহের সময় ঈষৎ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। পূতাস্থি সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণা ছিল না, জানতাম নাভিদেশকে অগ্নি গ্রাস করতে অসমর্থ। কিন্তু ভস্মরাশির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে আমি একটি দাঁত সহজেই পেলাম এবং সেটি নিপুণভাবে তড়িৎগতিতে পাশপকেটে সংগ্রহ করলাম। শ্মশানে কেউ চোরকে প্রত্যাশা করে না।

আর চৌর্যই বা বলবো কেন? মহাশ্মশানে শশী পূতাস্থিকলস পূর্ণ হবার পরে অনেকেই তো বিশেষ আগ্রহে এগিয়ে এলো। মনে হলো স্বয়ং নরেন্দ্রও তাঁর উত্তরীয়তে কিছুটা পূতাস্থি সংগ্রহ করলেন।

পরে শুনেছি, এই পূতাস্থি নরেন্দ্র রক্ষা করতে পারেননি। কাপড়ের খুঁটে বেঁধে নিয়ে নিজের বাড়ি গিয়েছিলেন। সেখানে নরেন্দ্র জননী অসাবধানবশতঃ সেই কাপড় খুলে কেচে ফেলেন, ফলে নরেন্দ্রর নিজস্ব সংগ্রহ বলে কিছু রইলো না।

"সকলেই ভক্তিভরে সংগ্রহ করছে, আমি তার থেকে বঞ্চিত হবো কেন? কেবল আমার মধ্যে অন্যদের মতো ভক্তির পূর্ণ উপস্থিতি নেই। আমি তখনও ভাবছি, একদিন যখন ভগবান বুদ্ধের মতন এই মানুষটির বাণী দিকে দিকে সম্প্রচারিত হবে, তখন আমি জীবিত না থাকলেও আমার বংশধররা বিপুল সৌভাগ্যের অংশীদার হবে। বংশগোপাল বিশ্বাসের বংশধররা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের দাঁতের মালিক। না, মালিক বা স্বত্বাধিকারী কথাটা তেমন ভাল লাগছে না। তবু বিশ্বাস রাখি যে পবিত্র দেহাবশেষের রক্ষণাবক্ষেণকারী ভাবতে দোষ কোথায়?

মহাসমাধির পরেও কয়েক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সময়ের শাসন অমান্য করে, বিবাহের পরেই আমি বার্মায় পাড়ি দিয়েছি জীবনসংগ্রামের তাগিদে, ভাগ্যের সন্ধানে। ভাগ্যদেবী অবশ্যই সুপ্রসন্না হয়েছেন। বিদেশে বেশ কিছু উপার্জন করে একবার কলকাতায় ফিরে শুনলাম যে নরেন্দ্র আর

আমাদের নরেন্দ্র নেই!

শিকাগো থেকে বিশ্ববিজয়পর্ব শুরু করে সে আবার দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডারের মতন দেশে ফিরে এসেছে। নরেন্দ্রনাথ মঠ নির্মাণের জন্য বেলুড়ে জমি কিনেছে বিদেশিনী ভক্ত মিস্ হেনরিয়েটা মুলারের অর্থানুকূল্যে, সেইখানেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে একালে মহাতীর্থ রামকৃষ্ণ মঠ। এখানেই মাথায় করে নরেন্দ্রনাথ বয়ে এনেছে আত্মারামের কৌটো, আত্মারাম এখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে অন্তত দেড় হাজার বছর পৃথিবীর ওপর আধিপত্য করবেন।

আমি এখন দিশাহারা। আগের তুলনায় আমি কিছুটা সচ্ছল হয়েছি, কিন্তু অবশ্যই আমাকে ধনী বলা চলে না। বার্মায় দ্বিতীয়বার ফিরে এসে আমি বেশ কিছুটা বিচলিত। আমার প্রথম সন্তান প্রাণচঞ্চল, স্বাস্থ্যবান, কোথাও অসুখের কোনও চিহ্ন ছিল না। অনেক প্রত্যাশায় তার নাম দিয়েছিলাম বংশমহিমা। কিন্তু অকালে বংশগোপালকে বজ্রাহত করে একদিন গভীর রাতে সে বিদায় নিল রেঙ্গুনে। শ্মশানে তার পূতাস্থিতেও একটা দাঁত দেখেছিলাম। আমি অবশ্য মাথা ঘামাইনি।

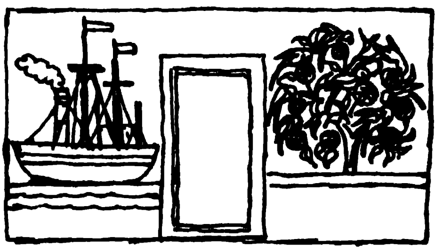
কাশীপুরে সংগৃহীত পবিত্র দন্তটি রুপোর কৌটোয় সংগ্রহ করে আমি পরম যত্নে ও গোপনে বার্মার বিভিন্ন জনপদে ঘুরে বেড়িয়েছি। বার্মাতেও তাঁর নাম প্রসারিত হয়েছে, মঠ মিশনের তরুণ সন্ন্যাসীরা এখানেও তাঁর নামগানে ব্যস্ত। মনে হয়, তাঁর বাণীতে একদিন সমগ্র বিশ্ব বিমোহিত হবে।

কিন্তু কবে? বুদ্ধের বাণী বিশ্ববাণীতে রূপান্তরিত হতে তো অনেক যুগ অতিক্রান্ত হয়েছিল।

আমি তরুণ এক সন্ন্যাসীকে এই প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বললেন, স্বামী বিবেকানন্দ তো রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করেছেন ১৮৯৭ সালে, অল্প সময়ের মধ্যে বেলুড় মঠ তো স্থাপিত হয়েছে, এবার অপেক্ষা করতে হবে আত্মরাম কী খেলা দেখান। এক শতাব্দীতেই হয়তো সহস্র বছরের কাজ সম্পন্ন হবে। কে জানে? রামকৃষ্ণ যাঁর নাম , বিবেকানন্দ যাঁর চেলা

সেখানে অসম্ভব বলে কিছু নাও থাকতে পারে। শোনেননি ওই গান? দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী...। সুতরাং শতবর্ষেই সহস্র গুণ বেড়ে যাবে তাঁর মূল্য, কিংবা আরও বেশি।

আমি হিসেব করেছি, মিশনের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে নাইনটিন নাইনটিসেভেন তো মাত্র কয়েক দশক দূরে। ললিতকে তখন আর কেউ লেট ললিত এই দুর্নাম দিতে সাহস পাবে না।



"অবিশ্বাস্য। স্বয়ং ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীদন্ত", আনন্দে আত্মহারা হয়ে হরিময়বাবু কী করবেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না।

ভবনাথবাবু নিজেও এবার উত্তেজিত হয়ে উঠছেন। প্রথমে ঠাকুর সম্বন্ধে লেখবার তেমন উৎসাহ পাচ্ছিলেন না, আর এখন স্বয়ং ঠাকুরই যেন একখানা রেডিমেড গল্প স্পেশাল মোড়কে পুরে লেখকের শ্রীহস্তে নিজেই তুলে দিতে চাইছেন।

পিকলুকে তার দাদু এবার কয়েক জায়গায় দ্রুত ঘুরে আসতে নির্দেশ দিলেন।

ঠাকুমা একটু আপত্তি জানালেন। "একরত্তি ছেলে, ছুটিতে রয়েছে।

তাকে এইসব জটিল ব্যাপারে ঢোকানো কেন?"

ভববনাথ সেন বললেন, "গিন্নি, যাদের বয়স কম এবং এনার্জি বেশি নবযুগে তাদেরই তো জয়ধ্বনি উঠবে। কম বয়স থেকেই ওরা বিশ্বসংসারকে জানুক, কিছু শিখুক। ঠাকুর-স্বামীজি তো শুধু বড়োদের সম্পত্তি নয়। এই দন্তরহস্য ঠিক মতন উন্মোচন হলে, দেশের মস্ত বড় একটা কাজ হবে। এর নামই তো রামকৃষ্ণশক্তি!"

বইপত্তর খোঁজ করে এবং বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে অনেক কথাবার্তা বলে পিকলু সল্ট লেকে ফিরলো যথাসময়ে। বেলুড়ে স্বামী প্রভানন্দ ওরফে বরুণ মহারাজ অসুস্থ, তাঁর সুচিন্তিত মতামত পাওয়া যায়নি।

শঙ্করী বসু তাঁর ওলাবিবিতলার বাড়িতে বসে পিকলুর সঙ্গে অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু তিনি এতো রেফারেন্স দিয়েছেন বিভিন্ন সূত্র থেকে যেসব খুঁজতে গেলে দশ বছর সময় লেগে যাবে।

সেই সময় হুটকো হালদার সাগ্রহে পিকলুকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। টপাটপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অন্তিম পর্বের ঘটনাগুলো সাজিয়ে দিয়েছেন। অ্যালোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, কবিরাজ যাঁরা ঠাকুরকে চিকিৎসা করেছিলেন অন্তিমকালে তাঁদের ঘরের খবর দিয়েছেন। কিন্তু ঠাকুর কখনও ডেনটিস্টের শরণাপন্ন হয়েছিলেন কি না এবং হলে সেই ডাক্তারের নাম কী তা হুটকো হালদার বলতে পারেননি। ঠাকুরের ছবি দেখে, হাবভাব দেখে মনে হয় তাঁর দাঁত খুব ভাল ছিল না।

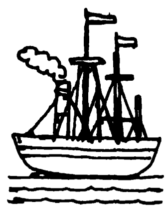
হুটকো হালদার এমনও বলেছেন, শ্মশানে অল্প তাপে দাঁত না পোড়া কোনো আশ্চর্য ব্যাপার নয়। আজকাল বৈদ্যুতিক চুল্লিতে অব্যশ্য আলাদা ব্যাপার— ছাইটা পাউডারের মতন হয়ে যায়।

দাদু বললেন, "প্রথম কথা, কল্পতরুর পরেও ঠাকুর এক-আধবার কল্পতরু হয়েছিলেন, প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্রর অনুরোধে। ঠাকুরের বিদায়-সময় আগত এই আশঙ্কা করে নরেন্দ্র একবার তাঁর খুড়তুতো ভাই সুপ্রসিদ্ধ বাদক

হাবু দত্তকে কাশীপুরে নিয়ে গেলেন। বিরক্ত ঠাকুর প্রথমে বললেন, 'আমি মরতে বসেছি, এখন আর কাকেও ছুঁয়ে দিতে পারবো না।' কিন্তু প্রধান শিষ্য নাছোড়বান্দা। তখন ঠাকুর হাবু দত্তর বুকে আঙুল দিলেন, লোকটা বুঁদ হয়ে পুতুলের মতন মেঝেতে বসে রইলো। নেশাড়ে লোক, একটু দূরে নিয়ে গিয়ে চিন্তিত নরেন্দ্র বললেন, দাদা গাঁজা খাবি? হাবু দত্ত আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় বললো, আমি বুঁদ নেশায় ছিলাম— গাঁজার নেশা ফিকে নেশা— ওই বুঁদ নেশাটা চাই।''

পিকলু খবর পেয়েছে, পরবর্তীকালে সঙ্গীতজ্ঞ এই হাবু দত্ত একটা হাড়ের মালা পরতেন, যা নাকি রামকৃষ্ণের পূতাস্থিতে তৈরি। সে মালা কোথায় হারিয়ে গেলো সে খবর এখনও পাওয়া যায়নি। নিশ্চয় কেউ গোপনে রেখে দিয়েছে, ফাঁস করছে না। কেউ কেউ বলে, বাদ্যাচার্য হাবু দত্তও শ্মশানে ঠাকুরের অস্থি সংগ্রহ করেছিলেন এবং সেই অস্থি সারাজীবন পূজা করেছিলেন। হাবু দত্ত সাধারণ শিল্পী ছিলেন না। বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী গায়িকা মাদাম কাল্‌ভে বেলুড় মঠে হাবু দত্তর এস্রাজ শুনে মোহিত হয়েছিলেন। এসব খবর আরও দিতে পারতেন, স্বামীজির মেজভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে মহিমবাবু, তাঁর লেখা বইগুলো তো বিচিত্র সংবাদের অমৃতভাণ্ড। ওখানেও খোঁজ করে দেখতে হবে।

পিকলু আরও সংগ্রহ করে এনেছে নরেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর অভিমত। অনেক শিষ্যই শ্মশান থেকে অস্থি সংগ্রহ করেছিলেন। তার মধ্যে একজন ছিলেন বুটো কালী ওরফে কালি মুখার্জী। তিনি কলকাতার বাড়িতে এবং পরে হুগলী জেলার গোপীনাথপুরের বাড়িতে সেগুলো পুজো করতেন।



ভবনাথবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "পূতাস্থির ব্যাপারটা তাহলে এখনও কিছুটা রহস্যময় হয়ে রইলো।"

পিকলু ব্যাখ্যা করলো, "এটা বোঝা যাচ্ছে, বেলুড়ে যে আত্মারামের কৌটো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এ ছাড়াও কেউ কেউ ১৬ আগস্ট চিতাভস্ম সংগ্রহ করেছিলেন। ভস্মের পুরো হদিশ এখনও জানা গিয়েছে কি না সন্দেহ।

আত্মারাম শব্দটি হরিময়বাবুর তেমন পরিচিত নয়। ভবনাথ বললেন, "ঠাকুরের দেহাবশেষ যে তামার পাত্রে রক্ষিত তার গায়ে 'আত্মারাম' শব্দটি উৎকীর্ণ। স্বামীজীর দেওয়া নাম।"

ভবনাথবাবু প্রস্তাব করলেন, "পিকলু, হাওড়ার রহস্যটা তুমি ঝটপট সাজিয়ে নাও যেসব তথ্য পেয়েছো তার ভিত্তিতে। তারপর সবাই মিলে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।"

পিকলু বললো, "ব্যাপারটা এখনও পুরো পরিষ্কার হয়নি দাদু। এক : প্রিয় শিষ্যদের কেউ কেউ ঠাকুরের পূতাস্থি কিছুটা নিজেদের শরীরেই ধারণ করেছিলেন, খেয়ে ফেলে। এর মধ্যে বিবেকানন্দ ছিলেন। দুই : বিবেকানন্দ নিজের কাপড়ের খুঁটে কিছুটা ভস্ম নিয়ে গিয়েছিলেন বাড়িতে। সেই ছাড়া কাপড় ভুল করে তাঁর মা ধুয়ে ফেলেছিলেন, সেকথা

আগেই জানা গিয়েছে। তিন : অস্থিভস্মের মূল কলসিটা শ্মশান থেকে সোজা গিয়েছিল কাশীপুরে এবং ঠাকুরের বিছানার ওপর তা সযত্নে রাখা হয়েছিল।"

এবার পিকলু জানালো, "হুটকো হালদারের মতে, ঠাকুরের পার্ষদরা এই দেহ পুড়নোর ব্যাপারে নাকি মোটেই রাজি ছিলেন না।"

"কিন্তু বংশগোপাল লিখছেন, অনুগত শিষ্যগণ একে একে সকলেই পুত্রবৎ ধর্মপিতার দেহে অগ্নিপ্রদান করেন।"

"হ্যাঁ," পিকলু ব্যাপারটা মেনে নিলো। "কিন্তু পরে স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ এক ভক্তকে লিখেছিলেন, 'ভগবান রামকৃষ্ণের শরীরে নানা কারণে অগ্নি সমর্পণ করা হইয়াছিল। এই কার্য যে অতি গর্হিত তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে তাঁহার ভস্মাবশেষ অস্থি সঞ্চিত আছে। উহা গঙ্গাতীরে কোনও স্থানে সমাহিত করিয়া দিতে পারিলে উক্ত মহাপাপ হইতে কথঞ্চিৎ বোধহয় মুক্ত হইব।' ঠাকুরেরও ইচ্ছা ছিল তাঁর দেহাবশেষ গঙ্গার ধারে বিশ্রাম করুক। এক ভদ্রলোক মহিমা চক্রবর্তী দশ কাঠা জমি দেবেন প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন, কিন্তু পরে তিনি পিছিয়ে যান। এসব অবশ্য বেলুড়ের বড় জমি মার্কিন মেমসায়েবের অর্থে কেনবার আগেকার কথা। বেলুড়ের জমির মালিক ছিলেন এক বিহারি ভদ্রলোক। ওখানে জাহাজ সারানো হতো।"

ভবনাথ বললেন, "পূতাস্থি সম্বন্ধে যা পাওয়া যাচ্ছে তা সংক্ষেপে বলো পিকলু আমাদের এখন অনেক কিছুর খবরাখবর নিতে হবে।"

পিকলু বললো, "প্রথমেই বলে রাখি শ্মশানযাত্রার সময় ঠাকুরের শরীর কিছুটা বিকৃত বা ডিকমপোজড হয়েছিল। স্বামী অভেদানন্দের লেখায় খবরটা স্পষ্ট রয়েছে। দাহকার্য সম্পন্ন করে কলসি নিয়ে কাশীপুরে ফেরা হলো এবং ঠাকুরের ঘরে অস্থি রেখে ঠাকুরের জীবন আলোচনা করলেন নরেন্দ্রনাথ, যাঁকে ঠাকুর আদর করে মাঝে-মাঝে শুকদেব বলে ডাকতেন।"

মহাসমাধির পরে ত্যাগী শিষ্যদের চিন্তা, এখানে থাকতে পারলেই ভাল হতো, কিন্তু বাগানের মালিককে কে ভাড়া দেবে? ভক্ত রামবাবু স্থির করেছেন, আগস্ট মাসের শেষ পর্যন্ত ভাড়া দেবেন।

অভেদানন্দ লিখেছেন, "অগত্যা আমরা রামবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম — পরে আমরা যাইবো কোথায়? রামবাবু আমাদের সকলকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন — তোমরা যে যাহার ঘরে ফিরিয়া যাইবে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, অস্থি তাহা হইলে কোথায় রাখা হইবে? রামবাবু বলিলেন, কাঁকুড়গাছিতে তাঁহার যোগোদ্যানে, সেইখানেই শ্রীশ্রীঠাকুরের অস্থি সমাধি দেওয়া হইবে।"

অভেদানন্দ লিখেছেন, "ইহা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ আমরা সকলে অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। .....রামবাবু কিন্তু কোনও কথাই শুনিলেন না। .....তিনি তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত আমাদিগকে জানাইয়া সেই রাত্রেই বাড়ি ফিরিয়া গেলেন।

"রাত্রি অধিক হইল। নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ আমরা সকলেই নির্বাক হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের অস্থিকলসের চতুর্দিকে বসিয়া আকাশপাতাল চিন্তা করিতেছি। এমন সময় নিরঞ্জন বলিল : 'আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের পূত অস্থি কিছুতেই রামবাবুকে দিব না।' আমরা নিরঞ্জনের সহিত একমত হইলাম। নরেন্দ্রনাথ আমাদের নানা কথায় সান্ত্বনা দিয়া বলিল, 'তোমাদের যা অভিমত, আমারও তাই।' এখন আমরা সকলে স্থির করিলাম, 'শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র অস্থির বেশি অংশ কলস হইতে বাহির করিয়া একটি কৌটাতে রাখিয়া ওই কৌটা বাগবাজারের ভক্ত বলরাম বসুর বাড়িতে লুকাইয়া রাখা হউক এবং রামবাবু যেন ঘুণাক্ষরে সেই কথা কোনরকমে না জানিতে পারেন।'

অভেদানন্দ লিখছেন, " ....সেই রাত্রে কলস হইতে প্রায় সমস্ত অস্থি বাহির করিয়া একটি কৌটায় রাখা হইল এবং যৎসামান্য অস্থির গুঁড়া, ভস্ম ও গঙ্গামৃত্তিকা সেই তামার কলসিতে রাখিয়া দেওয়া হইল। তাহার পর নরেন্দ্রনাথ বলিল, 'দ্যাখো, আমাদের শরীরই শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন্ত

সমাধিস্থল। এসো, আমরা সকলে তাঁর পবিত্র দেহের ভস্ম একটু করে খাই আর পবিত্র হই।' নরেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথমে কলসি হইতে সামান্য অস্থির গুঁড়া ও ভস্ম গ্রহণ করিয়া 'জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া ভক্ষণ করিল। তাহার পর আমরা সকলেই তাহাকে অনুসরণ করিয়া নিজেদের ধন্য জ্ঞান করিলাম।''

''এরপর?'' জিজ্ঞেস করলেন ভবনাথ সেন। অভেদানন্দর স্মৃতিকাহিনীর এই অংশটি তাঁর জানা ছিল না।

পিকলু বললো, ''বিভিন্ন সূত্রে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে অস্থিকলসের ভ্রমণ বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে। ৮ ভাদ্র জন্মাষ্টমির দিনে ব্যাপারটা ঘটলো। শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন নরেন্দ্রনাথ। সকলেই সঙ্কীর্তন করছেন।''

অভেদানন্দ বলছেন, ''রামবাবু তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই যেতে লাগলেন। শশী (পরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) অস্থি কলসটি সযত্নে মস্তকে ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে আমাদের সহিত অগ্রসর হইতে লাগিল। ....সেই দিন রাত্রে আমরা সকলেই যোগোদ্যানে থাকিয়া গেলাম।''

পিকলু বললো স্বামী অভেদানন্দ তাঁর লেখায় খবরের কাগজের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। শোভাযাত্রার অগ্রে খোলকরতাল শিঙ্গাসহ থিয়েটারের কয়েকজন অভিনেতার সঙ্কীর্তন দল, পরে পাখোয়াজ দল। শিষ্যেরা ক্রমান্বয়ে কলসটি মস্তকে ধারণ করে চলেছেন।

এরপর একই বিষয়ে লাটু মহারাজের স্মৃতিচারণ বেশ নির্ভরযোগ্য। এঁর সন্ন্যাস নাম স্বামী অদ্ভুতানন্দ। কাঁকুড়গাছির সমাধিগহ্বরে পূতাস্থির কলসটি রেখে তার ওপর মাটি ফেলা হচ্ছিল। শশী আর্তনাদ করে উঠলেন, ''ওগো ঠাকুরের গায়ে বড় লাগছে।'' সেই কথা শুনে সকলের চোখে জল।

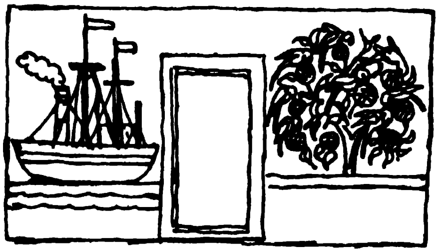
পিকলু বললো, ''কাশীপুরে কল্পতরুর দিনে বংশগোপালবাবুর দিনলিপিতে যা লেখা রয়েছে অভেদানন্দের স্মৃতিচারণায় তার সম্পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে দাদু। ঠাকুর সেদিন কাউকে বললেন, তোমাদের চৈতন্য হোক। কাউকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'তোর হবে।' বসুমতীর উপেন মুখুজ্যে গরিব অবস্থায় ছিলেন, তিনি অর্থ প্রার্থনা করলে ঠাকুর কৃপা

করে জানালেন, 'তোর অর্থ হবে। অর্থ হয়েছিল। কিন্তু শোনা যায় তাঁর সুখ হয়নি। ঠাকুর কাউকে আবার বলছেন, 'পূর্ণ হবে।'''

ভবনাথবাবু মন্তব্য করলেন, ''আত্মারামের কৌটো কথাটা খুব মজার। মৃত্যুর পরেও রসরসিকতা। এই রসিক ভাবটাই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে এমন প্রাণবন্ত করে রেখেছে। হোমড়া মুখো গুরুর গোমড়া বাণী কে শুনে সুখ পায়?''

বহু বছর ঘোরাঘুরি করে এই আত্মারাম যে শেষ পর্যন্ত বেলুড় মঠে চিরআশ্রয় পেলো তা আমরা ভালভাবেই জানতে পারছি।

পিকলু বললো, ''প্রয়োজনে আমাদের বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির ঘুরে আসতে হবে। যেদিন মঠের নতুন জমিতে পূতাস্থি প্রতিষ্ঠা করলেন, সেদিন বিবেকানন্দ প্রকাশ্যে জানিয়েছিলেন, 'ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, তুই কাঁধে করে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই যাব ও থাকব। তা গাছতলাই কি, আর কুটিরই কি।' সেইজন্যে আমি স্বয়ং তাঁকে কাঁধে করে নতুন মঠভূমিতে নিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয় জানবি, বহুকাল পর্যন্ত 'বহুজন হিতায়' ঠাকুর ওই স্থানে স্থির হয়ে থাকবেন।''



হরিময়বাবু ও পিকলু মোটরবাইকে সল্ট লেক থেকে হিদারাম হালদার লেনে ফিরে আসছেন।

হরিময়বাবু এখন একটু গম্ভীর গম্ভীর ভাবেই বললেন, "নিজেদের অজান্তেই একটা সিরিয়াস সমস্যায় আমরা ক্রমশ জড়িয়ে পড়ছি। আমার তেমন ভাল মনে হচ্ছে না, পিকলু। ১৮৮৬ সালে শ্রীদন্ত সংগ্রহ করে, ১১১ বছর পরেও এই ১৯১৭ সালে পরিস্থিতি সামলাতে পারছেন না বংশগোপালের সুযোগ্য বংশধররা।"

"কী দরকার ছিল বাপু, এইসব মহাপুরুষ শরীরে নজর দেওয়ার? মহামানবদের নিয়ে খেলতে গেলে ফল কখনই ভাল হয় না, পিকলু। বংশগোপালের পারিবারিক শোক, পারিবারিক আঘাত, পারিবারিক মানসিকতা দিয়ে মনে হচ্ছে কিনা কোথায় একটা গুরুতর অন্যায় হয়ে গিয়েছে। এবারের বংশগোপাল কাহিনী থেকে আমাদের এইটাই শিক্ষা।"

পিকলু বললো, "সমস্যার সমাধান এখনও হয়নি। এখনও অনেক কিছুই আমরা জানি না। অনুসন্ধান চালাতে চালাতে আরও অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে আমাদের, হরিময়দাদা। এখনও আমরা জানি না, ঠাকুরের দাঁত আদৌ অক্ষত আছে কি না, এবং থাকলেও সেটা কোথায় লুকনো? বুদ্ধের দাঁত নিয়ে পৃথিবীতে যা কেলেঙ্কারি হয়েছে ভাবলে লজ্জা

লাগে। ভারতের মাটিতে ক্রিশ্চানরাও কীরকম নিপীড়কের ভূমিকা নিয়েছিল তার একটা প্রমাণ এই বুদ্ধদন্ত ধ্বংসকথা।"

হরিময়বাবু বললেন, "সাধারণ খ্রিস্টানরা নন, মিশনারি প্রচারকরা। নরেন্দ্রনাথের জীবনও দুর্বিষহ করে তুলেছিলেন তাঁরা। বরাহনগরে এঁরা তো প্রস্তাব দিয়েছিল, তোমরা ধর্মান্তরিত হও, হাতে অনেক মেমসায়েব আছে বিবাহাদি করে সুখে থাকতে পারবে। এই না শুনে এক ভক্ত এমন তেড়ে গেলো যে প্রচারকরা ল্যাজ তুলে দৌড়।"

এরপর হরিময়বাবু বললেন, "যতোই এই শ্মশান থেকে দাঁত চুরির সমালোচনা করো বংশগোপাল বিশ্বাস মশায়ের দূরদৃষ্টি ছিল, মিস্টার পিকলু। ঠিক বুঝেছিলেন, নাইনটিন নাইনটি সেভেনে রামকৃষ্ণ মিশনের সেনটেনারি, ওই সময় ঠাকুর সম্বন্ধে বিশেষ ঔৎসুক্যের নতুন ঢেউ উঠবে। সেই ঢেউ শুধু বেলুড়ে আছড়ে পড়বে না, তার প্রভাব ছড়িয়ে যাবে দুনিয়ার সমস্ত প্রান্তে। রামকৃষ্ণের এবং বিবেকানন্দর জীবনের ছোটখাটো এবং বড়বড় ঘটনা জানবার জন্য সাধারণ মানুষের ঔৎসুক্যের শেষ থাকবে না।"

পিকলু বললো, "ছোট এবং বড় দুই ব্যাপারেই আগ্রহ ক্রমশ বেড়ে চলবে, হরিময়দাদা। পূতাস্থি সম্বন্ধে খবর করতে গিয়ে দেখি, একজন জার্নালিস্ট খোঁজ করছেন। মিনার্ভা থিয়েটারের কাছে কোন রেস্তোরাঁয় নরেন্দ্রনাথ তাঁর দলবল নিয়ে ফাউল কাটলেট খেতে গিয়েছিলেন এবং ফিরে এসে ঠাকুরের কাছে সেই খাওয়ার রিপোর্ট দিয়েছিলেন এবং সুরসিক ঠাকুর সস্নেহে তাঁদের প্রশ্রয় দিয়েছিলেন।"

বেলুড়ে গিয়ে একজন সন্ন্যাসীর কাছে আরও কিছু খবর পেয়েছে পিকলু। "ঠাকুরের শরীরের আরও কিছু নিদর্শন এখনও রয়েছে। যেমন, ভগিনী নিবেদিতার দেওয়া একটা জার্মান সিলভারের কৌটায় ঠাকুরের কেশ রাখতেন স্বয়ং শ্রীশ্রী সারদামণি। এই কৌটো বাগবাজার মঠে তাঁর পুজোর ঘরে রয়েছে!"

৪২/৩ হিদারাম হালদার লেনে ফিরে এসে হরিময়বাবু এবার সহকারী বিজয়ের সঙ্গে কথা বললেন।

ওর কাছে তিনি শুনলেন, একজন সন্ন্যাসী এসেছিলেন, চমচম অফিসের দিকে তিনি অনেকক্ষণ তাকিয়েছিলেন। বিজয় যখন তাঁকে জানালো, সম্পাদক কলকাতায় গিয়েছেন, পত্রিকার লেখকদের সঙ্গে জনসংযোগ করতে তখন তিনি বিশ্বাস লজের দোতলায় চলে গেলেন।

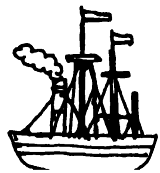
"সন্ন্যাসী! আহা! আমাদের হিদারাম হালদার লেনের বাড়িতে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের পবিত্র পায়ের ধুলো পড়ল", পুলকিত হলেন হরিময়বাবু। বিজয়কে তিনি বললেন, "মিশনের সন্ন্যাসী দেখলেই পায়ের ধুলো নেবে, আমি না থাকলেও তাঁদের মিষ্টি খাওয়াবে। সাধুসেবার মতন কোনও সেবা পৃথিবীতে নেই, বুঝেছো বিজয়?"

পিকলুর মাথায় এসব কথা ঢুকছে না। সে জিজ্ঞেস করলো, "স্বামীজি ওপরে কতক্ষণ ছিলেন?"

বিজয় জানালো, "তা অনেকক্ষণ। তারপর বোধহয় বংশগোলাপবাবুর নির্দেশে দারোয়ান ম্যানেজার সিং তাঁকে সমস্ত সম্পত্তিটা ঘুরিয়ে দেখালো।"

হরিময়বাবু আন্দাজ করলেন, "বংশগোলাপবাবুর মধ্যে নিশ্চয় বংশলোপের ভয় জন্মেছে। বসুমতীর উপেনবাবুর পরিবারে শেষ পর্যন্ত কী হয়েছে তা তো কারও অজানা নয়, আকস্মিক অকালমৃত্যু এমন সুন্দর পারিবারকে ধ্বংস করে দিলো। মনের দুঃখে বসুমতীমা চলে গেলেন পশ্চিমে। সুতরাং এক্ষেত্রে মঠমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা তো বংশগোলাপবাবুর পক্ষে সুবিবেচনার কাজ।"

পিকলুর মাথায় এখনও এসব ঢুকছে না। সে বললো, "একটু শুয়ে নেওয়া যাক হরিময়দাদা। বংশগোলাপবাবুর সঙ্গে ভালভাবে কথা বলতে গেলে তো মাঝরাতে কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে বিছানা থেকে উঠে তাঁর ঘরে টোকা মারতে হবে।"



মাঝরাতে দোতলার ব্যালকনিতে বসে পিকলুর সঙ্গে বংশগোলাপ বিশ্বাসের অনেক কথা হলো। ভদ্রলোকের শরীর খারাপ। স্টোর রুমে পিতৃপুরুষদের পুরনো কাগজপত্র অনুসন্ধান করতে গিয়ে সম্প্রতি প্রচুর ধুলো খেয়েছেন। প্রথমে হাঁচির পর হাঁচি। তারপর নাক দিয়ে জল। আরও কিছুক্ষণ পরে হাঁপানির প্রবল আক্রমণ।

"অর্ডিনারি ধুলো তো নয়, বুঝতেই পারছেন। হাফ এ সেঞ্চুরি আগেকার ধুলো। বিষের মতন হয়ে গিয়েছে। অথচ ধুলো ঘেঁটে তেমন কিছু লাভ হলো না। প্রপিতামহের প্রত্যেক মাসের হিসেবের খাতা পরীক্ষা করে শিবপুর বাজারে কবে বেগুনের দর কত ছিল তা জেনে আমি কী করবো? এসব জঞ্জাল জমিয়ে রেখে জায়গা নষ্ট করার কোনও মানে হয় না, মিস্টার পিকলু।"

"বলবেন না ও কথা, সযত্নে রেখে দেওয়া হিসেবের খাতা থেকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের ইতিহাস খতিয়ে দেখছেন এক বিখ্যাত গবেষক। প্রায়ই দাদুর কাছে তিনি আসেন এবং হিসেব খাতা সম্বন্ধে গল্প করেন। রবীন্দ্রনাথের বউঠান আত্মহত্যা করার পর কী পরিস্থিতি হয়েছিল তা এই খরচ খাতা থেকেই পরিষ্কারভাবে আন্দাজ করা যাচ্ছে।"

বিশ্বাস লজে সাধুসমাগম সম্পর্কে কিন্তু একটা কথাও তুললেন না

বংশগোলাপবাবু। তিনি এবার প্রসঙ্গ তুললেন, নামী লোকদের ব্যবহৃত নানা জিনিসপত্তর সম্বন্ধে।

পিকলু এই কদিনেই এবিষয়ে কিছুটা বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছে। সে বললো, "জর্জ ওয়াশিংটনের চার জোড়া নকল দাঁতের হদিশ পাওয়া গিয়েছে তাতো আপনি জানেন। জর্জ ওয়াশিংটনের জিনিসপত্তর সংগ্রহের জন্য মার্কিনিরা এখন অবিশ্বাস্য দাম দিতে চায়। প্রেসিডেন্ট কেনেডির স্ত্রীর পুরনো জামাকাপড়ের দাম চড়চড় করে কীরকম উঠছে দেখছেন না।"

পুরনো জিনিসের দাম যে হুড়হুড় করে বাড়ছে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইছেন বংশগোলাপবাবু।

"শ্রীশ্রীঠাকুরের চটির দাম আদিতে ছিল পাঁচসিকে এখন নিশ্চয় পাঁচলাখ টাকা।" বললো পিকলু। এই চটি কিনে দিয়েছিলেন এক চিকিৎসক। বেলুড়ে গিয়ে ঠাকুরের চটি দেখে এসেছে পিকলু।

কলকাতায় আরও কিছু খোঁজখবর নিয়েছে পিকলু। বিবেকানন্দ বিষয়ক দামি সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে মিস জোসেফিন ম্যাকলাউডের লকেট, যা তৈরি হয়েছিল প্যারিসের বিখ্যাত মণিকার লালিক কোম্পানিতে। এই লকেটের মধ্যে ট্যানটিন অর্থাৎ মিস ম্যাকলাউড সযত্নে রেখেছিলেন তাঁর বন্ধু বিবেকানন্দর কেশগুচ্ছ। এই কেশগুচ্ছ তিনি আচমকা কেটে নিয়েছিলেন বিবেকানন্দ যখন আমেরিকায় ছিলেন। স্বামীজি তো প্রথমে একটু বিরক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু মিস ম্যাকলাউড সস্নেহে মুখের ওপর বললেন, "অনুমতি চাইলে আপনি তো দিতেন না, তাই ক্যাঁচ করে চুল কেটে কাজ সেরেছি।"

এই মহামূল্যবান লকেট একবার চুরি হয়ে যায় বেলুড় মঠ থেকে। মিস ম্যাকলাউড তখন মঠে অবস্থান করছেন। চোর এসেছিল রাত্রে। কিন্তু হাতে নাতে ধরা পড়ে যায়। এনিয়ে অনেক মজার কাণ্ড হয়েছিল। মঠের চোর তো।

আর একবার মিস ম্যাকলাউডের এই লকেট হারিয়ে যায় মায়াবতী আশ্রমে। সন্দেহ করা হলো চুরি হয়েছে। পুলিশ এসেই হইচই বাধালো,

অনেক নির্দোষ কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পরিবেশ বিষাক্ত করে তুললো। পুলিশের হাত থেকে কর্মীদের রক্ষে করতে গিয়ে সন্ন্যাসীদের লজ্জার শেষ নেই। অবশেষে লকেট ফেরত পাওয়া যায় অপ্রত্যাশিতভাবে এক বছর পরে। মিস ম্যাকলাউড তখন এদেশে নেই। এই লকেটের দাম এখন কয়েক লক্ষ টাকা।

এ ছাড়াও আছে বিবেকানন্দর আংটি, যা মিস ম্যাকলাউড সস্নেহে প্রায় কেড়ে নিয়েছিলেন বিবেকানন্দর কাছ থেকে। এই বলে যে সন্ন্যাসীর হাতে আংটি? প্রশ্ন শুনেই বিবেকানন্দ হাসিমুখে এই আংটি দিয়ে দিয়েছিলেন জোসেফিনকে। এই আংটির মধ্যেও বিবেকানন্দকেশ রেখেছিলেন মিস ম্যাকলাউড। সেই আংটি নানা দেশ ঘুরে এখন রয়েছে কলকাতায়, তবে কোথায় এবং কার কাছে আছে তা পিকলুর জানা থাকলেও বলা চলবে না। খবরটা প্রকাশ করবার অনুমতি নেই।

বিবেকানন্দ লকেটের দাম যদি দশ লাখ হয়, তা হলে ঠাকুরের পবিত্র দন্ত কত গুণ মূল্যবান হতে পারে তা বিলেতের ভ্যালুয়েশন বিশেষজ্ঞ ছাড়া কারও পক্ষে হিসেব করা সম্ভব নয়। লন্ডনে সদবি কোম্পানিতে পিকলুর বন্ধুর মা কাজ করেন, তাঁরা খোঁজখবর নিয়ে হয়তো কাজটা করতে পারেন। দেখা গেছে সেন্টিমেন্টের জিনিস হলে, হুড়মুড় করে দাম্ বেড়ে যায়।

অনাবাসী কোনও ভক্ত হয়তো সহজেই মিলিয়ন ডলার দিতে রাজি হয়ে যাবেন। আর সদবির বিখ্যাত নীলামে চড়ালে দাম শেষ পর্যন্ত কোথায় উঠতে পারে তা স্বয়ং সদবিও জানেন না। কয়েক মিলিয়ন ডলারের মালিক এমন রামকৃষ্ণভক্ত বিদেশে অবশ্যই আছেন। কিন্তু ঠাকুর ঐ টাকাকড়ির হিসেবই জানতেন না। কামিনী-কাঞ্চন এড়িয়ে তিনি নিজের জীবনকে সহজ করে নিয়েছিলেন।

মিলিয়নটা আবার হরিময়বাবুর গোলমাল হয়ে যায়। তিনি জানতে চাইলেন, "মানে দশ লাখ, আর বিলিয়ন হাজার লাখ, তাই তো? তার মানে, মিলিয়ন্ হলেই আমাদের টাকায় দাঁড়াচ্ছে চার কোটি টাকা। নট এ

ব্যাড অ্যামাউন্ট। কী বলেন বংশগোলাপবাবু? দেখুন ঠাকুরের দয়ায় আপনাদের পরিবার আবার কোথায় উঠে যায়?"

বংশগোলাপের মুখে কিন্তু কথা ফুটছে না। তিনি বললেন, "চাকরি থেকে স্বেচ্ছাঅবসর নিয়ে আমি হাতে পেয়েছি মাত্র দু লাখ পঁচিশ হাজার। তা হলেই বুঝতে পারছেন তফাতটা!" বংশগোলাপ যেন স্বপ্নের মধ্যে ডুবে যাচ্ছেন।

এবার পিকলু সোজাসুজি বংশগোলাপকে জিজ্ঞেস করলো, "আজ কোনো সন্ন্যাসী এসেছিলেন আপনার কাছে?"

প্রশ্ন শুনে বংশগোপাল প্রথমেই অবাক হয়ে গেলেন। "আপনি একেবারে রহস্যসন্ধানী ডিটেকটিভের মতো কথা বলছেন, মিস্টার পিকলু। মাথায় টুপি থাকলে বলতাম, হ্যাটস অফ্ টু ইউ!"

বংশগোলাপ ব্যাখ্যা করলেন, "খবরটা দেখছি চাউর হচ্ছে ক্রমশ। কয়েকজন স্বামীজি নিষ্ঠার সঙ্গে রামকৃষ্ণ মর্তলীলা সম্বন্ধে সারাক্ষণ গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদেরই একজন আজ বেলুড় মঠ থেকে ফোন করেছিলেন। কোথাও যদি শ্রীশ্রীঠাকুর সম্পর্কে অপ্রকাশিত কিছু তথ্য বা দলিল থাকে ত তাঁরা দেখতে চান। তা উনিই পাঠিয়ে দিলেন তরুণ সন্ন্যাসীকে।"

পিকলু ঘর থেকে বেরিয়ে এলো গম্ভীর হয়ে। হরিময় লক্ষ্য করলেন, পিকলুর মুড খারাপ হয়ে গিয়েছে। হরিময়বাবু প্রশ্ন করলেন, "ব্যাপারটা কী মিস্টার পিকলু? মঠের সন্ন্যাসী, সে তো খারাপ ব্যাপার নয় — সাধুসঙ্গ বলে কথা।"

পিকলু এখন একটু বিরক্ত। "স্বয়ং স্বামী প্রভানন্দকে নিয়ে মিথ্যাচার চলছে। আজই আমি বেলুড়ে গিয়েছিলাম। স্বামী প্রভানন্দ রয়েছেন মাদ্রাজে, গুরুতর চোখের অসুখে প্রায়ই কষ্ট পাচ্ছেন। ডাক্তার বদ্রিনাথের ওখানে চিকিৎসা চলেছে। আর বংশগোলাপ বললেন কি না বেলুড় থেকে স্বামীজী ফোন করলেন। ব্যাপারটা মোটেই ভাল মনে হচ্ছে না, হরিময়দাদা।"

হরিময়বাবুর সরল মন। অবিশ্বাস তাঁর সহজে আসে না। মানুষকে

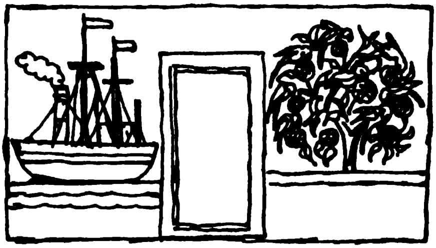
বিশ্বাস করেই তিনি জগৎ থেকে চলে যেতে চান। তিনি তাঁর কাজের লোক বিজয়ের কাছে শুনেছেন, যে-স্বামীজি বংশবাটিতে এসেছিলেন তাঁর নাম স্বামী বহুরূপানন্দ।

পিকলুর কাছে এই নামটাও যেন কেমন কেমন ঠেকছে।

হরিময়বাবু এবার বললেন, "রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনে সন্ন্যাসীর সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে, এতো সন্ন্যাস নাম কোথায় পাওয়া যাবে, পিকলু? তোমার দাদু ব্যাপারটা নিয়ে মজার গপ্পো লিখেছিলেন চমচমে। তাতে চরিত্র ছিল — গ্রহণানন্দ, হরণানন্দ, ভ্রমানন্দ। এসব শুনলেই তরুণ পাঠকদের সন্দেহ শুরুতেই প্রবল হয়ে ওঠে। গল্পটা গোড়া থেকেই জমে গেলো। যদিও এই গল্পের প্রধান খল চরিত্র স্বামী ভোজনানন্দ, যিনি রোস্ট চিকেন না খেলে জপে বসতে পারেন না!"

পিকলুর অস্বস্তি কাটছে না। হরিময়বাবু বললেন, "হয়তো খোদ উদ্বোধন পত্রিকাতেই বংশগোলাপের বিস্ময়করকীর্তি সম্পর্কে সুচিন্তিত সুসম্পাদিত কোনও প্রবন্ধ লেখা হবে।"

"উদ্বোধন বেলুড় থেকে প্রকাশিত হয় না, দাদু। উদ্বোধন অফিস দীর্ঘদিন ধরে বাগবাজারে। বাগবাজারে — সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ মহাপণ্ডিত লোক। দাদুর খুব চেনা। স্বামীজির ভারত প্রত্যাবর্তনের তাৎপর্য সম্পর্কে দাদুর লেখা নিজের হাতে নিয়ে গিয়েছেন। পূর্ণানন্দের পরিচালনায় উদ্বোধনের পাঠকসংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছে।"



পরের দিন সকালে পিকলু চা খেতে খেতে স্বামী বহুরূপানন্দর আরও বিস্তারিত খোঁজ নিয়েছে বিজয়ের কাছে।

বিজয় বর্ণনা দিচ্ছে এই স্বামীজির, আর পিকলু স্কেচ আঁকছে কাগজে, আর দেখাচ্ছে বিজয়কে -- "এই রকম?"

পিকলুর আঁকা ছবি দেখে হরিময়বাবু ভীষণ খুশি। তিনি বললেন, "এই রকম ছবি যে আঁকতে পারে সে চমচমের জন্যে ইলাসট্রেট করে না তা আমি ভাবতে পারছি না।"

এবার একটা ছবির ঠোঁটে একটা দাগ এঁকে দিলো পিকলু। বিজয়কে জিজ্ঞেস করলো, "এই রকম?"

বিজয়ের এবার মনে পড়ে গেলো, উপরের ঠোঁটে ডানদিকে একটা লম্বা কাটা দাগ আছে বেঁকানো ভাবে। এই দাগটা মানুষের নজরে না পড়ে যায় না।

পিকলুর চোখ দুটো এবার উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। "আমাদের এবার একটু সাবধান হতে হবে, হরিময়দাদা। রামকৃষ্ণ রহস্যটা আর স্রেফ রহস্য থাকছে না! সেই সঙ্গে গুরুতর কিছু ঘটতে চলেছে।"

আজ বিকেলে বিজয় আবার লেখক চিরন্তন চ্যাটার্জির কাছে চমচমের জন্য ধারাবাহিকের কিস্তি আনতে গিয়েছে। লেখা নিয়ে কখন সে ফিরতে

পারবে তা কেউ জানে না।

সূর্যাস্তের পর হরিময়বাবু নিজেই মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে, জুতো খুলে একটা পাত্রে বাতাসা নিয়ে বিশ্বাসলজের প্রাঙ্গণে বংশগোপাল প্রতিষ্ঠিত তুলসীমঞ্চে হাজির হলেন। প্রদীপগুলো একে একে জ্বালিয়ে দিয়ে তিনি বাতাসা ছড়ালেন।

পিকলু বললেন, "মাথায় একটা আইডিয়া এসে গিয়েছে হরিময়দাদা। প্রতিদিন প্রদীপ জ্বালানো হাঙ্গামায় না গিয়ে পাঁচটা বিদ্যুৎবাতির ব্যবস্থা করলে কেমন হয়? সুইচ টিপে সন্ধে দেওয়া যেতে পারে তুলসীমঞ্চে।"

হরিময় বললেন, "সুইচ টিপেদেয়া আর ভক্তিভরে তুলসীমঞ্চে পঞ্চপ্রদীপ প্রতি সন্ধ্যায় জ্বালানো এক কথা নয়। বংশগোপালবাবু যখন আমাকে এই দায়িত্ব দিয়েছিলেন তখনও তো বিজলিবাতি ছিল হাওড়ায়। কিন্তু প্রদীপ ইজ প্রদীপ। সি ই এস সি ইজ সি ই এস সি। আমি ভদ্রলোকের সেন্টিমেন্টে ঘা দেবো না। আমার এক এক সময় জানতে ইচ্ছে হয়, কেন তিনি চমচমকে পাঁচশিকে ভাড়ায় দীর্ঘদিনের জন্যে রাখতে গেলেন। চমচমের প্রতি ভালবাসা তো আছেই, কিন্তু তার থেকে বেশী প্রতিদিন সাঁঝের বাতি কে জ্বালাবে এই তুলসীমঞ্চে? বাঙালি জীবনের ধারাবাহিকতার সঙ্গে এর অদৃশ্য সম্পর্ক রয়েছে।

হরিময়বাবু দেখলেন, দোতলার বারান্দা থেকে বংশগোলাপ উদাসভাবে তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যা দেওয়া লক্ষ্য করছেন।

একটু পরেই বংশগোলাপ বিশ্বাস নিজেই নীচে নেমে এলেন। তুলসীতলায় তখনও কয়েকটি প্রদীপ জ্বলছে। হরিময়বাবু একটা বাতাসা এগিয়ে দিলেন তাঁর দিকে।

বংশগোলাপ জিজ্ঞেস করলেন, "এই তুলসীতলা বাঙালিদের জীবনে কেন ইমপর্টান্ট বলুন তো?"

হরিময় হাঙ্গামায় গেলেন না, বললেন, "ভবনাথবাবুকে জিজ্ঞেস করতে হবে। তবে বঙ্গজীবনের অঙ্গ এই তুলসীতলা।"

"সে তো মশাই বোরোলীন সুরভিত অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রিম!" হেসে উঠলেন বংশগোলাপ বিশ্বাস।

"পুজোকে পুজো, ওষুধকে ওষুধ, গার্ডেনিংকে গার্ডেনিং — তুলসীমঞ্চ গৃহস্থর কাছে ভীষণ এক ব্যাপার। রামকৃষ্ণ মিশনেও এক বড় সন্ন্যাসী ছিলেন তুলসীমহারাজ। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, শশীমহারাজের সঙ্গে কাজ করবার জন্যে দক্ষিণ দেশে চলে গিয়েছিলেন। পিকলুর চাপে পড়ে আমাকে অনেক সন্ন্যাসীর কথা মনে রাখতে হচ্ছে।"

পিকলু ছেলেটি সম্পর্কে আজ বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছেন বংশগোলাপ। "ভেরি ব্রাইট ইয়ংম্যান," তাঁর মুখ দিয়েই মন্তব্যটা বেরিয়ে এলো। "সব ব্যাপারেই ভীষণ জানবার ইচ্ছে, খুঁটিয়ে দেখবার বাসনা।"

"বম্বেতে বড় হয়েছে তো। ওখানকার হাওয়াটা একটু অন্য রকমের।" ব্যাখ্যা করলেন হরিময়বাবু।

হরিময় হাসিমুখে বাড়তি কিছু মন্তব্য করলেন। "ডবল ব্রাইট! পিতামহ হচ্ছেন স্বয়ং ভবনাথ সেন, বাংলা কথাসাহিত্যের মুকুটহীন সম্রাট। আর মাতামহ পুলিসের মুকুটপরা কর্তা-- সি-আই-ডি-র প্রধান। আগেই ছিলেন কফিপোসাতে।"

"সেটা কি জিনিস? ছাপোষা কথাটা শুনেছি, কিন্তু কফিপোসা!" ভ্রূকুঞ্চিত বংশগোলাপ প্রশ্ন তুললেন।

হরিময় বললেন, "বিদেশি মুদ্রা ইত্যাদি নিয়ে যারা হেরাফিরি করে, বিদেশে যারা বেআইনী মাল পাঠায় তাদের জন্যে সরকারী জাঁতাকল! পিকলুর পুলিশ দাদুকেও অনুরোধ করেছি। সামনের বছরে অবসর নিয়ে ধারাবাহিক চমচমে লিখবেন-- 'খারাপ লোকের সন্ধানে।' দেখবেন, বেস্টসেলার হয়ে যাবে। অনেক লোকশিক্ষা থাকবে। ওই বই পড়লে দুষ্ট এবং লোভী লোকের খপ্পর থেকে যে কোনো ভাল লোকে সহজেই বেরিয়ে আসতে পারবে।"

বংশগোলাপ বললেন, "আমার এসব ক্রাইমের ব্যাপার আর ভাল লাগে

না। হাওড়া শিবপুরের সম্পত্তিটার একটা গতি করে দিয়ে পাকাপাকিভাবে বেনারসে চলে যাবো। প্রপিতামহ্ তাঁর অনাগত বংশধরদের বড়লোক করতে চেয়েছিলেন, আমি ওসব চাইছি না। আমি স্রেফ একটু শান্তি চাইছি, হরিময়বাবু।"

"বংশগোপালকে আপনার এতো ভয় কেন, বংশগোলাপবাবু?" গম্ভীরভাবে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন হরিময়।

"নিজের প্রপিতামহ্কে কেন আমি ভয় পাবো? তিনি তো আঘাত যা পাবার তা নগদেই পেয়েছেন-- প্রথম সন্তানের অকালে মৃত্যু, একমাত্র পৌত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু। আমি ভয় পাই অন্য-- আমার ভয়টা কোথায় তা মুখে আনতেও সাহস হয় না। ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য মহাপুরুষরা জীবিতকালেও খেলা দেখান। আবার মৃত্যুর পরেও খেলা দেখিয়ে চলেন। এঁদের খুব কাছে এসে, এঁদের জীবনের সঙ্গে অযথা জড়িয়ে পড়া গৃহীলোকদের পক্ষে মঙ্গলদায়ক নয়, হরিময়বাবু।"

একটু থেমে বংশগোলাপ বিশ্বাস বললেন, "আপনাকে গ্যারান্টি দিতে পারি এখানে আমার একটুও ভয় নেই। এই হিদারাম হালদার লেনের সম্পত্তি কেনবার পার্টি আমি পেয়েছি, অনাবাসী মিস্টার সামতানির কাছে বেচে দিয়ে সহজেই চলে যেতে পারি। আপনাকেও কিছু অর্থ দিয়ে দেবো, সেই টাকায় আপনি সল্টলেকে ছোট একটা প্লট চমচমের জন্যে নিয়ে নিতে পারবেন। কিন্তু ওই যে বংশ তুলে কথা-- নির্বংশ হওয়ার অভিশাপ, ওটা ভাল কথা নয়।'

হরিময়বাবু দুঃখ করলেন, "ব্যাপারটা যে বুঝেও বোঝা যাচ্ছে না! ঠাকুরের মহাসমাধিকালে তাঁর মহামূল্যবান দাঁত বংশগোপালবাবু নিজের কাছে লুকিয়ে ফেললেন, কিন্তু দাঁতটা শেষপর্যন্ত কোথায় গেলো?"

•

"আমি এখনও বুঝে উঠতে পারিনি মশাই, স্বামী বহুরূপানন্দকে সব কিছু আমি ব্যাখ্যা করেছি। বলেছি, শ্রীশ্রীঠাকুরের হারিয়ে যাওয়া দাঁত

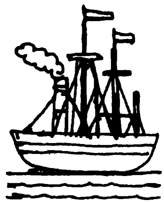
উদ্ধার হলে সে দাঁত রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের হাতে তুলে দেবো, একটি মাত্র শর্তে-- তাঁদের ঠাকুর, ওই মিস্টার আত্মারাম এই বিশ্বাস ফ্যামিলির দিকে আর রোষদৃষ্টি দেবেন না।"

"রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন কী করতে পারে, বংশগোলাপবাবু?" হরিময়বাবু প্রতিবাদ করলেন। "শত্রু হোন, মিত্র হোন, মঠের সন্ন্যাসীরা তো তাঁদের লক্ষ্যের কথা ঘোষণা করে দিয়েছেন-- নিজের মুক্তি এবং জগতের হিত। অহিতের তো কথাই ওঠে না। সেই জন্যেই তো এতোলোক কারণে অকারণে সঙ্ঘকে নিন্দা করে যেতে পারে। আত্মপক্ষ সমর্থন যে সন্ন্যাসীর স্বধর্ম নয় সেকথা তো স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত বলে গিয়েছেন। লোকে সেই বুঝে, আরও নিন্দা করেছে, আরও কুৎসা রটিয়েছে। আমার মনে হয় না, রামকৃষ্ণ মিশন আপনাকে সাহায্য করতে পারবে।"

"পারে।" আমি শুনলাম মিস্টার পিকলুর কাছে-- সঙ্ঘই ঠাকুরের শরীর। সঙ্ঘ শরীরেই তিনি নাকি বেঁচে আছেন ভেরি মাচ। সঙ্ঘ যা স্থির করবে তা-ই হবে ঠাকুরের সিদ্ধান্ত-- স্রেফ অঙ্কের ব্যাপার, বুঝলেন হরিময়বাবু।"

"এটা আমার জানা ছিল না, জেনে বেঁচেছি। অজানা অভিশাপের বোঝা বইতে শরীর আর চায় না, মন বড়ই ক্লান্ত। মনে রাখবেন, বংশগোপাল এবং তাঁর বংশধররা ১৮৮৬ সাল থেকে এই বোঝা বহন করে চলেছে। তারা এখন মুক্তি চাইছে। শান্তি চাইছে, ক্ষমা চাইছে।"

বংশগোলাপ জানালেন, "স্বামী বহুরূপানন্দকে আমি সমস্ত পুরনো কাগজপত্তর দেখিয়েছি-- উনি রাখতে চাইলেন। ম্যানেজার সিং আপনার জেরক্স মেশিন থেকে অনেকগুলো কাগজ কপি করে এনে দিলো। স্বামীজি ওইসব পড়ে, সম্পত্তিটা অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখে চলে গেলেন। বললেন, কর্তাদের কাছে রিপোর্ট করি, এখন আর কাউকে কিছু বলবেন না। চাঞ্চল্যকর ব্যাপার। কাগজে হইচই পড়ে যাবে-- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীদন্ত বলে কথা। মঠ মিশনের শতবর্ষপূর্তির বছরে এইটাই শতাব্দীর বড় ঘটনা।"



"বিশ্বাসবংশের পুরনো কাগজপত্র দলিলদস্তাবেজ আমি খুঁটিয়ে পড়বার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আর ধৈর্য নেই।" পিকলুকে বললেন বংশগোলাপ বিশ্বাস।

"ঠাকুরের জীবনের খোঁজখবর নিয়েছি। কিন্তু অতশত খুঁটিনাটি কে মনে রাখে? কে কোথায় বসেছিল? কীভাবে কেশেছিল। ঠাকুর কোন সময়ে কী পরেছিলেন, কী খেয়েছিলেন, এসব জেনে আমার কী লাভ বলো তো? ওই যে স্বামী বহুরূপানন্দ এসেছিলেন, তিনি নিজেই বললেন, ইতিমধ্যেই কাশীপুরের কল্পতরু উৎসব সম্বন্ধে কিছু মতভেদ দেখা দিয়েছে। বংশগোপালবাবু তাঁর দিনলিপিতে কেন লিখলেন না যে সেদিন সবুজ পিরানের ওপর রামলাল একখানা লালপাড় বসানো মোটা চাদর ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছিলেন? ঠাকুরের টুপিটা যে কান ঢাকা টুপি ছিল এটারও স্পষ্ট উল্লেখ নেই। এ-বিষয়ে এখনকার জীবিত বিশেষজ্ঞ যিনি সেই মহারাজের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনায় হয়তো বসতে হবে। মনে রাখতে হবে, কল্পতরু বিষয়ে রামকৃষ্ণ মঠ প্রচণ্ডভাবে উৎসাহী নয়। ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান স্বামী সারদানন্দ তো সোজাসুজি লিখেছেন, 'কল্পতরু না বলে 'আমাদিগের বোধ হয়, উহাকে ঠাকুরের অভয়-প্রকাশ অথবা আত্মপ্রকাশপূর্বক সকলকে অভয়-প্রদান বলিয়া অভিহিত করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। ...নিজ দেব-মানবত্বের এবং জনসাধারণকে নির্বিচারে

অভয়াশ্রয় প্রদানই' এই ঘটনায় সুব্যক্ত হয়েছিল।"

নোট করে নিচ্ছে পিকলু। বংশগোলাপ দুঃখ করলেন, "পুরনো কাগজের যেন শেষ নেই। কখন যে টুক করে খাতার কোণে, রসিদের পিছনে প্রপিতামহ বংশগোপাল বিশ্বাস কী লিখে রেখে গেছেন তার কোনও মাথামুণ্ড নেই। গতকাল দেখি, তাঁর লেখা একটি পাদটীকা, একটা ফুট-নোট।"

বংশগোপালের নিজের হাতে লেখা : "কল্পতরুর দিনে আমি বিফল হয়ে ফিরবার পরেও কেউ কেউ কাশীপুর বাটিতে তাঁর আশীর্বাদ পেয়েছিলেন নরেন্দ্রর সহযোগিতায়। বাগবাজারের চুনিলাল বসু বোধ হয় নরেন্দ্রর পরামর্শে রাত্রে প্রহরী নিরঞ্জনকে এড়িয়ে তাঁর শয়নমন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন। নীরব প্রার্থনার উত্তরে নিজের শরীরটা দেখিয়ে তিনি চুনিলালকে বললেন, 'এটাতে ভক্তি-বিশ্বাস রেখো, তোমারও হবে।' এই চুনীলাল কলকাতা কর্পোরেশনে কাজ করে। বসবাস রমাকান্ত বসু স্ট্রীটে—তার বাড়িতে আমি গিয়েছি। একবার চুনীর হাঁপানি রোগও সারিয়েছিলেন তিনি। চুনীর ভাগ্য ভাল, স্বয়ং নরেন্দ্র তাকে সাদরে 'নারায়ণ' বলে ডাকতো, দুর্ভাগা আমি তো কেবল 'লেট-ললিত'।"

বংশগোলাপের মনের মধ্যে বড় কিছু একটা ঘটেছে। মনের দুঃখে তিনি এবার বললেন, "কোথায় ঠাকুরের দাঁত প্রপিতামহ রেখেছিলেন তা আমি জানি না। পরধনের কোনো খোঁজ নেই, অথচ সারা বংশটা জ্বলেপুড়ে মরছে একশ বছর ধরে। ১৮৯৭ সালে বংশগোপালের প্রথম সন্তানের অকালে মৃত্যু হয়েছিল। হোয়াই?"

একটু থেমে পরম দুঃখের সঙ্গে বংশগোলাপ বললেন, "দোহাই! কোটি টাকা আমি চাই না। এই প্রপার্টি বেচলে লাখ দশেক তো পাবো? তাতেই আমি সন্তুষ্ট। শুধু এই বিশ্বাস বংশ রক্ষে হোক। এই আশীর্বাদ সবাই করুন।"

এরপর টেবিলের সামনে রাখা বংশগোপাল বিশ্বাসের সমস্ত অরিজিন্যাল কাগজগুলো পিকলুর হাতে তুলে দিয়ে বংশগোপালের

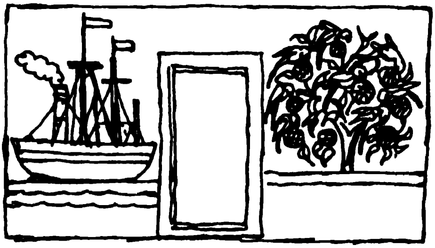
প্রপৌত্র বংশগোলাপ বললেন, "তুমি যদি কিছু হদিশ করতে পারো, দ্যাখো। এসব আমার সাধ্যের অতীত।"

সিঁড়ি দিয়ে বিশ্বাস লজের দোতলা থেকে নামবার সময় হরিময়বাবু নিচুগলায় পিকলুকে বললেন, "ওই বহুরূপানন্দর ব্যাপারটা সম্বন্ধে ওঁকে একটু সাবধান করে দিলে না?"

পিকলু বললো, "ভদ্রলোক তা হলে আরও ভেঙে পড়তেন। তা ছাড়া আমাদের সন্দেহটা গোপন রাখতে বললেন পুলিশদাদু। ওই যে ঠোঁটে কাটা দাগ! মনে আছে, প্রথম যেদিন নজর আলি লেনে স্টেটসম্যান পত্রিকায় আমার লেখা পড়ে দু'জন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলেন-- মিস্টার সামতানি আর মিস্টার সুশীতল সান্যাল? ওঁর ঠোঁটেও তো প্লাস্টিক সার্জারি হয়েছিল।"

প্রবল উত্তেজনায় হরিময়বাবু এবার পিকলুকে জড়িয়ে ধরলেন। 'ইউরেকা! পুলিশদাদুর যোগ্য রহস্যসন্ধানী নাতি তুমি পিকলু। অথচ তুমি মোটেই পুলিশ হতে চাও না, তুমি যেতে চাইছ সেল্‌সের লাইনে।"

পিকলু বললো, "পুলিশদাদু এ-বিষয়ে কিছু খোঁজ-খবর করেছেন, আরও করবেন। কফিপোসাতে চাকুরির সময় একটা ঠোঁটকাটা ডেনজারাস স্মাগলারের ফাইল দাদু দেখেছিলেন। লোকটা পুরনো জিনিসের লাইনে ঘোরাঘুরি করে, দামী ঐতিহাসিক কীর্তি সংগ্রহ করে, মাল চালান করে দেয় ব্যাঙ্ককে। তার বদলে সে ইন্ডিয়ায় আনায় চোরাই ইলেকট্রনিক সামগ্রী। প্রায়ই নাম বদলায়-- বহুরূপী বলতে পারো। কখনও বাঙালী মধ্যবিত্ত, কখনও অফিসার, কখনও বাংলাদেশী।" লোকটার একটাই অসুবিধে ঠোঁটের কাটা দাগ একেবারে মিলিয়ে যায়নি।



বেলা দশটার সময় হরিময়বাবুর কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দিলো পিকলু। "হরিময়দাদা উঠুন!"

ধড়মড় করে সুখশয্যা থেকে উঠে পড়লেন হরিময়বাবু। বললেন, "ভাই পিকলু, রাতজাগা বাড়িওয়ালার পাল্লায় পড়ে আমার বায়োলজিক্যাল ঘড়িটা একেবারেই গড়বড় হয়ে গেলো! সকাল দশটায় মনে হচ্ছে সবে রাত এগারোটা!"

পিকলুর ঘুম আগেই ছুটে গিয়েছে। ওপর থেকে আনা পুরনো কাগজপত্তরগুলো খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে সে বললো, "হরিময়দাদা, দুটো ভীষণ ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি!"

হরিময়বাবুর রিকোয়েস্ট : "একটা-একটা করে বলো ভাই, আমি তো তোমার পুলিশদাদু নই যে, একই সঙ্গে দুটো চোরকে পাকড়াও করতে ছুটবো। আমার হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়ান, একের বেশি জিনিস এই ছোট্ট ব্রেনে ঢুকতে চায় না।"

পিকলু বললো, "শুনুন, স্বয়ং নরেন্দ্রনাথ একবার গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন ঠাকুরের মহাসমাধির পরে-- শোক সামলাতে পারছিলেন না। বংশগোপালবাবু নিজে একটা কাগজে এই কথা লিখে রেখেছেন। এবং এই ব্যাপারে খুব দুঃখ করেছেন। বলেছেন, নরেন্দ্র ইচ্ছে করলেই মস্ত ব্যারিস্টার হয়ে অনেক টাকাকড়ি রোজগার করতে

পারতেন। হাজার হোক উকিল বংশের রক্ত। সমকালীন বন্ধু ডবলু সি বনার্জি তো ব্যারিস্টার হয়ে কম টাকা রোজগার করেননি।"

হরিময়বাবু বললেন, "নরেন্দ্রনাথ শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা করেননি তো? চুকে গেলো! এতো দিন পরে এসব কথা তুলে কাজ নেই। কয়েকজন স্বামীজি, শঙ্করীপ্রসাদবাবু এবং তাঁর প্রকাশক মিস্টার মণ্ডল ছাড়া আর কেউ এই খবর থেকে উপকৃত হবেন না।" হরিময়বাবু ব্যাপারটা হালকা করে দিতে চাইলেন। ভোরবেলায় অন্তত দু'কাপ চা না খাওয়া পর্যন্ত তিনি কোনোরকম উদ্বেগ সহ্য করতে পারেন না।

দ্বিতীয় আবিষ্কারটা সম্বন্ধে যথাসময়ে জানতে চাইছেন চমচম সম্পাদক।

পিকলু বিস্ফারিত নয়নে বললো, "বিলিভ ইট অর নট, বংশগোপাল বিশ্বাস প্রয়োজন হলে কবিতাও লিখতেন।"

কাঁচা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় একটু বিরক্ত হরিময়বাবু বললেন, "বাঙালির ছেলে কবিতা লিখবে এটা আর এমনকি বড় খবর ভাই? নরেন্দ্রনাথ গান লিখতেন, কবিতা লিখতেন, অভেদানন্দ মন্ত্র লিখতেন, অক্ষয় সেন পয়ারে একখানা পুরো রামকৃষ্ণ পুঁথি লিখে ফেললেন, হোয়াই নট বংশগোপাল বিশ্বাস? তিনিও তো বঙ্গমাতার আপন সন্তান।"

হরিময়বাবু যা বুঝতে পারছেন না, বংশগোপালের কবিতার বিশেষ কিছু তাৎপর্য রয়েছে। তাই পিকলু এতো আনন্দিত হয়ে উঠেছে। এগুলো শুধু কবিতা নয়, আরও কিছু।

টেবিলে রাখা বংশগোপাল রচিত কবিতা দেখতে-দেখতে পিকলু এবার হরিময়বাবুকে বললো, "আচ্ছা, বংশগোপাল বিশ্বাস কি পাঁজির খুঁটিনাটি বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন?"

হরিময়বাবু বললেন, "অবশ্যই ছিলেন। অশ্লেষা-মঘা-চন্দ্র-সূর্য এটসেটেরা নিয়ে সারাক্ষণ মাথা ঘামাতেন। ওঁর আরামকেদারার একটা হাতের ওপর সারাক্ষণ থাকতো পি এম বাগচী। একবার সেটা চাকর সরিয়েছিল বলে তুলকালাম কাণ্ড করেছিলেন। পঞ্জিকা যাঁরা লেখেন, যেমন কালী পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর বিশেষ ভাব ছিল। মাঝে মাঝে এই

পঞ্জিকাপণ্ডিতকে সম্মানী দিতেন।"

মনে হল পিকলু এবার একটু আশার আলো দেখতে পাচ্ছে। হরিময়বাবুকে এবার সে বললো, "দাদু ছাড়া এ-কবিতার রহস্যভেদ এবং পাঠোদ্ধার সম্ভব মনে হচ্ছে না। একটা ফোন করে এখনই চলে যাই।"

হরিময়বাবু বললেন, "ধাঁধা যদি হয় আমাকেও একটা চান্স দিতে পারো। চমচমের জন্যে রাত জেগে কত ধাঁধার আমি রহস্যোদ্ধার করেছি! ভবনাথবাবু ছাড়াও তুমি পুলিশদাদু রঞ্জন সেনকেও কবিতার কপি পাঠাতে পারো। সত্যজিৎ রায় তো তাঁর উপন্যাসের ধাঁধা রচনার সময় পুলিশ অফিসারের সাহায্য নিতেন শুনেছি।"

এবার কাগজটা হাতে নিলেন হরিময়। বংশগোপালের শ্রীহস্তে রচিত কবিতা তিনি ধীরে ধীরে পাঠ করতে লাগলেন :

"যত মাঠ তত আল
দেখিল যে জন
মনের মন্দিরে তাঁর
সেবা সর্বক্ষণ।
বাসাংসি জীর্ণানি
তবু কিছু রয়,
এই কথা দিনমণি
সদা কেন কয়?
দেহের সমস্ত অঙ্গ
পঞ্চভূতে লয়,
দ্বিত্রিংশ কুমুদ তবু
হাসিমুখে রয়!
দয়া কর প্রভুদেব
অগতির গতি
অভয়াচরণে যেন
রহে মতিগতি।"

"কী বুঝছেন?" গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলো পিকলু।

"হাড়ে হাড়ে বুঝছি। বংশগোপালবাবু বড় কবি নন, দু-এক জায়গায় ভয়ানকভাবে ছন্দপতন হয়েছে, কিন্তু কিছু একটা গোপন কথা অপরিচিত কাউকে ইঙ্গিতে বলতে চেয়েছেন বংশগোপাল বিশ্বাস।"

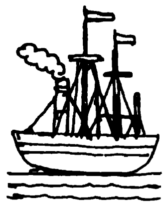
"ইঙ্গিতটা কী?" তার জন্যেই তো পিকলু সকাল থেকে মাথা ঘামাচ্ছে এবং বারবার কবিতাটা পড়ছে।

এবার হরিময়বাবু পদ্যটা মুখস্থ করে নিলেন প্রায়। তারপর বললেন, "মনে হলো বংশগোপালবাবু তাঁর বংশধরদের কোনও গোপন ইঙ্গিত দিচ্ছেন ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে।"

বেশ কিছুক্ষণ ধরে কানে পেন্সিল গুঁজে চোখ বুজে শ্রবণেন্দ্রিয়ে মৃদু খোঁচা মারলেন হরিময়। কিন্তু ধোঁয়াটে ভাবটা ঠিক স্বচ্ছ হচ্ছে না। বাসাংসি জীর্ণানিকে পিকলু আন্দাজ করেছিল বাসি জীর্ণ কোনও খাবার। হরিময়বাবু বললেন, "ওটা গীতাতে আছে, জীর্ণ বাস অথবা বস্ত্র। ওই নামে তোমার দাদু গপ্পো লিখেছিলেন চমচমে। কুমুদ কথাটি খুব খেলিয়েছেন-- এর মধ্যে যদি কিছু রহস্য থাকে তা হলে তোমার দাদু ঝট করে ধরে ফেলতে পারবেন। কবিতাটা এখনই পুলিশদাদুকে ডিকটেট করবে নাকি?"

হরিময়বাবুর চোখে এখনও ঘুম রয়ে গিয়েছে। আর-একবার হাই তুললেন এবং যেমন শুনলেন, পরের খাতাতেও আরও একটা হেঁয়ালি কবিতা রয়েছে তখন হতাশ হয়ে তিনি হাল ছেড়ে দিলেন।

পিকলু তাড়াতাড়ি শিবপুরের মোহনচন্দ্র ঘোষের বিখ্যাত কচুরি ও জিলিপি খেয়ে মোটরবাইক নিয়ে বুলেটগতিতে বেরিয়ে পড়লো সল্টলেকে দাদু ভবনাথ সেনের বাড়ির উদ্দেশে।



ঠাকুমা পিকলুকে নিয়ে একটু চিন্তিত। "কলেজের পড়াশোনায় সময় না দিয়ে ছেলেটা সারাক্ষণ বুড়োদের রহস্যময় ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছে।"

দাদু কিন্তু চিন্তিত নন, বরং তিনি হাসলেন। "ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাপারটা বুড়োদের ব্যাপার নয়। তা ছাড়া বংশগোপাল বিশ্বাসের সমস্যা নিয়ে নানারকম অভিজ্ঞতা হওয়া ভাল, চাকরি করবার সময়ে কাজে লেগে যাবে।"

বংশগোপাল বিশ্বাসের লেখা কবিতাটা বেশ কয়েকবার পড়েছেন ভবনাথ। তিনি বললেন, "প্রথম লাইনটা ভালই-- যত মত তত পথের প্যারডি বা ব্যাখ্যা বলতে পারো। তারপর :

বাসাংসি জীর্ণানি
তবু কিছু রয়

অর্থাৎ ইঙ্গিত করছেন মৃত্যুর পরেও দেহের কিছু অংশ এই পৃথিবীতে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।"

ভীষণ উত্তেজিত বোধ করছে পিকলু। ভবনাথ বারবার লাইনগুলো পড়ছেন। "সত্যজিৎ রায় বেঁচে থাকলে হয়তো আমাদের হেল্প করতে পারতেন, ওঁর এই সব বিষয়ে ভীষণ আগ্রহ ছিল। ওঁর পিতৃদেব সুকুমার রায়েরও ছিল।"

পরের পর্বে এসে কিন্তু আটকে যাচ্ছেন ভবনাথ সেন। "শতপদ্ম, সহস্রপদ্ম-- একশ এক পদ্ম দিয়ে পুজো প্রায়ই হয়, কিন্তু দ্বিত্রিংশ কুমুদ? বত্রিশটা পদ্ম দিয়ে তো কিছু হয় না, পিকলু"

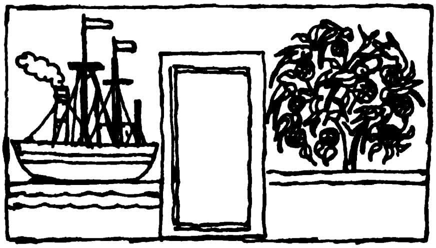
আরও আধঘণ্টা পরে ভবনাথ উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন, "পাওয়া যাচ্ছে পিকলু। বোধহয় বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা।

দেহের সমস্ত অঙ্গ
পঞ্চভূতে লয়
দ্বিত্রিংশ কুমুদ তবু
হাসি মুখে রয়।

চিতায় আগুনের উত্তাপ খুব বেশি না হলে নরদেহর দাঁতগুলো পোড়ে না-- ইয়েস মানুষের দাঁতের সংখ্যা তো দ্বিত্রিংশ অর্থাৎ বত্রিশটা! যদিও গ্রিক দার্শনিকরা হিসেবে বারবার ভুল করেছেন।"

ভবনাথ বললেন, "ব্যাপারটা এবার দিনের আলোর মতন পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, পিকলু। রেফারেন্সটা অবশ্যই দাঁতের। দন্তকৌমুদী কথাটা শুনেছো তো? ওখানে মানে হচ্ছে চাঁদের হাসি, অর্থাৎ আলোকদায়িনী, আবার দাঁতকে শ্বেতপদ্মের মতন কল্পনা করতেও বাধা নেই। সংস্কৃত সাহিত্যে কয়েকবার উল্লেখ আছে।"

"শেষ ক'টা লাইন, দয়া কর প্রভুদেব/অগতির গতি/অভয়চরণে যেন/রহে মতিগতি। স্রেফ কাব্যরসের ড্রেসিং! কিন্তু বংশগোপালের নিজস্ব রচনা নয়। যত দূর মনে হচ্ছে অক্ষয়কুমার সেনের লেখা, রামকৃষ্ণ পুঁথিতে পাওয়া যেতে পারে। বইটা আজকাল রামকৃষ্ণ ভক্তরাও পড়েন না। খুব বোকামি করেন। অথচ সাতবছর নিরন্তর সাধনা করে পুঁথিটি লেখেন অক্ষয়কুমার, শেষ হয় ১৯০১ সালে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার আগে। অক্ষয়বাবু বেঁচে ছিলেন ১৯২৩ সাল পর্যন্ত। শেষ জীবনে বসুমতীর চাকরি ছেড়ে বাঁকুড়ায় বাজে ময়নাপুর গ্রামে ফিরে গিয়ে আমৃত্যু শ্রীরামকৃষ্ণের ভজন-পূজনে নিজেকে নিবেদন করেন।"



বংশগোপালের লেখা পরের কবিতা আরও জটিল। ভদ্রলোক লিখে আবার কলমের এক আঁচড়ে লেখা কেটে দিয়েছেন। বোধহয় পাঠকদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। ঢ্যারা দিয়ে কেটে দিলে কে আর দেখবে?

এইসময় ঠাকুমা ঘরে ঢুকে বললেন, "এসবের মধ্যে এইভাবে ডুবে গেলে তোমাদের খাওয়া হবে না। দুপুরে ভাতে-ভাত করেছি, আগে খেয়ে নাও।"

ভবনাথবাবু খুব খুশি হলেন। "যখন মাথাঘামানোর কাজ করবে তখন স্রেফ ভাতে-ভাত-এর ওপরে থাকবে, ভাই পিকলু। সেই সঙ্গে বড়জোর ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণর প্রিয় আলুপোস্ত চচ্চড়ি এবং কলাই ডাল। ব্রেনটা ঠাণ্ডা থাকবে।"

ভাতে-ভাত খাওয়ার পরে পনেরো মিনিট বিশ্রাম নিয়ে ভবনাথ বললেন, "পরের কবিতাটা এবার দেখা যাক। এটা বোঝা যাচ্ছে, শ্রীশ্রীঠাকুরের দাঁতটা নিয়ে মালিক বংশগোপাল বিশ্বাস বেশ ফ্যাসাদে পড়ে গিয়েছিলেন। তিনি কী করবেন ভেবে উঠতে পারছিলেন না। ব্যাপারটা তিনি একেবারেই চাউর করেননি। খুবই গোপন রাখতে সফল হয়েছিলেন। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীদন্ত যাতে চিরতরে হারিয়ে না যায় তার জন্যে বংশধরদের কিছু ইঙ্গিত দিয়ে যেতে তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে

উঠেছিলেন। অথচ বারবার পারিবারিক অকালমৃত্যুতে জর্জরিত হয়েছিলেন বেচারা বংশগোপাল।"

ঠাকুমা কথা শুনছিলেন। তিনি বললেন, "কিন্তু সংসারের জন্যে মানুষটার কত ভালবাসা দ্যাখো। নিজের কথা চিন্তা না করে, বংশধরদের বড়লোক করার জন্যে মানুষটা কত কষ্ট সহ্য করে গিয়েছেন। ভাগ্যবান লোক, স্বয়ং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণর সান্নিধ্য পেয়েছিলেন।"

"বংশধররা কি সেসব বোঝে?" নিজের মনেই মন্তব্য করলেন ভবনাথ। "আর নিষ্ঠুর সময় তার নিজস্ব খেয়ালে আপন খেলা খেলে যায়।"

কবিতাটি আরও একবার পড়ে ভবনাথ বললেন, "মাথায় ঢুকছে না, পিকলু। বিনা দুধ এবং বিনা চিনিতে সুবোধ ব্রাদার্সের দার্জিলিং চা বিশেষ প্রয়োজন।"

পিকলুর ঠাকুমা এ ব্যাপারে সর্বদা প্রস্তুত। এরকম অর্ডার হবে আন্দাজ করেই তিনি রান্নাঘরে চায়ের জল আগেই ফুটোতে দিয়েছেন। মধ্যাহ্নভোজনের পরেও ভবনাথ সেন চা-পানে অভ্যস্ত। সুবোধ ব্রাদার্সের প্রতি দুর্বলতার জন্য তিনি রসিকতা করে নিজেকে এখন সুবোধ বালক বলেন।

গরম চায়ের সঙ্গে বেশ কয়েকবার কবিতাটা পড়লেন ভবনাথ। তারপর বললেন, "পিকলু তুমি পড়ে যাও, আমি চোখ বন্ধ করে শুনি। অনেক গভীর এবং তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত রয়েছে এই লেখায়।"

পিকলু ধীরে ধীরে বংশগোপালের রচিত কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলো :

"চতুর্দশ শতাব্দী পরে
প্রিয় সেই চতুর্থ লগ্নে,
শ্রাবণের মৃত্যুসনে
যদি আকাশ ঘনায়,

সিংহ যদি ঘাতে চন্দ্র
শুদ্ধ হবে যারা
কোন দেশে তারা?
প্রভুর মুরতিখানি
বসায়ে হৃদয়পটে
খুঁজিও রতনখানি
তুলসীর তটে।
মনোমাঝে রেখোনা
আর কোনো কামনা,
মনে রেখো ভাবনা
কুমুদের তাড়না।"

"আবার পড়ো," চোখ বুজে বললেন ভবনাথ সেন।

আবার পড়লো পিকলু। বারবার পড়তে-পড়তে কবিতাটা মুখস্থ হয়ে গেলো তার।

ভবনাথ বললেন, "গ্রেট পোয়েট্রি নয়। ছন্দের গোলমাল আছে– কিন্তু কিছু ইঙ্গিত বিশেষ অর্থবহ। এইগুলো মনে হয় বংশগোপালের প্রপৌত্র বংশগোলাপ অনেক চেষ্টা করে কোনও মানে খুঁজে না পেয়ে তোমার শরণাপন্ন হয়েছেন।"

"শুধু আমাদের শরণ নয়, দাদু। ওই যে সন্ন্যাসী এসেছিলেন তাঁর সাহায্য নিশ্চয় চাওয়া হয়েছিল। স্বামী বহুরূপানন্দ। লোকটা যেন কেমন!"

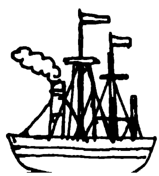
"নামটাও একটু যেন কেমন ধরনের।" স্বীকার করলেন ভবনাথ সেন।

ঠাকুমা অত সহজে মানুষকে অবিশ্বাস করতে চান না। তিনি বললেন, "কেন ঠাকুরের ওখানে তো কত অদ্ভুত নাম হতো-- হুটকো, বুড়ো গোপাল, দমদম মাস্টার, রামনেলো।"

"রামনেলো আবার কার নাম? আগে তো কানে আসেনি," বললেন ভবনাথ।

"তোমার আজকাল কিছুই মনে থাকে না। সেদিন কাঁকুড়গাছির নরেশ মহারাজ জনসভায় বললেন, ভাইপো রামলালকে মাঝে মাঝে রামনেলো বলে ডাকতেন ঠাকুর। শ্রীম অর্থাৎ মাস্টারমশায়ের আমাশয় হয়েছিল। ঠাকুর বললেন, রামনেলোর কাছে যাও, ওর কাছে ওষুধ আছে। তিন দিনে আরাম, চিঁড়ে দিয়ে খেতে হয়।"

"এসব আদরের ডাকনাম। সন্ন্যাসীদের নাম তো অনেক ভেবেচিন্তে দেওয়া হয়।" মন্তব্য করলেন ভবনাথ সেন।



অপরাহ্ন গড়িয়ে বিকেল যাবো-যাবো। রহস্য কবিতার কোনও সূত্র এখনও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

হঠাৎ ভবনাথবাবু বললেন, "১৩০৪ সালের গুপ্ত প্রেস ও পি এম বাগচীর পাঁজি দুটো নিয়ে এসো তো।"

দুটো পাঁজিই ঠাকুমার হাতের গোড়ায় থাকে। সঙ্গে সঙ্গে এসে গেলো। ভবনাথ বললেন, "প্রথমেই সঙ্কেতটা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে আক্রমণ করে দেখতে হবে। ৩১শে শ্রাবণ অর্থাৎ ১৬ই আগস্টের পাতাটা খোলো দেখি।"

১৬ই আগস্ট, ১৯৩৭ শনিবার অর্থাৎ ৩১শে শ্রাবণ ১৩০৪।। ঠাকুরের

তিরোধানের ১১১ বছর।

পিকলু বললো : "আলো পাওয়া যাচ্ছে, দাদু। চতুর্দশ শতাব্দী পরে প্রিয় সেই চতুর্থ লগ্নে-- মোস্ট প্রবাবলি-- খুব সম্ভবত। ১৩০৪-এর ইঙ্গিত রামকৃষ্ণ মিশনের শতবার্ষিকী।"

ভবনাথবাবুর নির্দেশে ঠাকুমা পাঁজি দেখে বললেন, "সিংহরাশিতে ঘাতচন্দ্রযোগ রয়েছে ৩১শে শ্রাবণ।"

"তা হলে মিলে যাচ্ছে, শ্রাবণের মৃত্যুসনে মানে মাসের শেষ দিকে, যদিও এবার বত্রিশে শ্রাবণ রয়েছে ১৭ই আগস্ট, কিন্তু ওটা পোয়েটিক স্বাধীনতা। কবিরা সময় নিয়ে সামান্য খেলা খেলতে পারেন।"

"যদি আকাশ ঘনায়? এর মানে কি?" জিজ্ঞেস করলো পিকলু।

"আরে, শ্রাবণ মাসে আকাশে মেঘ ঘনিয়ে একটু বৃষ্টি হবে, এ আর বলবার কী আছে? অর্থাৎ রামকৃষ্ণের মহাসমাধি দিনে বংশগোপাল তাঁর বংশধরদের কিছু রত্ন খুঁজতে নির্দেশ দিচ্ছেন উনিশশো সাতানব্বই সালে বা ১৩০৪ বঙ্গাব্দে।"

"চমৎকার! অঙ্কের মতন মিলে যাচ্ছে ব্যাপারটা," বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলো পিকলু।

ঠাকুমা এবার মনে করিয়ে দিলেন, আজই তো ৩১শে শ্রাবণ শনিবার অর্থাৎ ১৬ই আগস্ট ১৯৩৭।

"ব্যাপারটা ভীষণ নাটকীয় হয়ে উঠছে, ঠাকুমা। ঘড়ি মিলিয়ে যেন নাটক হচ্ছে মঞ্চে," বলে উঠলো পিকলু।

ঠিক এই সময় বেল বাজলো। ঠাকুমা দরজা খুলে দেখেন বেয়াইমশায়, পুলিশের ড্রেস পরে হাজির হয়েছেন। ব্যস্ত হয়ে উঠলো সবাই।

রঞ্জন সেন ডি আই জি এবার বললেন, "আপনার নির্দেশমতন ঠিক সময়েই এসে গেলাম।"

"এসেছেন, পায়ের ধুলো দিয়েছেন, এটা খুব ভাল কথা, কিন্তু

আপনাকে নির্দেশ দেবে কে ?" প্রশ্ন তুললেন ভবনাথ সেন।

এবার সত্যিই অবাক হবার পালা। ভবনাথবাবুর নাম করে কেউ ডি আই জি অফিসে মেসেজ রেখেছে, রঞ্জন সেনকে আজ বিকেলে সল্টলেকে জল খেতে আসতেই হবে! পিকলুও উপস্থিত থাকবে। সুতরাং আর দ্বিধা করেননি রঞ্জন সেন। আপিসের কাজকর্ম ফেলে রেখে সোজা চলে এসেছেন।

"চোর জোচ্চোরদের তা হলে অন্তত একদিনের জন্যে সুবিধে হয়ে গেলো," রসিকতা করলেন ভবনাথবাবু।

তাঁর স্ত্রী বললেন, "ওঁর কথা রাখুন, আজ যখন সল্টলেকে এসেছেন তখন খিচুড়ি এবং ইলিশ মাছ ভাজা খেয়ে বাড়ি যাবেন।"

ওঁদের কথা তখনও শেষ হয়নি। আবার বেল বেজে উঠলো। অবাক কাণ্ড, হরিময়বাবু হাঁপাতে-হাঁপাতে প্রবেশ করলেন। ক্ষমা চেয়ে বললেন, "স্যরি, দু'মিনিট দেরি হয়ে গেলো, ছ'টা বেজে দু'মিনিট হয়েছে। আমি মেসেজ পেয়েছি, কিন্তু বাসে উঠতে পারি না। শেষে এসপ্ল্যানেড থেকে একটা ভাগের ট্যাক্সিতে বিধাননগরে হাজির হয়েছি! ভীষণ চার্জ বাড়িয়ে দিয়েছে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে।"

"মেসেজ?" পিকলু এবার বেশ অবাক হয়ে গিয়েছে।

হরিময়বাবুর চোখ দুটো বিস্ফারিত হচ্ছে। "তুমি টেলিফোনে বিজয়কে খবর দাওনি, যে-করেই হোক বিকেল ছ'টার মধ্যে সল্টলেকে এসে তোমার সঙ্গে জরুরি আলোচনা করতে হবে?"

বেশ চিন্তিত হয়ে উঠলো পিকলু। ঠাকুমা এবারেও বললেন, "ঠাকুর যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন— খিচুড়ি এবং ইলিশ মাছ দেড় ঘণ্টার মধ্যে রেডি হয়ে যাবে। বাংলাদেশের এক পাঠক ঢাকা থেকে আসবার সময় ভবনাথের বাড়িতে মাছ নামিয়ে দিয়ে নরেন্দ্রপুরে চলে গিয়েছে। এমদাদুল খাঁ— ওঁর দুই ছেলে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে পড়াশোনা করে, স্বামী লোকেশ্বরানন্দর খুব ফেভারিট এই এমদাদুল। এঁকেও লেখক হিসেবে খুব শ্রদ্ধা করে।"

হরিময়বাবু বললেন, "ভাগ্যে মাথায় টাক পড়েছে, না হলে দুশ্চিন্তায় এবং সাসপেন্সে কখন মাথার সব চুল খাড়া হয়ে উঠতো। আসলে আজ কি পয়লা এপ্রিল?

"আপনার মাথা খারাপ! আজ ১৬ই আগস্ট, ১৯৩৭। কোন দুঃখে ১লা এপ্রিল হতে যাবে?"

"তা হলে কারুর মাথায় কোনও সিরিয়াস অভিসন্ধি রয়েছে। ঘটনাকেন্দ্র থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে রাখতে চায় কেউ।"

ভবনাথ সেন বললেন, "সারা দুপুর ধরে আমরা দু'জন আপনার বাড়িওয়ালার লেখা কবিতারহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করছি। একটা জিনিস পরিষ্কার, ১৩০৪ সনের ৩১শে শ্রাবণ তিনি কোনও লুপ্তরত্ন উদ্ধারের নির্দেশ দিচ্ছেন।"

"এই রত্ন বংশগোপালবাবু কোথায় লুকিয়ে রেখে গিয়েছেন তা জানতে পারলেই তো সব হাঙ্গামা চুকে যেতো। আমার ধারণা, এসব বার্মার কোথাও লুকিয়ে রেখে এসেছিলেন বংশগোপাল।"

"প্রয়োজনে আমাকে এবং পিকলুকে একবার বার্মা ঘুরে আসতে হবে, যদি ভিসা পাওয়া যায়।" হরিময়বাবু কখনও বার্মা দেখেননি।

"বেয়াইমশাই রয়েছেন। অনুমতির অসবিধে হবে না," বললেন পিকলুর ঠাকুমা।

"সেটা তো পাসপোর্ট— পুলিশের হাতে। কিন্তু ভিসাটা বার্মা সরকারের মর্জি। যাবো বললেই লাল কার্পেট পেতে দেবার জন্যে তাঁরা বসে নেই," বললেন ভবনাথ সেন।

"পুলিশের অসাধ্য কিছু নেই, সে পাসপোর্টই বলুন আর ভিসাই বলুন," এই বলে পিকলুর ঠাকুমাকে সগর্বে এবং প্রকাশ্যে সাপোর্ট করলেন হরিময়বাবু।

আবার পড়লেন ভবনাথ :

প্রভুর মুরতিখানি
বসায়ে হৃদয়পাটে

খুঁজিও রতনখানি
তুলসীর তটে।

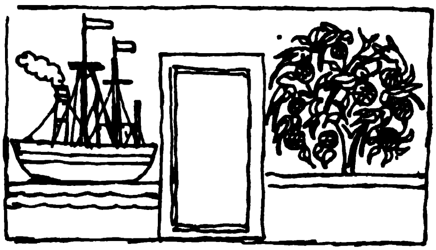
"আচ্ছা, বার্মার অথবা হিদারাম হালদার লেনের কোথাও কোনও তুলসীর ব্যাপার আছে?"

"অবশ্যই আছে! ওইখানেই তো এভরি সন্ধ্যায় চমচমকে লাইটিং সার্ভিস দিতে হয় অর্থাৎ প্রদীপ জ্বালানোর সেবা করতে হয়!" বললেন হরিময়বাবু।

"হুররে," বলে লাফিয়ে উঠলো পিকলু। "হরিময়দাদা, আর এক মিনিট দেরি নয়, রহস্যের সমাধান হতে চলেছে। ওই তুলসীমঞ্চেই আমরা যা খুঁজছি তা পেয়ে যাবো। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীদন্ত।"

ভবনাথবাবুর মুখও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "পিকলু হ্যাজ হিট দ্য জ্যাকপট! এরপরেই তো দন্তকুমুদের ব্যাপারটা জলের মতন পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে—

মনোমাঝে রেখো না
আর কোনো কামনা।
মনে রেখো ভাবনা
কুমুদের তাড়না।"



এবার হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়লো পিকলু। ঠাকুমা কত করে বললেন, ‘‘দশ মিনিট অপেক্ষা করো। অন্তত ইলিশ মাছ ভেজে দিই।’’

হরিময়বাবু ইলিশ মাছ খেতে ভীষণ ভালবাসেন। বিশেষ করে বাংলাদেশের ইলিশ। তাঁর একটু থেকে যাবার ইচ্ছে।

‘‘যা ১১১ বছর অপেক্ষা করেছে তা আরও ১১১ মিনিট অপেক্ষা করলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না,’’ এইটাই হরিময়বাবুর সুচিন্তিত অভিমত।

কিন্তু পিকলু রাজি নয়। গজগজ করে হরিময়বাবু মোটরবাইকের পিছনে চড়ে বসলেন। সংবাদপত্রের ‘দিনটি কেমন যাবে’ বিভাগে শ্রীভৃগু লিখেছেন, ‘সুযোগ এলেও হাতছাড়া হবার প্রবল সম্ভাবনা।’

নিজের মনেই হরিময়বাবু করলেন, ‘‘শ্রীভৃগু যা লেখেন তাই সত্যি হয়।’’

পিকলু এখন চনমন করছে। মাথায় সেফটি হেলমেট পরে, একটা হাঁড়ি সে হরিময়বাবুকেও দিয়েছে। কিন্তু বৃষ্টি আসছে প্রবলভাবে-- ওই যে লিখেছে শ্রাবণের মৃত্যুসনে যদি আকাশ ঘনায়।

হরিময়বাবু বললেন, ‘‘সব রহস্যের তো সমাধান হয়ে গেলো মনে হচ্ছে। ওই তুলসীতলায় বংশগোপালবাবু যে মহাসম্পদ লুকিয়ে রেখে গিয়েছেন তা আমাদের মাথায় একবারও আসেনি। আসলে, সবই

ঠাকুরের ইচ্ছা, না হলে ট্রিপল ওয়ান ইয়ার্স অপেক্ষা করতে হলো কেন।"

ঠাণ্ডা হাওয়া তীরবেগে যাত্রীদের শরীরকে আক্রমণ করছে তবু হরিময়বাবু শান্ত হতে পারছেন না। ভিতরটা এবং টাকের কেন্দ্রটা ঘন ঘন ঘেমে উঠছে চাপা উত্তেজনায়।

"অদ্ভুত ব্রেন তোমার এবং তোমার দাদুর। দলিলগুলো একটু ক'দিন আগে পেলে এতো উদ্বেগ সহ্য করতে হতো না। আমি তো আবার হুটকো হালদারকে শঙ্করীপ্রসাদবাবুর বাড়িতে ধর্না দিয়ে থাকতে রিকোয়েস্ট করেছি— আমেরিকান কোনও অপ্রকাশিত চিঠিতে যদি নরেন্দ্রনাথ এই দাঁতের কোনও ইঙ্গিত দিয়ে থাকেন, বিশেষ করে মিস ম্যাকলাউডকে। ওঁর কাছে যে কত গোপন খবর ছিল! সেই সঙ্গে অনেক রেলিকুয়্যারি।"

শেষ শব্দটার অর্থ পিকলু জানে না।

"অমিও কি জানতাম! ইংরিজি বুঝতে না পেরে, একদিন লজ্জার মাথা খেয়ে বসুমশাইকে ফোন দিলাম। হাঁটুর ব্যথা, ফোন ধরতে চাইছিলেন না, শেষে চমচমের নাম শুনে হ্যালো বললেন। এবং বুঝিয়ে দিলেন কথাটার মানে— সাধুদের দেহাবশেষ বা পবিত্র বস্তুর আধার।"

পিকলুর মোটরসাইকেল ইতিমধ্যে বিদ্যাসাগর সেতুর পূর্বপ্রান্তে এসে গিয়েছে।

"ধন্যি বটে! স্রেফ কাছি দিয়ে এত বড় একটা ব্রিজ বেঁধে রেখেছে!" বললেন হরিময়বাবু। তাঁর উত্তেজনা এবার বাড়ছে। "দাঁতের ভ্যালুয়েশন অন্তত ওয়ান মিলিয়ন ডলার! ভীষণ ভাগ্যবান এই বংশগোলাপ বিশ্বাস। স্নেহময় পিতৃপুরুষের দূরদৃষ্টিতে সাড়ে চার কোটি টাকা ব্যাঙ্কে জমা পড়ে যাবে।"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান।" বলে উঠলো পিকলু।

শ্রাবণ মেঘের দাপটে ব্রিজ প্রায় খালি, কোনও গাড়ি নেই বললেই হয়। দূরে, ওই টিপটিপে বর্ষায় একটা ট্যাক্সি পিছলে গিয়ে রেলিঙে মৃদু ধাক্কা মেরেছে।

বাইক থামিয়ে ট্যাক্সির কাছে গিয়ে পিকলু হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো,

"এই যে বংশগোলাপবাবু! আপনি এখানে? এইভাবে?"

মাথা নামিয়ে হতভম্ব হয়ে বসে আছেন বংশগোলাপ বিশ্বাস। বললেন, "একটুর জন্যে বেঁচে গিয়েছি-- এতক্ষণে না হলে হাসপাতালের মর্গে পড়ে থাকতে হতো।"

"বালাই ষাট। ওসব কথা মুখে আনবেন না বংশগোলাপবাবু। ঠাকুরের ইচ্ছায় আপনাকে এখনও অনেকদিন বেঁচে থাকতে হবে, নাতির ভাতে নিজে দাঁড়িয়ে লোক খাওয়াতে হবে!"

"কার ইচ্ছায় বললেন?"

"ঠাকুরের দয়ায়। তিনিই তো সারাক্ষণ খেলাচ্ছেন।"

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন বংশগোলাপ। "বলবেন না, ঠাকুর বেশ ক্ষেপে রয়েছেন এই বিশ্বাস বংশের ওপর।"

এবার সুখবরটা দিলেন হরিময়বাবু। তাড়াতাড়ি ছুটছে পিকলু প্রাণসংশয় করে, কারণ তুলসীতলাতেই আজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের দন্তরহস্যের অবসান হবে।

"ওয়ান মিলিয়ন ডলার-- বুঝেছেন বংশগোলাপবাবু!" ব্যাখ্যা করলেন হরিময়। "চার কোটি টাকার জিনিস।"

বংশগোলাপ এবার এসে পিকলুর মোটর বাইকে উঠলেন। ব্যাকসিটে দু'জন লোক বহন করা বেআইনি। কিন্তু এখন কী উপায়?

"আপনারা এলেন এখানে দেবদূতের মতন। মিস্টার পিকলু।" অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছেন বংশগোলাপ।

"যে কোনও দায়িত্ববান নাগরিক এখান দিয়ে গেলেই আপনাকে দেখে গাড়ি থামাতো। মনে রাখবেন, গতকালই আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করেছি।"

বিশ্বাই করতে পারছেন না বংশগোলাপবাবু যে কবিতার পাঠোদ্ধার হয়েছে। হরিময়বাবু বললেন, "ব্যাক সিটে নড়াচড়া করবেন না, বংশগোলাপবাবু। পিছনের রাইডার নার্ভাস হয়ে পড়লেই দু'চাকার

গাড়িতে গড়বড় শুরু হয়ে যায়।"

একটু পরে হরিময়বাবু বললেন, "চার কোটি হাতে পেলে কিছু টাকা শ্রীশ্রীঠাকুরের পুজোতে দিয়ে দেবেন, বংশগোলাপবাবু। আমরা তুলসীমঞ্চের সামনে একটা ফাউন্টেন অফ জয় করবো।"

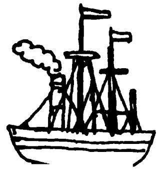
বংশগোলাপ বললেন, "ওখানে, মানে বেলুড় মঠে দু কোটি দেবো শ্রীশ্রীঠাকুরের মানভঞ্জনের জন্যে...।" বাকি রইলো দু কোটি। হিসেব কষছেন হরিময়বাবু।

এবার বোমা ফাটালেন বংশগোলাপ বিশ্বাস। "আমি দেড় কোটি দেবো চমচমকে, আর পঞ্চাশ লাখ মিস্টার পিকলুকে— উনি আমার বংশধরদের জন্যে যা করলেন!"

"সে কি মশাই! আপনার নিজের? আপনার বংশধরের?"

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন বংশগোলাপ। "ব্যাপারটা আমি বুঝে নিয়েছি হরিময়বাবু। শ্রীদন্তের টাকা মোটেই বিশ্বাস ধাতে সইবে না। বংশ রক্ষে করাটা বড়লোক হওয়ার থেকে অনেক বড় কাজ। আমার শিক্ষা হয়ে গিয়েছে, মশাই। দেখলেন না, আজকে আমার মৃত্যুযোগ। সামান্য একটু টুসকি মেরে যমদূত রসিকতা করে গেলো। ট্যাক্সি যখন কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলে অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে, তখনই আমি কাতরভাবে বললাম, ঠাকুর আমি তোমাকে ভাঙিয়ে একটা আধলা নেবো না! বিশ্বাস করুন, ট্যাক্সিটা চুরমার হয়ে গেলো, অথচ আমি প্রাণে বেঁচে রইলাম।"

"কিন্তু কোথায় গিয়েছিলেন আজ?"



বংশগোলাপ নিজের মনেই বললেন, ''লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু! আমি ওই স্বামীজি বহুরূপানন্দের সঙ্গে কথা চালাচ্ছিলাম, আপনাদের না বলে। যদি কোনও সোর্সে লুকিয়ে রাখা দাঁতের খবরটা পান এবং বংশগোপালের সাঙ্কেতিক কবিতার পাঠোদ্ধার করতে পারেন। আজ বিকেলে অ্যাজ ইউজাল, আমি ঘুম থেকে উঠেছি, সেই সময় ম্যানেজার সিং এসে বললো, টেলিফোন এসেছিল। স্বামী বহুরূপানন্দর কাছ থেকে জরুরি খবর আছে। আমাকে বেরোতে হবে। সন্ধ্যা ছ'টার সময়ে স্বামীজি এন্টালিতে ডিহি শ্রীরামপুর লেনে রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের সামনে আমার জন্যে গোপনে অপেক্ষা করবেন।''

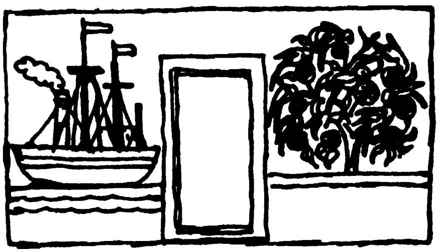
খবর পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটেছেন বংশগোলাপ। একটা ট্যাক্সি করে হাজির হয়েছেন প্রবুদ্ধ ভারতের আপিসের সামনে।

"জানতাম না মশাই। শুনলাম, ঠাকুর স্বামীজির সমস্ত ইংরিজি বই ওঁরা ছাপেন। তা ওখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। স্বামীজির নো পাত্তা। শেষে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে আশ্রমের ভিতরে পাঠালাম। অরবিন্দ মহারাজ বলে এক সন্ন্যাসী বলে দিলেন, এখানে বহুরূপানন্দ বলে কোন সন্ন্যাসী নেই।"

"আমি তো তখন কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।" হতাশ হয়ে বললেন বংশগোলাপ।

ব্যাপারটা পিকলু কিন্তু বেশ বুঝে উঠতে পারছে। তার মনে যেসব

সন্দেহের ইঙ্গিত রয়েছে তা তাকে দ্রুত ৪২/৩ হিদারাম হালদার লেনে হাজির হতে বলছে। সময়টা ভীষণ কম।



শিবপুর মন্দিরতলা পেরিয়ে যখন হিদারাম লেনে পৌঁছনো গেলো তখন ৪২/৩-এ ঘুটঘুটে অন্ধকার।

চমচমের বিজয় ছুটিতে গিয়েছে। তার জায়গায় নজর আলি লেন থেকে গুণধর সামন্ত কাজ করতে এসেছে।

গেটের কাছেই গুণধর দাঁড়িয়েছিল। সে বললো, "লোডশেডিং।"

"ম্যানেজার সিং কোথায়?" জানতে চাইলেন বংশগোলাপ, কেউ বলতে পারলো না।

গুণধর দুটো মোমবাতি হাতের গোড়ায় রেখেছিল। তার একটা জ্বলন্ত অবস্থায় বংশগোলাপের হাতে দিল। তিনি বললেন, "আপনারা রাখুন, দরকার হবে।"

পকেট থেকে ঝটিতি একটা চ্যাপ্টা টর্চলাইট বার করে ফেললো পিকলু। সব অবস্থায় সব পরিস্থিতির জন্যে তৈরি হবার ট্রেনিং সে এন. সি. সি.-তে পেয়েছে।

বংশগোলাপবাবু বোকার মতন এই অন্ধকারেই বিশ্বাস লজের

দোতলায় উঠতে চাইলেন। বারণ করলো পিকলু, পরিস্থিতিটা কেমন কেমন মনে হচ্ছে। গুলিগোলার বিনিময় না হয়।

ঝট করে সি ই এস সি-র কনট্রোল রুমে ফোন করলো পিকলু। ফোন নামিয়ে রেখে পিকলু বললো, "যা আশঙ্কা করছিলাম তাই। হাওড়ায় কোনো লোডশেডিং হয়নি-- দেদার বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারেন হাওড়ার গ্রাহকরা। সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা আজ কমের দিকে।"

পিকলু এবার জিজ্ঞেস করলো, "ফিউজ তার আছে?"

"আছে", কিন্তু কোথায় আছে মনে করতে পারছেন না হরিময়বাবু। হঠাৎ হাউমাউ করে তিনি বললেন, "কী সর্বনাশ। আজ ঠাকুরের মহাসমাধি দিবস, আর আজকেই তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জ্বালানো হলো না। ঠাকুর তুমি আমাদের ক্ষমা করো।"

গুণধর এবার একগাল হেসে জানালো, "ঠাকুর নিজেই সব ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। সন্ধ্যাবেলায় দু'জন সন্ন্যাসী মোটরসাইকেলে চড়ে এখানে এলেন। সবার খোঁজখবর করলেন। নীচের সায়েব, উপরের সায়েব কেউ বাড়িতে নেই শুনে জিজ্ঞেস করলেন, তুলসীমঞ্চে প্রদীপ দেওয়ার কী হচ্ছে? ম্যানেজার সিং-ও তখন হাওয়া। একজন সাধুজি তখন দয়া করে নিজেই গেলেন তুলসীমঞ্চে, যত্ন করে প্রদীপ জ্বালালেন। কিন্তু হাওয়ায় একে একে প্রদীপ নিভে গেলো। ঠিক সেই সময় হঠাৎ লোডশেডিং। সন্ন্যাসীরা আধঘণ্টা পরে চলে গেলেন।"

"কীসে গেলেন?" জানাতে চাইছে পিকলু।

"একজন মোটরসাইকেলে। আর একজন ট্যাক্সিতে। হলদে-কালো একটা ট্যাক্সি গেটের কাছে হঠাৎ এসে দাঁড়িয়েছিল। এঁরা খুব ভাল সাধু! গুণধরকে একশ টাকা দিয়েছেন। গেটের পাহারায় আর একজন যে ছোকরা ছিল তাকেও একশ টাকা দিয়েছেন স্বামীজিরা।"

এবার তীব্র গতিতে ফিউজ সারানোর দায়িত্ব নিলো পিকলু। হরিময়বাবু অতি অল্প সময়ে ফিউজতার খুঁজে পেয়েছেন। হিদারাম

হালদার লেনের বিশ্বাস লজ আবার আলোয় ঝলমল করে উঠলো।

পিকলু বললো, "একটা শাবল চাই। কুইক।"

চমচম অফিসে কলম আছে, শাবল নেই। কিন্তু বংশগোলাপের হুঙ্কারে ম্যানেজার সিং-এর লোকটি একটা শাবল নিয়ে এলো। টর্চ জ্বালিয়ে, শাবল হাতে তিনজনে তুলসীমঞ্চের দিকে এগিয়ে চললেন। পরিস্থিতি মোটেই ভাল মনে হচ্ছে না, একটু আগেই কেউ যেন জায়গাটা তছনছ করে গিয়েছে, মনে হচ্ছে।

তুলসীমঞ্চের পাশে একটু খুঁড়তেই ছোট্ট একটা বাঁধানো গর্ভগৃহ চৌবাচ্চার মতন দেখতে পাওয়া গেলো।

হরিময়বাবু বলে উঠলেন, "পিকলু সাবধান।" তিনি শুনেছেন গুপ্তধন পাহারা দেবার জন্যে অনেক সময় বিষাক্ত সাপ রেখে দেওয়া হয়। পিকলু প্রথমে টর্চের আলো ফেললো, তারপর দেখলো ছোট একটি রুপোর কৌটো টর্চের আলোয় ঝকমক করছে।

হাত বাড়িয়ে বাক্সটা তুলে আনতেই হরিময়বাবু ইউরেকা, ইউরেকা বলে চিৎকার করতে লাগলেন।

আর বংশগোলাপবাবু চোখ বুজে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পূজার মন্ত্রপাঠ করতে লাগলেন--

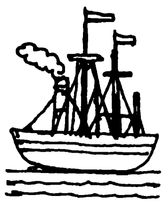
ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে

অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।

বংশগোলাপবাবু এবার আরও চড়া গলায় আবৃত্তি করলেন :

নরদেব দেব জয় জয় নরদেব

শক্তিসমুদ্রসমুত্থতরঙ্গং দর্শিতপ্রেমবিজৃম্ভিতরঙ্গম্।



রুপোর ছোট্ট আধারটি অতি যত্নে ওপরে তুলে আনলো পিকলু। কৌটোর ওপর ইংরেজিতে লেখা রামকৃষ্ণ প্রোমোহংস-- ১৫ই আগস্ট, ১৮৮৬।

"দেখছেন, দেখছেন। আদি ব্যাপার। এমনকি মহাসমাধিদিবসটাও সেই পুরনো পুলিস রিপোর্ট অনুযায়ী লেখা।" বললেন হরিময়বাবু।

তারপর আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে হরিময় অস্ফুটভাবে বলতে লাগলেন, "কৌটো নয়-- রেলিকুয়্যারি-- বুঝতে পারছো তো পিকলু। কিন্তু প্লিজ তুমি আগে পায়ের জুতোটা খুলে ফেলো, এই শ্রীদন্ত শ্রীহস্তে ধারণ করবার আগে।"

"জুতো না খুলে কৌটো খুলবেন না, প্লিজ," কাতর আবেদন জানালেন বংশগোলাপবাবু। "হাজার হোক এটা আমাদের ভিটে। দু'বার সর্বনাশ ছোবল পড়েছে বংশের ওপর।"

জুতো খুলে রেখে রুপোর কৌটো খুললো পিকলু। কৌটোর ভিতরে আর একটা কৌটো। সেটাও খুললো পিকলু। তার ভিতরে আর একটা বাক্স কিমাম কৌটোর মতন।

সেটাও খুললো পিকলু। তারপর সকলে একসঙ্গে হায় হায় করে উঠলো। দাঁত নেই। কিন্তু ভিতরে একটু দাগ রয়েছে। বোঝা যাচ্ছে সেখানে দাঁতের সাইজের কিছু একটা ছিল।

পিকলু বললো, "আমরা মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট দেরি করেছি। ইতিমধ্যে ওই পাজিটা রহস্য কবিতার অর্থ উদ্ধার করতে পেরেছিল..."

"বহুরূপানন্দ?" প্রশ্ন করলেন হতাশ বংশগোলাপ।

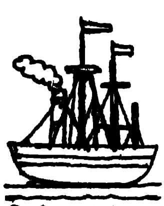
"না মশাই, ওর নাম বহুরূপানন্দ নয়-- সুশীতল সান্যাল। তবে বহুবার বহুরূপ নিয়েছে লোকটা নানা কুকীর্তিতে। অনেক দামি পুরনো জিনিস লোকটা বাইরে চালান করে যাচ্ছে।

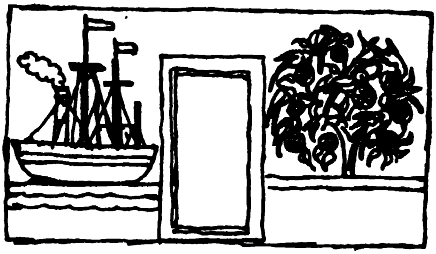
"ও লর্ড, আমরা একটুর জন্যে ঠাকুরের শ্রীদন্তের ঐতিহাসিক সুযোগ হারালাম।"

"লোকটা আজ সকলকে বোকা বানিয়েছে-- এমনকি বংশগোলাপবাবুকেও। ওঁরও অবশ্য লোভ ছিল শুরুতে, তাই দুষ্টের ফাঁদে পা দিয়েছিলেন। খোঁজও করলেন না, লোকটা আদতেই মিশনের সন্ন্যাসী কি না, বরুণ মহারাজকে বেলুড়ে ফোন করলেই সব জানতে পারতেন। ওঁকে না পেলে হাতের গোড়ায় হুটকো হালদার ছিলেন। অজানা দুষ্ট লোকের হাতে এইভাবে পারিবারিক কাগজপত্তর তুলে দেবার কোনও প্রয়োজন ছিল না।"

বংশগোলাপবাবুর চোখে জল। কান্না চাপতে চাপতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এ সবই কি ঠাকুরের ইচ্ছেয় হচ্ছে?"

"সে কথা কে বলতে পারে, বংশগোলাপবাবু?" সান্ত্বনা দিলেন বিষণ্ণ ও হতাশ হরিময়বাবু। এতো কষ্ট এতো অনুসন্ধান শেষ পর্যন্ত কাজে লাগলো না-- স্রেফ ওই রেলিকুয়্যারিটা ছাড়া।"





পিকলু ইতিমধ্যে পকেট থেকে একটা ছোট্ট এরিকসন মোবাইল ফোন বার করে পুলিসদাদুর সঙ্গে কথা বলে নিয়েছে। দাদুও তাঁর সেলুলারে ওর সঙ্গে কথা বললেন। মনে হচ্ছে, আজ সন্টলেকে খিচুড়ি-ইলিশ খাওয়া হয়নি। তিনি সোজা চলে এসেছেন লর্ড সিন্‌হা রোডের অফিসে।

বংশগোলাপবাবু তখনও কেঁদেই চলেছেন-- "লস্ট আটলান্টা, লস্ট আটলান্টা। ঠাকুরের দাঁত আমরা চোর-ডাকাতের হাতে তুলে দিলাম, স্রেফ নিজের বোকামিতে। ঠাকুর তুমি আমাকে এত বোকা করে পৃথিবীতে পাঠালে কেন? জয় জয় শ্রীরামকৃষ্ণ, অবতার বরিষ্ঠ!"

হরিময়বাবু বললেন, "আমার অফিসে চলুন। একটু চা খান, শক্তি পাবেন।" ইতিমধ্যে প্রবল বৃষ্টি আসছে-- শ্রাবণের শেষ কামড় তো!

পিকলুর পকেটের সেলুলারটা অল্পক্ষণ পরে আবার বেজে উঠলো। "হ্যালো! পিকলু হিয়ার। বলেন কি, দাদু! না আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, আমরা এখনই বেরিয়ে পড়ছি উইথ বংশগোলাপবাবু। এবং হরিময়দাদা।"

"ব্যাপার কী?" ওই বুলেট বাইকের পিলিয়নে চড়ে শ্রাবণ মাসের রাত্রে বর্ষার মধ্যে আবার বেরিয়ে পড়ার প্রস্তাবটা হরিময়বাবু ভাল চোখে দেখছেন না। শারীরিক নিরাপত্তার কথাটাও তো ভাবা উচিত।

পিকলু বললো, "পুলিসদাদু দমদম এয়ারপোর্টে অ্যালার্টে মেসেজ দিয়েছিলেন। ওরা একটু আগে একজন লোককে সন্দেহের বশে আটকেছে। লোকটার ঠোঁটে একটা মস্ত কাটা দাগ। আমার নিশ্চিত ধারণা— বহুরূপানন্দ অ্যালিয়াস সুশীতল সান্যাল!"

হরিময়বাবু বুলেট বাইকের পিছনে চড়তে-চড়তে বললেন, "ঠোঁট কাটা লোক দুনিয়ায় অনেক আছেন পিকলু।"

বংশগোলাপ কিন্তু প্রাণখুলে পিকলুকে আশীর্বাদ করতে লাগলেন। তিনিও মোটর সাইকেলের পিছনে বসে পড়েছেন। বিদ্যাসাগর সেতু দিয়ে যেতে যেতে তিনি বললেন, "ঠাকুরের ইচ্ছে হলে আমাদের ঠোঁটকাটা সান্যালই পুলিসের খপ্পরে পড়েছে। চলুন একটু দ্রুত গতিতে। ঠাকুরের আশীর্বাদ হলে আজ রাত্তিরেই আমরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীদন্ত উদ্ধার করতে পারবো।"

হরিময়বাবু বিদ্যাসাগর ব্রিজের প্রান্তে এসে বললেন, "আমার সমস্ত দুশ্চিন্তার অবসান হলো। দাঁত আর নো দাঁত, তুমি ও ভবনাথ সেন যৌথভাবে চমচমের জন্যে ধারাবাহিকটা লিখবে আগামী সংখ্যা থেকে। নামটা ঠাকুরই এইমাত্র আমাকে মনে করিয়ে দিলেন-- প্রোমোহংস রহস্যামৃত।"

পিকলু বললো, "এখন ড্রাইভ করছি। আমাকে হাসাবেন না, আমাকে মন দিয়ে বাইক চালাতে দিন।" এবার সে গাড়ির গতি দ্বিগুণ করে দিল আর হরিময়বাবু ও বংশগোলাপবাবু একসঙ্গে কোরাস শুরু করে দিলেন, "নরদেব দেঘ জয় জয় জয় দেব।"